# পরম-তৃষা

( যোহান বোয়ারের 'Great Hunger'-এর অনুবাদ )

অনুবাদক

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়
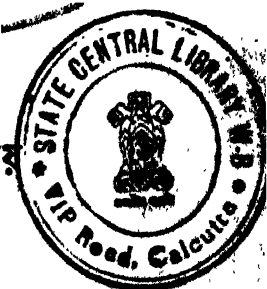


বেঙ্গল পাবলিশার্স  ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫২

দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৮

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—গিরীন্দ্রনাথ সিংহ

দি প্রিণ্টিং হাউস

২০, কালিদাস সিংহ লেন

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে চার টাকা

# ভূমিকা

প্রায় কুড়ি একুশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। ইউরোপীয় সাহিত্যের বড় বড় স্রষ্টাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু সচেতনতা দেখা দেয়, কিন্তু সেও অত্যন্ত সামান্যই। তখনকার দিনে ইংরাজী সাহিত্য আর সামান্য কিছু ফরাসী সাহিত্য বাদ দিলে আমাদের দৃষ্টি বিদেশী আর কোনো সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে পড়েনি। সবে মাত্র রুশীয় এবং নরওয়েজীয়ান সাহিত্যের কয়েকটি নাম আমাদের কানে এসে লেগেছে। নরওয়ের ইবসেন আর রুশিয়ার টলস্টয়, টুর্গেনিভ আর ডস্টয়েভস্কী ছাড়া আর কোনো লেখকের নাম তখনো আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করেনি। সেই সময় দৈবক্রমে যোহান বোয়ারের 'জগতের রূপ' এবং 'পরম তৃষা' এই দুখানি বই পাঠ করে এক অপূর্ব্ব বিস্ময় পুলক অনুভব করি ; তার পর ধীরে ধীরে তাঁর 'শেষ সমুদ্র দস্যু' 'তীর্থযাত্রা' 'গীতরসিক বন্দী' 'মিথ্যার প্রতাপ' বইগুলো পড়বার সুযোগ পাই।

বোয়ারের রচনা বৈশিষ্ট্যে এবং তাঁর ভাবুকতায় মুগ্ধ হয়ে তাই বাঙলায় 'জগতের রূপ' এবং 'গীতরসিক বন্দী' এই দু'খানি বইয়ের পরিচয় 'প্রবাসী' এবং 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত করি। তার বছর দুই পরেই 'পরম-তৃষা' বইখানি বোয়ারের অনুমতিক্রমে অনুবাদ করতে আরম্ভ করি এবং উত্তরা পত্রিকায় তা ১৩৩৪-৩৬ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এতকাল পরে বাঙলা দেশে বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের একটা অনুকূল হওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছে এবং 'পরম-তৃষা' পুস্তকাকারে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে।

বোয়ারের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়া হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বলতে গেলে আমার কিছুই জানা নেই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নরওয়েতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি, তারপর বাল্যকাল তাঁর কাটে নরওয়ের গ্রাম দেশে, যুবা অবস্থায় রাজনীতি চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং পরে উপন্যাস লিখে বিশ্বসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন—এই সামান্য কয়েকটি কথা ছাড়া তাঁর জীবন সম্বন্ধে তথ্যমূলক কিছু জানা নেই আমার।

অথচ বোয়ারকে জানি না একথা বলতে যেন পারি না কিছুতেই। কারণ তাঁর যা যথার্থ পরিচয়, যে-পরিচয় তাঁকে বিশ্বের ভাবুক এবং রসিকসমাজে আত্মীয়রূপে পরিগণিত করেছে সে পরিচয় তো তাঁর উপন্যাসাবলীর মধ্যেই আছে। তাই মনে হয় যে যারা এই বইখানি পড়বেন, তাঁরাই বোয়ারের অন্তর পুরুষের সত্য পরিচয় পেয়ে আনন্দে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। বোয়ার আদর্শবাদী, বোয়ার শিল্পী। বোয়ারের পূর্ব্বে নরওয়েজীয়ান সাহিত্যের দুই দিকপাল ছিলেন বিয়র্নসন এবং ইবসেন: এঁদের শিল্প সৃষ্টির মাঝ দিয়ে তৎকালীন নরওয়েজীয় সাহিত্যের যে বিশেষ রূপটি ধরা পড়েছিল আমার চোখে সেটি হচ্ছে "জীবন সম্বন্ধে একটি তীব্র সমস্যাবোধ ও তজ্জনিত একটি বিপুল গম্ভীরতা এবং এই সমস্যা-সমাধানের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ও সংগ্রাম।" বোয়ারের মধ্যেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করে পারি না। বোয়ার জীবন সম্বন্ধে যে সমস্যাবোধ, তাকে দার্শনিকের মত কোথাও ব্যক্ত করেননি, যথার্থ শিল্পীর মত বাস্তব জীবনের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্খার মাঝ দিয়েই তিনি জীবনের সমস্যা এবং তার অন্তর্নিহিত একটি সুবিপুল আদর্শ প্রেরণাকে রূপায়িত করে তুলেছেন। তাই বোয়ারের মধ্যে দার্শনিক কখনো শিল্পীকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেনি।

বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অভিযান বোয়ারকে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করেছে, এবং বিজ্ঞানের বিপুল স্বপ্নকেও তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু এই যান্ত্রিক সভ্যতার দ্রুতবেগ এবং ত্বরিত অভিযান মানুষকে তার যথার্থ সার্থকতার পথে, শান্তি এবং আনন্দের স্বর্গলোকে উপনীত করতে পারবে কিনা এই প্রশ্ন আরো বহু ভাবুকের মত বোয়ারকেও চিন্তাকুল করেছে। মানুষের মনে আছে অসীম জ্ঞানের আকুতি, অনন্ত প্রেমের তৃষা আর অজস্র আনন্দের কামনা—মানুষ কোথায় পাবে এই সমস্তের সমন্বয়? পদে পদে মানুষের এই আকুতি এবং কামনা লাঞ্ছিত দলিত হচ্ছে, ধরণীর পরে স্বর্গ রচনার স্বপ্ন তার রূঢ় আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে বারবার। বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন বোয়ার তা উপেক্ষা করতে পারেন নি; তাই তাঁর রচনা রোম্যান্সে পরিণত হয়নি, জীবনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখ দ্বন্দ্বাহত মানুষের চিত্র তাই রোম্যান্সের অবাস্তব আলোকে বিকৃত হয়নি। কিন্তু বোয়ার হতাশ আশাআকাঙ্খাহীন সংশয়বাদীও নন, সমস্ত দুঃখ নিরাশার আবর্ত্তভেদ করে মানবমনের আদর্শাভিসার চলেছে শুভ্রপক্ষ হংসের মত। বোয়ার আশাবাদী, তাই তিনি বলেন, 'আছে. সেই অরুণ উষা কোথাও আছে যার দিকে আমরা সবাই চলেছি, সমস্ত ধর্ম্ম যার প্রতিবিম্ব। তুমি বিশ্বাস করো কি যে একদিন সেই পবিত্র মুহূর্ত্তটি আসবে যখন সমস্ত মানুষ শান্তভাবে বসবার সময় পাবে, যখন তাদের চিত্তের মাঝ দিয়ে বিশ্বসঙ্গীত আনন্দোচ্ছ্বাসে বয়ে যেতে থাকবে।'

শিল্পী হিসাবে, ঔপন্যাসিক হিসাবে বোয়ারের বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। বোয়ারের চরিত্র সৃষ্টির যে কৌশল তার সঙ্গে আমাদের দেশের শরৎচন্দ্রের তুলনা করা যেতে পারে। বোয়ারের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর চিত্রের বাহুল্যহীন সুস্পষ্টতা, দু-চারটি তুলির আঁচড়ে

একটি চিত্রকে সম্পূর্ণ করে তুলে ধরেন তিনি এবং তারপর সেই চিত্র বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাগাড়ম্বর এবং খুঁটিনাটি বর্ণনার দ্বারা বাস্তবতার ভড়ং তিনি একেবারেই করেন না। ভাবানুগত পারিপার্শ্বিক বর্ণনায় বোয়ার চরিত্রকে কিভাবে পরিস্ফুট করে তোলেন তা পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন।

মানুষকে সত্য জীবনের পথে যে প্রেরণা দেয়, অন্তরের বাস্তবিক গভীরতম প্রয়োজনের দিকে যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে-ই আমাদের ধর্ম্মের দিকে চালিত করে। ধর্ম্মের এই সূত্র যদি স্বীকার্য্য হয়, তা হলে আমরা নিঃসঙ্কোচে জগতের সাহিত্যগুরুগণকে জীবন-ধর্ম্মের পুরোহিত বলতে পারি। আমার মনে হয় বিশ্বসাহিত্য-মন্দিরে য়োহান বোয়ার একজন শ্রেষ্ঠ জীবন-পুরোহিত যিনি সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং অসম্পূর্ণতার মধ্যেও মানুষের গৌরবময় সত্তাটিকে পূজার অর্ঘ্য দিতে কণামাত্র কার্পণ্য করেন নি।

২৪শে ভাদ্র, ১৩৫২
কাশী

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

# প্রথম খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

যখন দীর্ঘ শীত-সায়াহ্নে উত্তর-পশ্চিমা তুফান গর্জ্জন করতে করতে ফিয়র্ডের দুপাশের পাষাণ-প্রাচীরের মাঝ দিয়ে জলের ঝাপটাকে সুমুখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলতে থাকে, তখনকার সেই তুফানকে শুদ্ধমাত্র সর্ব্বনাশের কাজে সব তুফানের সেরা বলা চলে। তার মন্থনে জলরাশি শুভ্র ফেনিল হয়ে ওঠে, শুভ্রশীর্ষ ঢেউগুলি সাঁ সাঁ ক'রে ছুটে চলে, তীরবর্ত্তী নৌকাগুলোকে ডিগবাজি খাইয়ে জেলেদের ধূসর কুটিরের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে, পুরানো গোলাবাড়ীর সেতুগুলোকে উপড়ে ফেলে ক্ষেতের উপর দিয়ে প্রকাণ্ড পাখীর মত উড়িয়ে দিতে থাকে। মেয়েরা 'ভগবান্, দয়া করো' ব'লে চেঁচাতে থাকে, কারণ এটা তাদের দুধ দুয়ানোর সময়, উঠোনের উপর দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে কোনো রকমে লণ্ঠন আর বালতিটাকে টেনে নিয়ে গোয়ালে যেতে হবেই, যদিচ বাতিও নিবে যাবেই, বালতিটাকেও কিছুতেই ধ'রে রাখা যাবে না। বুড়ী গিন্নীরা ঘরের ভিতর আগুনের চারপাশে ব'সে বিড় বিড় ক'রে বলতে থাকে 'হে ভগবান্ রক্ষা কর'—তাদের মন উধাও হয়ে যায় সুদূর উত্তরে লফোটেনের জেলেদের কাছে; হয়ত তারা এই রাত্রিতেই সমুদ্রের মাঝখানে!

কিন্তু শান্ত বসন্তদিনে এই ফিয়র্ডই উজ্জ্বল-মসৃণ বেশ নিয়ে চুপি চুপি অন্তরীপ আর খাড়ির পাশে এসে উপস্থিত হয়। ভাটার সময় যখন ছোট

ছোট আশ্চর্য্য দ্বীপগুলো, বালুতট, আগাছা-ছাওয়া শিলাস্তূপগুলো শুকিয়ে উঁচু হয়ে ভেসে ওঠে, আর মাঝে মাঝে স্বচ্ছ ডোবাগুলোয় খালি পায়ে দুষ্টু ছেলেগুলো যখন জল ছিটোতে থাকে, আর আধ-পেনির মত ছোট্ট ছোট্ট চাঁদা মাছগুলো যখন চারিদিকে লাফাতে থাকে, তখন সেই সব মিলে এক আশ্চর্য্য দেশের দৃশ্যকে জাগিয়ে তোলে। উষ্ণ সিক্ত সাগর-সৈকতের আর লোনা জলের গন্ধে বাতাস ভ'রে ওঠে আর সী-পাই পাখী জলের মাঝে বড় শিলাস্তূপের ওপর ব'সে দোল খেতে খেতে উল্লসিত হয়ে উঠে, 'সূর্য্যের পানে তার লাল ঠোঁট তুলে' গাইতে থাকে "ক্লিউ-ইপ, ক্লিউ-ইপ, বসন্ত সমী-প।"

ঠিক এমনি একদিন, বছর চোদ্দ হবে দুটি ছেলে জেলেদের একটা কুঁড়ে ঘর থেকে একটু তাড়াতাড়িই সমুদ্র-তটের দিকে নেমে এল। একটা কিছু অকর্ম্ম হাতে থাকলে ছেলেরা যে-রকম ব্যস্ত হয়ে থাকে, তেমনটি আর কিছুতেই নয়; স্পষ্টতঃই এই বালক-যুগলের হাতেও এই রকমেরই কোনো কাজ ছিল। পীয়ার ট্রোয়েনের সুন্দর চুল আর রঙটি ফ্যাকাশে, সে একটা দুচাকা গাড়ী ঠেলছিল; তার সাথী মার্টিন ক্রভোল্ড ময়লা রঙের যুবা, মুখে দাগ, সে চলেছিল একটা বালতি নিয়ে। জলের ওপর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে কানাকানি কি একটা গোপন পরামর্শ দুজনে হচ্ছিল।

অবিশ্যি পীয়ার ট্রোয়েনই সর্দ্দার। মোড়ল ছিল সে সব সময়ই, গত বছরের দাবাগ্নির অপরাধও তারই ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল। আবার হালে সে তার কয়েকটি বন্ধুকে স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বড়দের মত বালকদেরও গভীর সমুদ্রে বঁড়্‌সি জাল ফেলবার অধিকার আছে। সারাটা শীতকাল তো তাদের দিয়ে বড়দের কাজ করানো হয়েচে, 'পীট্' কাটানো এবং কাঠ বওয়ানো হয়েচে; তবে এখনই বা কেন তারা অল্প জলের

ছেলেখেলা মাছ ধরা ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না? 'কোজ' আর বেক্কুব পান্না কডের ছানা ছাড়া কি আর কিছুই তারা বাড়ীতে আনতে পারে না? গভীর সমুদ্রের বড় বঁড়সিতে হাত দেওয়া তাদের মানা। তা তো ছিল, কিন্তু এই সময় লফোটেনে মাছ-ধরা চলছিল খুব, তা শেষ হবার পূর্ব্বে কারু ফেরার সম্ভাবনা নেই। তাই বালকেরা গত কাল নৌ-শালায় গিয়ে গোপনে বঁড়সি জালে টোপ লাগিয়ে ফিয়র্ডের গভীরতম অংশে ফেলে এসেচে।

গভীর সমুদ্রে বঁড়সি-ফেলার মজা হচ্চে এই যে, এতে এত বড় এবং এত ভয়ানক মাছ উঠে আসতে পারে যা পূর্ব্বে কথনো দেখাই যায়নি। যা হোক, কালকের বিপদটা ছিল আরেক রকমের। এই ছেলেরা যখন দেখলে যে তীরের কাছের ডুরিটাকে ডুবিয়ে রাখবার মত ভারি কিছু তাদের কাছে নেই, তখন তারা ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেল; মনে হ'ল বুঝি কাজটা ছেড়েই দিতে হয়। কিন্তু পীয়ারের সদাজাগ্রত বুদ্ধি একটা নূতন ফন্দী বা'র ক'রে বসল। অন্তরীপের শেষ সীমায় যে 'ফার' গাছটা ছিল, ডুরির একটা দিক তাতে বেঁধে আর একটা দিককে উন্মুক্ত ফিয়র্ডের মাঝে নিয়ে যাওয়া স্থির হ'ল। তার পর ফেলবার দিকটায় একটা পাথর বেঁধে, মৎস্য-মণ্ডলীকে সম্ভাষণ জানিয়ে, সেটাকে নৌকা থেকে ছুঁড়ে ফেলা হ'ল; ডুরিটা সবুজ অতলে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাজটা তো সমাধা হ'ল সত্যি, কিন্তু তীরের পাশে গোটা দুই বঁড়সি গাছ আর জলের মাঝখানটায় শূন্যেই ঝুলে রইল। যদিচ তাতে আইডার হাঁস কিম্বা গিলিমট গেঁথে যাবার সম্ভাবনা রইল বটে, তবু যদি কেউ অন্ধকারে নৌকা বেয়ে ওদিক দিয়ে দৈবাৎ এসে যায় আর বঁড়সিবিদ্ধ হয়ে পড়ে তাহলে একেবারে মানুষ শিকারও যে না হতে পারে তাও নয়। এই কারণেই ছেলে দুটি যে উদ্বিগ্নভাবে

কানাকানি করতে করতে দ্রুত নৌকার দিকে যাচ্ছিল তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

মার্টিন হঠাৎ ব'লে উঠল, ওই, পীটার রোনিঙ্গেন আসচে।

এটি দলের তৃতীয় সভ্য; এই যুবকটি লম্বা ছিপছিপে, ভুরুগুলো সাদা ধরণের, মুখখানা বোকাটে। ছেলেটি তোতলা, আর হাসবার সময় তার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত চিহিহিহি শব্দ হতে থাকে। দু'বার তাকে কন্‌ফার্মেশন ক্লাস থেকে ফিরেয়ে দেওয়া হয়েচে। আসল কথা, সে মনে করে, যা তার বলবার, তা শোনার মত ধৈর্য্য যখন কারু নেই, তখন আর বই থেকে পাঠ শেখার দরকার কি?

তিনজনে মিলে নৌকা জলে ঠেলে নামিয়ে ভাসান হ'ল; তার পর তালি-দেওয়া ট্রাউজার পরা পা ঝুলোতে ঝুলোতে কষ্টে-সৃষ্টে নৌকায় ওঠা হ'ল। তীর থেকে কে চীৎকার ক'রে ডাকল, "এ—ই! আমায়ও আসতে দে!"

মার্টিন বললে, "ওই যে ক্লাউস, ওকেও নেব?"

পীটার রোনিঙ্গেন বললে, "না।"

পীয়ার বললে, "আরে হ্যাঁ, নিয়ে নে।"

জেলা ডাক্তারের ছেলে ক্লাউস ব্রক, নিকার-বোকার আর সেলর ব্লাউজ-পরা ছোট্ট ছেলে, চোক দুটি নীল। অবিশ্যি ক্লাউস বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিল—বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটর তাকে পড়ায়—বাড়ী ফিরে বাবার কাছে যে নিশ্চয়ই কিছু উত্তম-মধ্যম দক্ষিণা পেতে হবে তাতে আর ভুল নেই।

দাঁড় বার ক'রে পীয়ার বললে, "শিগগীর!" ক্লাউস নৌকোয় এসে উঠল, খাড়ির উপর দিয়ে সাদা-ডুরিকাটা চার-দাঁড়ে-টানা নৌকো বেগে একটু দোল খেতে খেতে চল্‌ল, কারণ ছেলেদের দাঁড় বেতালা পড়ছিল।

পীয়ারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মার্টিন সম্মুখে দাঁড় টানছিল আর পীয়ার নৌকার পিছন থেকে নেতৃত্ব করছিল। তার চোখের চাওয়ায় একটা বিপুল ব্যাপারের সম্ভাবনা নেচে নেচে উঠছিল। বেচারী মার্টিনের অন্তরের অর্দ্ধেকটা এরি মাঝে ভয়ার্ত্ত হয়ে উঠেছিল; সে কিছুতেই এটা বুঝতে পারছিল না যে, যাকে বড় হয়ে ধর্ম্মযাজন করতে হবে সেই পীয়ার কেন সব সময় কেবলি সেই সব কাজের ফন্দী আঁটতে থাকে, যা 'প্রভু'র দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই পাপ ব'লে গণ্য হবে।

পীয়ার সহুরে ছেলে, তাকে এই গ্রামে জেলেদের কাছে রাখা হয়েচে। লোকে বলে, তার মা নাকি বিশেষ ভাল ছিলনা। কিন্তু মা তার ম'রে গেছে, তবে বাবা আর যাই হোন্ ধনী যে তাতে আর সন্দেহ নেই; কারণ প্রতি খৃষ্টমাসের সময় তিনি তাঁর ছেলেকে দশ-দশটা ক্রাউন পার্ব্বণী দিয়ে থাকেন, আর পীয়ার সেই টাকাটা সব সময় পকেটে ক'রেই রাখে। সেই কারণে স্বভাবতঃই আর আর ছেলেরা তাকে সম্মান ক'রে চলে, ন্যায্য দাবী হিসেবেই সেও সব কাজে সর্দ্দারী ক'রে থাকে।

ধূসর শিলাস্তূপগুলোর পাশ বেয়ে নৌকো এগিয়ে চলল, তটভূমি এবং কুঁড়েঘরগুলো নীল হয়ে দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল। উপরে দূরের পাহাড়ের মাঝে একটা লাল কাঠের গোলাবাড়ী সাদা ভিতের উপর সুস্পষ্ট দাঁড়িয়ে রইল।

শেষে সেই খাড়িটায় এসে পৌছানো গেল, সেই ফার গাছটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। পীয়ার গাছে চ'ড়ে ডুরির বাঁধ আলগা ক'রে দিলে; সাথীরা সব নৌকোর পাশে কাৎ হয়ে ঝুঁকে দেখলে সেই ডুরি অতল জলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার তোলার বেলা কি ভেসে উঠবে কে বলতে পারে!

'টানো' ব'লে হুকুম দিয়ে পীয়ার নৌকার গতি ফেরাতে আরম্ভ

করল। ফিয়র্ডের ওপর নৌকা এবার সোজা এগিয়ে চলল। বঁড়সি ঝোলানো ডুরি টেনে তাকে বেশ ক'রে পাকিয়ে একটা টবের ভিতর রাখা সুরু হল। পীয়ারের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। এইবার একটা টান পড়ল—এই প্রথম টান—গভীর জলের মাছের একটা অস্পষ্ট নড়ন-চড়ন! ছোঃ! একটা বড় কড্ শুধু! নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে পীয়ার সেটাকে টেনে তুলল। এরপর এল একটা ডিঙ্ মাছ; যা হোক, গভীর জলের মাছ বটে। তার পর একটা টাস্ক্, এর পর আরো আরো কত! খেতে মন্দ নয় ব'লে মেয়েরা এতে খুসীই হবে আর হয়ত বড়রা ফিরে এলে তাদের এ-সব কথা না-ও বলতে পারে। এবার কিন্তু ডুরিতে জোরে হেঁচকা টান পড়ল, কী আসছে এবার? একটা ধূসর ছায়ার মত কি দেখা গেল। পীয়ার চীৎকার ক'রে বলল, "বর্শাটা দে!" পীটার বর্শাটা পীয়ারের দিকে ছুঁড়ে ফেলল আর তিন জন চেঁচিয়ে উঠল, "কি, ওটা কি?" "চুপ! নৌকো উল্টাস্ নি—ক্যাটফিশ!" বর্শার এক ঘা পাশের দিকে—তার পরই একটা কদাকার ধূসর দেহ নৌকোয় টেনে তোলা হ'ল; সেখানে প'ড়ে মাছটা গড়াগড়ি খেতে লাগল। ক্লাউস চীৎকার করতে লাগল, "সাবধান ভাই, দেখো" —নৌকায় সব সময়ই ও ওই রকম অস্থির হয়ে পড়ে।

পীয়ার কিন্তু আবার ডুরি তোলা আরম্ভ করেছে। এতক্ষণে তারা ফিয়র্ডের প্রায় মাঝামাঝি এসে পৌঁছেচে আর এবার ডুরি উঠচে সেই রহস্যময় গভীরতার মাঝ থেকে—যেখানে এর আগে কোনো জেলেই ডুরি ফেলেনি। টানতে যে বেগ পেতে হচ্ছে এবার তা পীয়ারের মুখে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেচে; অন্যেরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্লাউস জিজ্ঞাসা করল, 'ডুরিটা বুঝি খুব ভারি লাগচে?' তিরছা ভাবে ডুরিটা যেখানে জলের মাঝে নীচের দিকে মিলিয়ে গেছে, সেই দিকে

তাকিয়ে মার্টিন বললে, "চুপ ক'রে থাক্ না!" পীয়ার টেনেই চলেচে। গভীর সমূদ্রের তলদেশ থেকে যে কাঁপন তার হাতে এসে পৌঁছুচ্চে তার মাঝে যেন কেমন একটা অভাবিতের ইঙ্গিত, ডুরির পরশটা যেন কেমন অদ্ভুত! কোনো একটা ভারি কিছু যে তা নয়, এমন কি সামান্য মাছের পরিষ্কার ঠক্ ঠক্ টানও নয়; এ যেন একটা দানবী হাত ধীরে ধীরে টানচে, খুব ধীরে যেন তাকে নৌকো থেকে নামিয়ে অতলে টেনে নেবার জন্য টানচে। তারপর হঠাৎ একটা ভয়ানক হিঁচকে টান তাকে প্রায় নৌকো থেকে ফেলে দিয়েছিল আর কি!

সাথী তিনটি সমস্বরে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, 'সাবধান! এ কি!'

পীয়ার চেঁচিয়ে বললে 'নৌকোয় ব'সে থাক্'। শৃঙ্খলাপ্রিয় সত্যিকারের জেলেদের মত তারা কথা মাথা পেতে নিলে।

পীয়ার এক হাতে শক্ত করে ডুরিটা ধ'রে রইল আর এক হাতে একটা বসার তক্তা টানতে টানতে রুদ্ধশ্বাসে কোন রকমে বললে, "আর একটা বর্শা আছে?"

লোহার বঁড়সি-লাগানো একটা গদা বা'র ক'রে পিটার রোনিজেন বললে, "এই যে!"

"মার্টিন, এটা নিয়ে তুই এসে পাশে দাঁড়া।"

"কিন্তু এটা—এটা কি?"

"বলতে পারি নে কি, একটা বড় কিছু হবে।"

ডাক্তার-নন্দন আর্তকণ্ঠে বললে, "ডুরিটা কেটে, প্রাণ বাঁচাতে হ'লে দাঁড় ধর।" যে শুকনো ডাঙায় তার ডবল একটা লোককে ধরতে ভয় পায় না, আশ্চর্য্য, সে-ই সমূদ্রে এমনি ধারা কাপুরুষ!

আরেকবার ঝাঁকুনি খেয়ে পীয়ার জলে প্রায় পড়পড় হ'ল। সে গত বছরের জঙ্গলে আগুন লাগোনোর কথা মনে করল; এবার

আবার আর একটা তেমনি ধারা দুর্ঘটনাকে নিজের কাঁধে কিছুতেই চাপানো যেতে পারে না। যদি ঐ ভীষণ জন্তুটি উঠে আসে আর নৌকোটি উলটে দেয়—ডাঙা থেকে তারা যে অনেক দূরে! সবগুলো যদি ডুবে মরে তা হ'লে কি কাণ্ডটাই না হবে! আর এ যে তারি দোষে তাও বেরিয়ে পড়বে! ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে ডুরি কাটবার জন্যে ছুরিটা হাতে নিলে, তারপর আবার সেটা গুঁজে রেখে ডুরি টানতে লাগল।

এই যে আসচে—জলের মাঝ দিয়ে একটা মস্ত ছায়া উঠে আসচে! প্রকাণ্ড জন্তুটা জোরে ঘুরপাক খায় আর জলের ওপর একরাশি বুদ্বুদ ভেসে ওঠে। ঐ যে—সাদা ঝিলিক মেরে গেল, নীচের দিকটায় এক পাটি সাদা দাঁত! আহ্ হা! এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেচে এটা কি! উত্তর সাগরের সব চেয়ে ভয়ানক জীব, গ্রীনল্যাণ্ডের হাঙর; কয়েকটি ছোট ছেলেকে কিম্বা আর কিছুকে সাবাড় করা তার পক্ষে খুবই সোজা।

"মার্টিন, এবার সাবধান, বর্শাটা নিয়ে তৈরী থাক্।"

জানোয়ারটা তখন জলের ওপর গড়াচ্চে আর তার চারিদিকের জল যেন একেবার টগ্‌বগ্ করচে। লেজের ঘা মেরে সমুদ্রটাকে ফেনিল ক'রে তুললো, বঁড়সি-বেঁধা ছুঁচোলো মাথাটা পাক খেতে খেতে ভেসে উঠল। 'মা-র্' ব'লে পীয়ার চীৎকার ক'রে উঠল, দুটো বর্শাই একসঙ্গে গিয়ে পড়ল, নৌকো একপাশে কাৎ হয়ে গেল আর জল এসে নৌকোয় উঠলো; দাঁড় ফেলে ক্লাউস 'যীশু আমাদের বাঁচাও' ব'লে চীৎকার ক'রে নৌকোর সুমুখে লাফ মেরে স'রে গেল।

পরমুহূর্ত্তেই একটা জোয়ান মানুষের মত ভারি দেহটাকে টেনে তোলা হ'ল; ছেলে দুটি আরেক দিকে গিয়ে ছিটকে পড়লো বললেই হয়। এবার মজা সুরু হ'ল! ছেলেদের হাত থেকে বর্শা ফস্‌কে গেল আর তারা জানোয়ারটাকে জায়গা দেবার জন্যে স'রে দাঁড়াল। ওই কালো প্রকাণ্ড

শিকারী জন্তুটি তার ভয়নাক ছুঁচলো নাক আর জ্বালাময় ক্রুর রক্তচক্ষু নিয়ে তার ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগল। তার জোরালো লেজ আছড়ে দাঁড় আর জল-ছেঁচা তাওয়াগুলোকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলে; আর লম্বা দাঁতগুলো দিয়ে নৌকার তলার আর বসার তক্তাগুলোকে কামড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে উঁচুতে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠে সেটা পড়তে লাগল; ভয়ানক ভাবে গড়াগড়ি দিতে লাগল আর মুখ দিয়ে থুথু, ফেনা আর হিস্ হিস্ শব্দ বা'র হতে লাগল; ভীত বিজয়ীদের দিকে রক্তচক্ষু পাকিয়ে যেন সে বলতে লাগল, 'এসো না আর একটু কাছে!'

মার্টিন ক্রুভোল্ডের ভয় হচ্ছিল পাছে হাঙর নৌকাখানাকে চুরমার ক'রে ফেলে। ছুরি বার ক'রে সে এক পা এগিয়ে গেল। ছুরি একবার শূন্যে ঝিকমিক ক'রে উঠল, তার পরই ইস্পাত পেছনের পাখনার মাঝখানে একেবারে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল, রক্তের ঝলক বেরিয়ে এল। ওরা ব'লে উঠল 'সাবধান' কিন্তু ততক্ষণে কালো লেজের গণ্ডীর বাইরে মার্টিন লাফিয়ে স'রে গেছে। আবার নতুন ক'রে মরণ-নাচন সুরু হ'ল। ছুরি একেবারে আমূল বিঁধে গিয়েছিল, একটা বর্শার ফলা চোক দুটোর মাঝখানে বিঁধেছিল আর একটা পাশে পাশে ঝুলছিল—কাঠের বাঁটগুলো প্রত্যেক ঝটকায় একবার এদিক, একবার ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। নৌকার দেহখানা ঘা খেয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে কেঁপে উঠতে লাগল! পীয়ার বললে, 'ও নৌকাটাকে চুরমার করবে, আর আমরা ডুবে মরবো দেখ্‌ছি।'

এবার পীয়ারের ছোরা ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠল আর হাঙরের কাঁধের মাঝখান থেকে রক্তের ধারা ফিন্‌কি মেরে বেরিয়ে এল। কিন্তু এই আঘাতের তাল সে সামলাতে পারলে না, নিমেষের মাঝে দুটি দেহ নৌকার বুকে এক সঙ্গে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

হালের খুঁটিটাকে আঁকড়ে ধরে ক্লাউস চীৎকরে ক'রে উঠল, "হে যীশু প্রভু, মেরে ফেললে, ওকে মেরে ফেললে!"

পীয়ার ততক্ষণে হাঁটুতে ভর ক'রে অর্দ্ধেকটা উঠেচে, কিন্তু যেই সে নৌকার একপাশে ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়েচে অমনি সেই জানোয়ার তার ডানা কামড়ে ধরল। ছেলেটার মুখ যাতনায় বিকৃত হয়ে উঠল, আর এক মুহূর্ত্ত হ'লেই ওই ধারালো দাঁতগুলো একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু পীটার রোনিঙ্গেন ক্ষিপ্রবেগে দাঁড় ফেলে তার ছোরাখানাকে সোজা ঐ জানোয়ারের চোখে বসিয়ে দিলে। ফলাটা একেবারে মস্তিষ্ক ভেদ ক'রে গেল, দাঁতের কামড় শিথিল হয়ে এল।

পীটার গুড়ি মেরে দাঁড়ে ফিরে যেতে যেতে তোতলা কণ্ঠে ব'লে উঠল, "হারামজাদা শ্-শয়তান্!" পর মুহূর্ত্তেই পীয়ার আপনাকে টেনে সোজা ক'রে, সামনের বস্‌বার তক্তায় ব'সে বিক্ষত বাহুর ছেঁড়া আস্তিনটা ধ'রে হাঁটু গেড়ে বসল, আর আঙুল বেয়ে তার রক্ত ঝরতে লাগল।

শেষে যখন সেই মস্ত লাস্-বোঝাই-করা নৌকা বেয়ে তারা বাড়ী ফিরতে লাগল, সবাই হঠাৎ দাঁড়টানা বন্ধ করলে।

পীয়ার বললে, 'আরে ক্লাউস কোথায়?' কারণ ডাক্তারনন্দন খুঁটি ধ'রে যেখানে বসেছিলেন সেখানে তিনি নেই!

"আরে ঐ যে তলায়!"

পঞ্চদশবর্ষীয় বীরবর, যিনি এই বয়সেই প্রেমে পড়ার গৌরব করতেন, যিনি জার্ম্মাণ ভাষা শিখেছিলেন এবং তাঁর বাবার মতই ভদ্রলোক হব-হব করছিলেন, তিনি নৌকার তলদেশে সুমুখের দিকে একেবারে ডাহা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়ে প'ড়ে ছিলেন।

আর সবাই প্রথমটা ভয় পেয়ে গেছল, কিন্তু যে-পীয়ার ব'সে ব'সে জখমী ডানাটাকে ধুচ্চিল, সে জল তুলে অচেতন বালকের মুখে ঝাপটা

দিতে লাগল। পরমুহূর্ত্তেই ক্লাউস একেবারে উঠে ব'সে নৌকার পাশটাকে পাগলের মত ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠলো—'বাঁচতে চাও তো ভুরি কেটে ফেলে দাঁড় টানো বলছি !'

অন্য ছেলেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল ; দাঁড়টানা বন্ধ ক'রে তারা হাঁটু গুটিয়ে ব'সে ব'সে হাঁফ ছাড়তে লাগল। কিন্তু বাড়ী যাবার আগে, তীরে পৌঁছে সবাই ঠিক করলে যে, ক্লাউসের মূর্চ্ছা যাওয়া সম্বন্ধে কিছুই বলা হবে না। এর পর কয়েক হপ্তা ধ'রে উক্ত চারটি মূর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-কলাপই গ্রামবাসীদের আলোচনার বিষয় হয়ে রইল। সুতরাং তারা বুঝতে পারল যে বাবা-খুড়োরা সব বাড়ী ফিরে এলে উপযুক্ত উত্তম-মধ্যম পাবার ভয় আর তেমন রইল না।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খুব অল্প বয়সে পীয়ার যখন ট্রোয়েনে বৃদ্ধ দম্পতীর এখানে প্রেরিত হলো তার পূর্ব্বে সে এমনি এক পরিবার থেকে আর এক পরিবারে কয়েকবার চালান হয়ে এসেচে, যদিচ এসব পীয়ারের মনে ছিল না। গ্রামের মাঝে এখন সে একটা মাথা-পাগলা বলে পরিচিত কিন্তু বেশিদিন হয়নি যখন সে বিষণ্ণ মুখে সকলের কাছ থেকে সরে গিয়ে নিঃসঙ্গতাকেই বরণ করে নিয়েছিল। যখনি তার সত্যিকারের মায়ের কথা উঠত তখনি কেন ওরা বলাবলি করত 'আহা বেচারা'? কি অর্থ তাদের এমনি ক'রে কথা বলার? কেন, পীটার রোনিঙেন পর্য্যন্ত রেগে গেলে তোতলিয়ে ব'লে ফেলে, 'জারজ' কোথাকার? পীয়ার কিন্তু ট্রোয়েনের বসন্ত-চিহ্নিত স্ত্রীলোকটিকেই 'মা' এবং তার কুশপেয়ে স্বামীকে 'বাবা' বলে ডাকে এবং প্রয়োজন হলে কারখানায় এবং মাছ ধরবার সময় নৌকোয় সাহায্যও করে।

তার ছোট বেলাটা কেটেছিল সেই সব লোকদের মাঝে—যারা হাসাকে পাপ ব'লে ভাবতো আর যাদের মন দারিদ্র্যে, ধর্ম্মসঙ্গীতে আর নরকের ভয়ে সামুদ্রিক ধূসর কুয়াসার মতোই ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

'পীট' ( Peat )-এর মাঠ থেকে কাজ ক'রে এসে একদিন সে দেখলে বড়রা সব অপরাহ্নের ভোজন সামনে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলচে আর তাদের নাকেও যেন সর্দ্দি ধরেচে। পীয়ার কপালের ঘাম মুছে ফেলে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস্ করলে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এক চামচ 'পরিজ' উঠিয়ে মুখে পুরে চোখ মুছতে মুছতে তা গিলে ফেলে বললে,'বেচারা পীয়ার!' বুড়ো তার শিং-চামচটা দেয়ালের ফাটলে ঢুকিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল "আহা, বেচারা!"

জ্যেষ্ঠা কন্যা জানালার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "বাপ মা দুইই গেল এখন!"

"মা? সে কি?—"

বুড়ী নিশ্বাস ফেলে বলল "হ্যাঁরে বাছা হ্যাঁ, সে গেছে, তার বিচারের সময় হয়েচে ভগবানের দরবারে, তাই সে গেছে।"

দিন শেষে পীয়ার কাঁদবারও চেষ্টা করলো। সব চেয়ে ভয়ানক কথা এই যে, বাড়ীর প্রত্যেকটি লোক নিঃসংশয় কণ্ঠে জানিয়ে দিলে যে তারা জানে তার মায়ের গতি কি হয়েচে। স্বর্গে যে নয়, এটা একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে তারা এত নিশ্চিত হলো কি করে?

পীয়ার শুধু একটিবার তাকে দেখেছিল। সে এক গ্রীষ্মদিবসে মা তার এই জায়গাটা দেখতে এসেছিল। তার পরণে ছিল হাল্কারঙের কাপড় আর মাথায় ছিল মস্ত একটা ষ্ট্র-হ্যাট। পীয়ারের মনে হয়েছিল যেন এমন সুন্দর সে কখনো পূর্ব্বে দেখে নি। তার মা প্রতিবেশীদের

কাছে একথাটাও গোপন করবার কোনো চেষ্টা করলো না যে, পীয়ারই তার একমাত্র সন্তান নয়; লুইসে ব'লে তার আর এক মেয়ে নাকি আরেক জায়গায় কাদের ওখানে আছে। তার মার মেজাজটা ছিল খুব ফুর্তির; সে এমন সব গল্প বললে যা বিশেষ সুবিধের নয় আর এমন সব গান গাইলে যাকে কিছুতেই পবিত্র বলা চলে না। প্রবীণেরা তার দিকে চোরা চাউনি হেনেছিল। যাবার বেলা সে পীয়ারকে চুমো খেয়েছিল এবং মস্ত হ্যাটের নীচে ঐ রাঙা হাসিমুখখানা একাধিকবার তার দিকে ফিরে চেয়েছিল; পীয়ারের মনে হয়েছিল তার মা হচ্চে জগতের সেরা সুন্দরী।

কিন্তু এখন সে কোথায়? যেখানে পাপীরা সব ভীষণ যন্ত্রণায় দিনপাত করে সেইখানে, অনন্তকাল সেইখানে তাকে থাকতে হবে, মুক্তির কোনো আশাই নেই!—পীয়ারের মনে কেবলি সেই ছবিখানি জেগে উঠে, সেই হাল্কা রঙের কাপড়, সেই ষ্ট্র-হ্যাট, সেই শুধু গান আর হাসি।

তার পরের সমস্যা—ছেলের খরচ এখন কে জোগাবে? হ্যাঁ, তার গির্জ্জার পরিচয়পত্রে লেখা ছিল বটে যে, তার বাবার নাম হল্‌ম্ আর তিনি থাকেন ক্রিশ্চিয়ানিয়াতে। কিন্তু তার মা যা বলেছিল তা থেকে এই বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি অনেক দিন আগেই মরে গেছেন। এখন ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায়?

এর আগে কখনো পীয়ার ঠিক বুঝতে পারে নি—সে এখানে একজন আগন্তুক মাত্র, যতই না সে বুড়ো বুড়িকে 'বাবা মা' বলে ডাকুক।

রাতের পর রাত সে ওপরের ঘরে জেগে, নীচের ঘরে তার সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হয় তা শুনে, কাটাতে লাগল। বুড়ী কাঁদে আর বলে, "না, না"—আর, আর সবাই বলে, বড় মাগ্‌গীর দিনকাল; পীয়ার

এখন বেশ বড়সড় হয়েচে, এখন কোন চাষীর ওখানে কিম্বা পশুপালকের ওখানে চাকরী করতে পারে।

এই সব শুনে পীয়ার চামড়ার 'ব্যাগ'টা টেনে মাথা ঢেকে শুয়ে পড়তো। কিন্তু প্রায়ই রাত্তিরে বড়'দের কেউ জেগে উঠলে শুনতে পেতো ওপরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কে একজন কাঁদচে। দিনের বেলা খেতে বসে যতটা কম জায়গা সম্ভব ততটার মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে যত কম খেয়ে থাকা সম্ভব তাই খেতো। কিন্তু রোজ ভোর বেলা জেগে উঠেই এই ভয় হতো যে হয়তো আজ—আজই বুড়ো পালক পিতামাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অজানা লোকদের মাঝে তাকে চলে যেতে হবে।

ইতিমধ্যে ফিয়র্ডের পাশের এই কুটীরে অকস্মাৎ একটা অভিনব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটলো।

সারা গায়ে বড় বড় শীলমোহর দেওয়া একখানা রেজিষ্টারি চিঠি আর তাতে কোনো ভদ্রলোকের অপাঠ্য হস্তাক্ষর। চিঠি খোলার সময় জ্যেষ্ঠপুত্রের চারিদিকে সবাই ভিড় করে ঘিরে দাঁড়াল—খুলতেই পাঁচখানা দশ ক্রাউন নোট খাম থেকে টপ করে পড়ল। বিস্ময়ে সবাই বলে উঠলো "একি! একি আমাদের? তার পর পত্রের পাঠোদ্ধার করবার সমস্যা উপস্থিত হলো। আশ্চর্য্য, সোজাসুজি না বলা থাকলেও দেখা গেল চিঠিখানা পীয়ারের বাবাই লিখেছেন। চিঠিতে লেখা ছিল—"ছেলেটাকে ভালো ভাবে রেখো, ছ'মাস পর পর তোমরা ৫০ ক্রাউন পাবে। দেখো যেন ছেলেটা যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পায় আর জামা জুতো যেন পায়।

তোমাদের বিশ্বস্ত

পি, হল্‌ম্—ক্যাপ্‌টেন

বড় মেয়েটি তোতলাতে তোতলাতে বললে 'আরে, পীয়ার, তা—তাঁর—তোর বাবা একজন ক্যাপ্টেন, অফিসার' ব'লে মেয়েটি খানিকটা পিছিয়ে গেল ছেলেটাকে ভাল করে দেখবে ব'লে।

নোটগুলোকে বার করে হাতে নিয়ে, যেন ভগবানকেই সমাচার দেবার উদ্দেশ্যে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টিস্থাপন ক'রে জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বলল, "এবার ওর জন্য আমরা আগেকার ডবল টাকা পাবো।"

বুড়ী কিন্তু কৃতজ্ঞতায় হাত জোড় ক'রে তখন অন্য কথাই ভাবছিল—এখন তা হলে ছেলেটাকে খোয়াতে হবে না।

"ভালোভাবে খাওয়ানো ?" তার আর ভাবনা নেই। যদিচ সেদিনটা মামুলি দিনই ছিল, তবু সেদিনই পীয়ার তার 'পরিজে'র সঙ্গে চিটেগুড় পেল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তাকে একজোড়া মোজাই যে শুধু দিল তা নয়, তাকে সেইখানে বসে তখনি তা পরতে হল, আর সেই রাত্তিরে যখন সে শুতে গেল বড় মেয়ে এসে তাকে একটা নতুন চামড়ার 'র‍্যাগ' দিয়ে মুড়ে দিয়ে গেল। এ 'র‍্যাগ'টা পুরানো র‍্যাগটার মত তত লোমহীন ছিল না। বাবা তার ক্যাপ্টেন! এত বড় বিস্ময়াবহ সত্যটা তার বিশ্বাস হতে চায় না।

সেই থেকে পীয়ারের দিন ফিরে গেলো। লোকেরা এবার আরেক চোখেই তাকে দেখতে লাগল। এখন আর কেউ তাকে 'বেচারী' বলে না। ছেলেরাও তার সম্বন্ধে কুৎসিত কথা বলা ছেড়ে দিলে; যারা বয়স্ক তারা বলে ছেলেটার সামনে একটা ভবিষ্যৎ আছে। তারা বলে, 'দেখো, তোমার বাবা একটা কিছু ক'রে দেবেনই; তুমি পাদ্রী হবে, চাই কি 'বিশপ'ও হতে পারো।' ক্রিস্টমাসের সময় তার নিজের খুসিমত খরচ করবার জন্য দশ ক্রাউনের একখানা নোট এলো। পীয়ার তাকে ভাঙিয়ে নিলে, টাকার থলিটি তার ঐশ্বর্য্যে ফেটে পড়বার মত হলো।

এবার যে সে নাক উঁচু করে ছেলেদের মাঝে ছোট প্রিন্স কিম্বা সর্দ্দারের মত চলা-ফেরা আরম্ভ করবে তাতে আর বিচিত্র কি! ডাক্তার-নন্দন ক্লাউস ব্রক পর্য্যন্ত পীয়ারের মনোরঞ্জন করবার আশায় তাকে তাস খেলা শেখাতে লাগল। ক্লাউস কিন্তু বলতো, "না না, কি বল, তুমি কি সত্যি পাদ্রী হতে চাও না কি?"

এ সব সত্ত্বেও এ কথা কারু বলবার জো ছিল না যে, পীয়ার বড় অহঙ্কারী, তাকে মাছধরায়, কারখানায় সাহায্য করতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন জলন্ত লৌহপিণ্ড থেকে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হতে থাকত তখন কি সব স্বপ্ন তার চোখে ভেসে উঠত—কত সব ভবিষ্যতের স্বপ্ন! হ্যাঁ, সে হবে একজন পুরোহিত। হতে পারে সে এখন পাপী, একটা দুরন্ত অপদার্থ ছেলে মাত্র; সত্যি তো সে শাপমান্যি দেয়, সেপাইদের মতো ভয়ানক ভাবে শপথ করে; হয় তো আর আর ছেলেদের শুধু দেখাবার জন্যই যে, এতে পৃথিবী যে হাঁ করে গিলে ফেলতে আসবে সেটা নিতান্তই বাজে কথা। কিন্তু সে যাই হোক, ধর্ম্মযাজক সে হবে; তবে সেই চশমা-পরা, ভুঁড়িওলা ধর্ম্মযাজক সে কিছুতেই হবে না; না, সে হবে এক রকমের স্বর্গদূত—তুষার-শুভ্র তার পরিচ্ছদ, মুখখানি তার জ্যোতির্ম্ময়। হয়ত এমন এক দিনও আসবে যেদিন সে যেখানে তার মা রয়েচে সেই যাতনার দেশে নেমে যেতে পারবে, আর তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে। হয়ত তখন সে কোন এক হেমন্ত-সন্ধ্যায় শুভ্র-কেশ বিশপের বেশে তার প্রাসাদের বাইরে এসে অঙ্গুলি তুলে দাঁড়াবে, অমনি নক্ষত্রেরা সব গান গাইতে সুরু করবে।—

হাতুড়ির ঘা খেয়ে নেহাইটা কড়াং কড়াং করে গান গায়।

নিস্তব্ধ গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় বালকের দল উষর ঢালু বেয়ে পাহাড়ের উপর জঙ্গলে যায়, দোহনের জন্য গাভীদের ঘরে নিয়ে আসতে। যতই ওপরে

তারা যায় ততই দৃষ্টি তাদের সমুদ্রের দিকে দূরে বহুদূরে ছড়িয়ে যায়। আবার দু-এক ঘণ্টা পরে সূর্য্যাস্তের কালে লালপাঁজর পশুপালের দীর্ঘ-সারিটি ধীরে ধীরে নীচের দিকে আসতে থাকে, বহুদূরের পাহাড়ের ওপর দিয়ে অস্পষ্ট ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যায়। ছেলেরা 'ও-হু-উ-উ' বলে চীৎকার করতে করতে তাদের পিছনে আসতে থাকে, পাঁচনবাড়ি ঝোলাতে ঝোলাতে আর বয়স্ক লোকেরা যেমন করে তামাকপাতা চিবোয় তেমনিধারা অল্ডারের ছাল চিবিয়ে তার লাল কস ফেলতে ফেলতে। বহু নিম্নে তারা দেখতে পায় অন্ধকারে অস্পষ্ট খামারের জমি, আরো দূরে সন্ধ্যালোকে পীতাভ ফিয়োর্ডের জলরাশি যেন একখানি আয়না, তার মাঝে অরুণবর্ণের মেঘরাশি, শুভ্র পাল আর তরল নীল পাহাড়গুলো সব ঝিল্‌-মিল্‌ করতে থাকে। আরো দূরে শেষ ভূমি-সীমায় ধূসর সমুদ্রের ওপর নিঃসঙ্গ তারাটি!

এমনি এক সন্ধ্যায় পীয়ার পাহাড় থেকে নামচে, ঠিক তখন দেখতে পেল একটি ভদ্রলোক ছোট একখানি গাড়ী ক'রে বড় সড়ক ছেড়ে একটা ছোট রাস্তা ধ'রে ট্রোয়েনের দিকে যাচ্চেন। একটা ছোট্ট পুলের কাছে গিয়ে ঘোড়াটা হঠাৎ বেঁকে বসল, বলগা টেনে এক ঘা চাবুক কসাতেই ঘোড়া পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গাড়ীখানাকে বড় চাকার উপর এক রকম নাচানো সুরু ক'রে দিলে। ভদ্রলোকটি রেগে বললেন 'যাক্‌গে, হাঁটতে হলো আর কি?' ব'লে বল্‌গাটা পেছনের ছেলেটার দিকে ছুঁড়ে ফেলে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পীয়ারও কাছে এসে পৌছেচে।

আগন্তুক ব'লে উঠলেন, 'ওহে ছোকরা, এই ব্যাগটা একটু ধরতো, পারবে কি? আর—' ব'লেই হঠাৎ থেমে এক পা পিছিয়ে গিয়ে

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন 'এ কি, না, এ হতেই পারে না—তুমি কি পীয়ার ?'

পীয়ার একটু 'থ' হয়ে গিয়ে টুপি খুলে ফেলে থতমত খেয়ে বললে "আ—জ্ঞে হ্যা"

"বাঃ এ যে বেশ মজাই হলো ! আমার নাম হল্‌ম্। বেশ, বেশ।"

গাড়োয়ান ছোকরা তখন গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেছে। শহুরে ভদ্রলোকটি আর তালি-দেওয়া ট্রাউজার-পরা পাড়াগেঁয়ে ফ্যাক্যাসে ছেলেটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নবাগতের বয়স পঞ্চাশ কিম্বা তারি কাছাকাছি হবে; কিন্তু চেহারাখানা একেবারে খাড়া এবং কর্ম্মক্ষম—যদিও তাঁর চুল এবং ভালো ক'রে কামানো দাড়ির মাঝে সাদার ছিটে লেগেছিল। কালো ফেল্ট হ্যাটের কার্ণিসের নীচে থেকে তাঁর চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছিল; লম্বা খোলা ওভার-কোটের নীচে থেকে তাঁর ওয়েষ্টকোটের ওপর সোনার চেন দেখা যাচ্ছিল। এক হাতে এক জোড়া দস্তানা আর ছাতা, আর এক হাতে যাত্রীদের হাল্কা ব্যাগ, আর পায়ে সুন্দর পালিশ-করা জুতো—পীয়ার ভাব্‌ল, ইনি একজন মস্ত ভদ্রলোক। আর ইনিই হ'চ্চেন তার পিতা !

"এমনি দেখতে হয়েচ তা হ'লে। তোমার বয়সের আন্দাজে বিশেষ বড় হও নি'—তোমার বয়স তো প্রায় ষোল হবে, না ? ওরা তোমায় ভালো খেতে দেয় তো ?"

পীয়ার দৃঢ়স্বরে বল্‌ল—"দেয়"।

দু'জনে চল্‌ল নেমে ফিয়োর্ডের পাশে অস্পষ্ট কুটীরের দিকে। হঠাৎ লোকটি থামলেন, অর্দ্ধ-মুদ্রিত চোখে সেইদিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—

"এই ক'বছর ধ'রে তুমি বুঝি ওইখানেই রয়েচ ?"

"হ্যাঁ।"

"ওই ছোট্ট ঘরটাতে?"

"হ্যাঁ, ওইখানটায়; লোকে ওটাকে ট্রোয়েন বলে।"

"একি দেয়ালটা ওখানে যেভাবে বেঁকে গেছে, আমার বোধ হচ্ছে ও শীগ্‌গিরই ভেঙে পড়বে।"

পীয়ার হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু গলায় যেন কি একটা আটকালো। তার 'বাবা' 'মা'য়ের ছোট্ট বাড়ী সম্বন্ধে বড় লোকদের ও-ধরণের কথা শুনে তার কষ্ট হয়।

দোর-গোড়ায় অদ্ভুত ভদ্রলোকটির পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভয়ানক ব্যস্ত-সমস্তভাব দেখা দিল। বুড়ী গিন্নী রুটির জন্য আটা ছানতে গিয়ে তার দেহের সমুখটাকে আটা দিয়ে সাদা ক'রে ফেল্‌ল; বুড়ো কর্ত্তা চশমা চোখে জুতো মেরামত করতে বসে গেল, মেয়ে দুটো চরকা ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল। আগন্তুকটি চারিদিকে চেয়ে মৃদু-হাস্যে বল্‌লেন—"এই এসে পড়া গেল, আমার নাম হল্‌ম্"। বুড়ী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌ল—"এ্যাঁ, ক্যাপ্টেন নিজে?"

ভদ্রলোকটি আমায়িক, তাই যথাশীঘ্র সবাইকে শান্ত করলেন। সম্মানিতের আসনটি অধিকার ক'রে, আঙুল দিয়ে টেবিলটা বাজাতে বাজাতে ঠিক নিজের ঘরের মতই স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা সুরু ক'রে দিলেন। একটি মেয়ে কিছুদিনের জন্য সহরে কন্‌সলের বাড়ীতে চাকরী ক'রেছিল, সে ভদ্রলোকদের কায়দা জানত। এক বাটি দুধ নিয়ে কায়দা-মাফিক অভিবাদন করে সে বলল, "অনুগ্রহ করে ক্যাপ্টেন মহাশয় একটু দুধ নেবেন কি?"

অতিথি বললেন "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! বাছা, তোমার নামটি কি? এসো এসো, লজ্জা পাবার কিছু নেই। নিকোলীন? বাঃ চমৎকার!

আর তোমার ? লুসিয়ানা ? বেশতো !" লাল-বর্ডার-দেওয়া পাত্রটির দিকে চেয়ে, তা নিয়ে একটানে নিঃশেষ করে, দাড়ি মুছে তবে দম নিলেন। "ফোঃ—দুধটা তো বেশ ছিল! যাক্, আসা গেছে তবে।" তার পর ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে, প্রত্যেকের দিকে চেয়ে, মৃদু হাস্য করতে করতে আঙুল দিয়ে টেবিল বাজাতে বাজাতে বললেন "বেশ, বেশ",বোধ হ'ল সব দেখে শুনে ভদ্রলোক বেশ আমোদ বোধ করচেন। হঠাৎ বলে উঠলেন ভালো কথা, নিকোলীন, পদবীর দিকে তোমার বেশ নজর দেখচি, তাই বলে রাখচি আমি আর এখন ক্যাপ্টেন নই এখন আমায় এদিকে তারা লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ক'রে পাঠিয়েচে। আমার স্ত্রীর একখানা বাড়ীও রয়েচে তোমাদের এই সহরে, তাই এদিকে এসে আমরা হয়ত বসবাসও করতে পারি। আমার বোধ হয় ভবিষ্যতে কোনো বন্ধুর হাত দিয়ে আমাকে চিঠিপত্র পাঠানোই তোমাদের উচিত। যাক্ এসব কথা ধীরে ধীরে হবে'খন। বেশ বেশ!" সারাক্ষণ আঙুল টেবিলে বেজেই চলে, আর তিনি হাসেন। পীয়ার লক্ষ্য করল যে, তাঁর হাতের বোতাম সোনার, সাদা সার্টের চওড়া সম্মুখটাতেও একটি সুন্দর সোনার 'ষ্টাড্'।

অতঃপর একটি ছোট্ট প্যাকেট বেরুলো। "এ-ই পীয়ার, এদিকে এসো; এইটে মানে যা-তা নয়, একেবারে সাঁচ্চা রূপোর ঘড়ি। তখ্‌খনি ছুটে গিয়ে আর আর ছেলেদের তা দেখাতে না পেরে সেই সময় পীয়ারের দুঃখই হতে লাগল। বুড়ী হাততালি দিয়ে বলে উঠলো "এই তো তোমার বাবা"; বলতে গিয়ে বুড়ীর চোখ ছলছল করে উঠলো। অতিথি কিন্তু বুড়ীর কাঁধ চাপড়ে বললেন, "বাবা? বাবা? হুঁ—এ বিষয়টা অত জোর করে বলা যায় না। হা-হা-হা!" বুড়ো তখনো ছুঁচ হাতে বসেছিল, তার কণ্ঠে হা-হা-হা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। এই রকমের রসালাপ হলে সে উপভোগ করতে পারে বটে।

আগন্তুক বেরিয়ে গেলেন, পেছনে কোটের নীচে দু'হাত রেখে জায়গাটায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, আকাশ এবং ফিয়োর্ডের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "বেশ বেশ—বেশ বেশ।" পীয়ার সারাক্ষণ তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর তাঁকে দেখতে লাগল—যেমন করে লোকে তারা দেখে। তাঁর শোবার বন্দোবস্ত হ'ল এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে, সেখানে একখানি ঘর ছিল যার বিছানার চাদর ছিল। পীয়ার তাঁর সঙ্গে ব্যাগটা হাতে করে গেল। এই নবাগতের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল মার্টিন ক্রুভোল্ডের বাড়ীতে; লোকেরা তো সেখানে অবাক্ হয়ে ভিড় করে দাঁড়াল। মার্টিন নিজে পর্য্যন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। "পীয়ার, এটি বুঝি তোমার বন্ধু; এই নাও হে, এদিয়ে একটা মস্ত খামার কিনে ফেলতে পারবে।" এবার ছিল পাঁচ ক্রাউনের নোট, নোটখানা হাতে নিয়ে মার্টিন দাঁড়িয়ে রইল, চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। পীয়ারের বাবা সত্যিকার বাবাই বটেন।

মস্ত বড় ভদ্রলোক যিনি, তাঁর কাপড় ছাড়াটাও একটা সুন্দর ব্যাপার! ব্যাগের ভিতর থেকে নব নব বিস্ময়ের আবির্ভাব দেখে পীয়ার ভাবছিল 'একদিন আমিও এমনি সব জিনিষ পাব।' শয়ন-পরিচ্ছদ পরে ঘরের মাঝে পাইচারি দিতে দিতে গুন্‌গুন করে, রূপোয়-মোড়া একখানি ব্রাস্ দিয়ে তিনি তাঁর চুল দাড়ি বিন্যস্ত করলেন। তারপর বেরুল, শোবার সময় পরবার জন্য আর একটা কামিজ, তার কলারের চারিদিকে লালডুরি দেওয়া। পীয়ার আপনমনে মাথা নেড়ে এ সব মনের মাঝে সঞ্চয় করতে লাগল। আগন্তুক বিছানায় শুয়ে রূপোর ছিপি আঁটা একটি শিশি বার ক'রে ছিপি খুলে পেয়ালায় ঢেলে ড্রামখানেক রাত্রিবেলার পানীয় গ্রহণ করলেন তার পর মালাদেওয়া ( beaded ) সুতোয় বাঁধা লম্বা পাইপটির দিকে হাত বাড়ালেন। তার পর যখন বেশ ধোঁয়া আসতে

লাগল, দিব্যি করে লম্বা হয়ে শুয়ে পীয়ারের দিকে চেয়ে মৃদু হাস্য করলেন।

"আচ্ছা, বাবা! স্কুলে ভালই চ'লচে তো তোমার?"

পীয়ার পেছনে হাত রেখে, এক পা আগে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—"হ্যাঁ—মাষ্টার মশাই তো বলেন।"

"বার-বারং কত হয়?"

একেবারে বজ্রাঘাত। পীয়ার দশের কোঠা পার হয়নি।

"স্কুলে জিম্‌নাষ্টিক শেখায়?"

"জিম্—? কাকে বলে?"

"এই লাফানো, ডিগবাজি, দড়ি-চড়াই, ড্রিল, এই সব?"

"কিন্তু এ-সব, এ-সব কি খারাপ নয়?"

"খারাপ! হা-হা-হা! কি বল্‌লে, খারাপ? ও—তা হলে এখানে এই ধরণের সব খেয়াল লোকের, না? বেশ বেশ, হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেশালাইয়ের বাক্সটা দাও তো, হুঁ!" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান চল্‌ল, তার পর অকস্মাৎ বল্‌লেন—

"দেখ খোকা, তোমার যে একটি বোন ছিল তা জানতে কি?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"এক মায়ের পেটের বোন্ আর কি! আমি নিজেও ঠিক জানতাম না যে আমি কি ক'রে হ'লাম। কিন্তু সে যা হোক, তোমায় বলে রাখাই ভাল যে, তবু আমি বরাবর তোমার খরচ জুগিয়েছি, ঠিক এখন যেমন। তখন শুধু টাকাটা তোমার মাকে দিয়ে পাঠাতুম আর সে—হ্যাঁ সে বেচারীর আর একটি সন্তান ছিল, তার খরচ দেবার পিতা ছিল না। তাই সে আমার টাকা দিয়ে দু'জনের ব্যবস্থা করত। হা-হা-হা। যাক্ বেচারী! তাকে সে জন্য দোষ দেওয়া চলে না। মোট কথা, আমার

বোধ হয় তোমার সেই ছোট্ট সৎ বোনটির তত্ত্বাবধানও আমাদের করতে হবে, বড় হয়ে না ওঠা পর্য্যন্ত। তোমারও তাই মনে হয় না ?"

পীয়ারের চোখে জল আসে আর কি! মনে হওয়া ?—নিশ্চয়ই !

পরদিন পীয়ারের বাবা চলে গেলেন। যাবার মুখে ট্রোয়েনের সেই শোবার ঘরে শক্ত ফেল্ট হ্যাট্, ওভারকোট ইত্যাদি সমেত তিনি দাঁড়ালেন আর শেরিফ্ যেমন ক'রে গির্জ্জাদ্বারে দাঁড়িয়ে সাধারণ্যে ঘোষণা করেন তেমনি স্বরে বললেন, "ভালো কথা, ছেলেকে এই বছরেই যেন 'কনফার্ম্ম' করান হয়।" বুড়ী-মা তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করাব।"

"তার পর আমি চাই যে ওকে যেন উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয় ; আর আর ছেলেদের মাঝে সব চেয়ে ভাল যার, তারি মত। আর এই পঞ্চাশ ক্রাউন যেন সে বিদায়ী দক্ষিণা হিসেবে স্কুল মাষ্টার আর পাদ্রীকে দেয়।" এই বলে তিনি আরো কতকগুলো নোট দিলেন।

তার পর বলতে লাগলেন, "তার পর অবিশ্যি যতদিন না সে একটা ভদ্রস্থ পদ পায় ততদিন তার তত্ত্বাবধান করবো কিন্তু আগে দেখতে হবে কিসে ওর মাথা আছে, কি ও হতে চায়। সহরে এসে আমার সঙ্গে ওর এসব বিষয়ে কথাবার্ত্তা হওয়াই ভাল—যাক্, 'কন্‌ফার্ম্ম' হবার পর আমি সে সব বন্দোবস্ত ক'রে লিখবো। তবে যদি এর মাঝে অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনাই আমার ঘটে তা হলে সেভিংসব্যাঙ্কে ওর নামে কিছু টাকা রইল। আমার একটি বন্ধু আছেন তিনি এ বিষয়ের সবই জানেন তাঁর কাছে যেন জানায়। যাক্ গুড্ বাই, বহু ধন্যবাদ !"

তার পর ডাইনে বাঁয়ে মৃদু হাসি ছড়াতে ছড়াতে আর সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করতে করতে হ্যাট দুলিয়ে মস্ত লোকটি প্রস্থান করলেন।

এর পরের কয়েক দিন তো পীয়ার শূন্যের উপর দিয়ে চলতে লাগল,

সাধারণ মাটির পরে পা রেখে চলা তার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। লোকেরা কেবলি ওই সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের কথা ব'লে ওর মাথাটাকে ভ'রে ফেললে, হয়ত কয়েক হাজার ক্রাউন মাত্রই হবে, কিন্তু কে বলতে পারে দশ লাখও তো হ'তে পারে। দশ লাখ্‌! আর সে কি না এখন ডিনারে হেরিং খেয়ে আর রামা শ্যামা যেদো মেধোদের সঙ্গে সকলের মত আড্ডা দিয়ে বেড়ায়! উঃ, দশলাখ্‌ ক্রাউন!

হেমন্তের শেষাশেষি কনফার্মেশন এল; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের ডগার মাঝখান থেকে সেই আলকাতরা-দেওয়া দেয়াল, পুরানো কাঠের গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি হেমন্তের নীলাকাশে ছড়িয়ে যেতে লাগল। পীয়ারের মনে হলো যেন কোন্‌ এক দয়ালী বুড়ী-ঠাকু'মা স্নেহ ভরে ডাকচে আর বলচে "আয় আয়রে বুড়োরা আর জোয়ানেরা,—বুড়োরা আর জোয়ানেরা—ফিয়োর্ড থেকে, উপত্যকা থেকে,—উত্তর থেকে, দক্ষিণ থেকে, আয় আয়, সব দিনের সেরা এই আজকের দিন, সবার সেরা আজকের দিন—আয় আয় আয়রে!" এমনি ধারা শত শত বৎসর ধ'রে ঘণ্টাধ্বনি দিকে দিকে প্রেরণ ক'রে সে দাঁড়িয়ে আছে, আজ সে আমাদের ডাকচে। ছোটরা সব এসেচে, এ ওর নূতন বেশ নিরীক্ষণ করচে আর সযত্নে ভাঁজকরা পরিষ্কার সাদা রুমাল দিয়ে নাক পরিষ্কার করচে। বরাত-গুণে পাশ করেচে পীটার য়োনিস্পেন, সেও আসচে, কিন্তু তার দর্জ্জি নূতন পোষাক তৈরী ক'রে উঠতে পারে নি' ব'লে পীয়ারের জ্যাকেট ধার ক'রে তাই প'রে আসতে হয়েচে। ছেলেরা বয়স্কের মত হাসবার চেষ্টা করচে আর পরস্পরকে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করচে। দু'একজন এখনো স্কুলের পুরানো ঝগড়ার হিসেব মিটিয়ে উঠতে পারে নি হয়ত, কিন্তু যাক্‌গে, সে-সব পুরানো কথা ভুলে যাওয়াই এখন সঙ্গত। পীয়ার য়োহান কোইয়্যাকে দেখতে পেল, সে গত গ্রীষ্মে তার একটা পেন্সিল চুরি করেছিল, কিন্তু এখন আর

সে-সব নিয়ে হৈ-চৈ করা দরকারই মনে হল না তার। সেই যে বড় গির্জ্জাদ্বারের ভিতর দিয়ে অর্গানের ধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়ে আসচে তাদেরই দিকে, সেই দিকে তারা পাথরের ধাপ বেয়ে এক সঙ্গে এগিয়ে যায়, আর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে, "গত গ্রীষ্মের পর থেকে কেমন আছ ভাই ?"

কত ভালো আর কত স্নেহময় মনে হয় এই ছোট্ট গির্জ্জাটিকে, এখানে যেদিকে চাও, সবাই যেন তোমার স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্চে। ছোট্ট শার্শির মাঝ দিয়ে এমনিধারা মৃদু আলো এসে পড়চে যে, কুৎসিত বেচারাদের মুখগুলোও সুন্দর দেখাচ্চে। অর্গ্যানের ধ্বনি যেন আলোকেরই মধুর রূপান্তর। Nave-এর একদিকে দেখা যাচ্চে যত সব ছেলেদের জল-চকচকে মাথাগুলো আর একদিকে অভিনিবিষ্ট মূর্ত্তিতে, প্রার্থনা-পুস্তক হাতে নিয়ে, মাথায় রুমাল বেঁধে, এই আজকেই সর্ব্বপ্রথম বয়স্কদের পোষাক প'রে রয়েচে ভবিষ্যতের ছোট ছোট মায়েরা। এই তো তারা সবাই গান ধরল। প্রবীণেরা আজ পেছনে স্থান পেয়েচে, কিন্তু তারাও যোগ দিয়েচে; বইয়ের থেকে মাঝে মাঝে তারা মুখ তুলে সামনের ঐ সব তরুণ মাথাগুলোর দিকে তাকাচ্চে আর বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবচে, না জানি এদের জীবনগুলো কেমন হবে। গাইতে গাইতে তরুণেরাও ভাবচে, "আজ নবীনের আরম্ভ হলো। খেলা-ধূলো হাসি-তামাসার অবসান আজ! আজ থেকে আমরাও বয়স্ক!" কিন্তু গির্জ্জা আর তার ভেতরকার স'বি যেন বলচে, "যদি কখনো বিপদ আসে, এইখানে আমার কাছে আসিস্।" ওই প্রার্থনা-বেদীর পানে তাকাও না, কাঠের খোদাইয়ের মাঝে একখানি পুরা বাইবেল রয়েচে—কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র হাতে মোজেস্ (Mozes) এর মুখখানা আজ যেন কোমল দেখাচ্চে; বেশ বুঝতে পারা যায় যে, মোটের

ওপর ওঁর অভিপ্রায় কিছু মন্দ নয়। সেণ্ট পীটার হাতে চাবি নিয়ে উর্দ্ধে ইঙ্গিত করচেন, মনে হচ্চে যেন কোন স্নেহার্দ্র খুড়ো বাজার থেকে বেশ একটা কিছু নিয়ে বাড়ী আসচেন। তার পর দেয়ালের 'পরে চিত্রিত কিম্বা খোদাই-করা দেবদূতেরা যেন ঐ অর্গানের ধ্বনি আর প্রার্থনার সুর আপনাদের মাঝে ফুটিয়ে তুলেচে; তারা গির্জ্জার গোল ছাতটাকে নীলাকাশের বিস্তার দান করেচে; আলোক এবং সঙ্গীত এবং প্রার্থনা-কারীরা সব যেন এক হয়ে মিশে গিয়ে অনন্ত আকাশে উধাও হয়ে চলেচে।

পীয়ার সারাক্ষণ ভাবচে—ধনীর মত ধনী হই না হই, কুচ পরোয়া নেই, ধর্ম্মযাজক আমি হবই। আর তখন বোধ হয় আমি আমার সব টাকা দিয়ে এমন একটা গির্জ্জা তৈরী করতে পারব যা কেউ কখনো দেখেনি। আর যদি মার্টিন ক্রুভোল্ড বে' করতে রাজি হয় তা হলে সেখানে সর্ব্ব প্রথম বিয়ে দেবো মার্টিনের সঙ্গে ছোট্ট বোন লুইসের। দেখ না, কি করি!

কয়েক দিন পরেই সহরে গিয়ে স্কুলে পড়বার অনুমতি চেয়ে সে তার বাবাকে পত্র দিল। অনেক দিন চ'লে গেল, শেষে অপরিচিত হাতের লেখা একখানি পত্র এল; ট্রোয়েনের সব প্রবীণেরা আবার জুটলো এসে চিঠিখানি পড়বার জন্য। কিন্তু তারা একেবারে অবাক্ হয়ে গেল যখন এই কথাগুলো তারা পড়ল:—"সম্ভবতঃ এতদিনে খবরের কাগজে জানতে পেরেচ যে, তোমার সাহায্যদাতা কর্ণেল হল্‌ম্ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। সেইজন্য তোমায় অনুরোধ করচি যে, যথাশীঘ্র তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে, কারণ তোমার সঙ্গে কতকগুলো দরকারী কথার মীমাংসা দরকার—তোমার বিশ্বস্ত জে, গ্র্যণ্ট, সিনিয়র মাষ্টার।"

তারা দাঁড়িয়ে মুখচাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

পীয়ার কাঁদতে লাগল, তবে স্বীকার করতে হবে যে, এ কান্না বিশেষ ক'রে এই ভেবে যে, এবার ট্রোয়েনের সব অধিবাসীদের, সেই দুটো গাই আর তার বাছুর আর মেটে রঙের বেড়ালটাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। হয়ত কালই তাকে সোজা ক্রিষ্টিয়ানিয়া পর্য্যন্ত স্কুলে পড়বার জন্য চ'লে যেতে হবে; আবার যখন সে ফিরে আসবে তখন হয়ত আর বুড়ী-মাকে সে দেখতে পাবে না।

তাই যখন সেই বসন্ত-চিহ্নিত গিন্নি-মা আর সেই কুশপেয়ে বুড়ো মানুষটি তাকে জেটি অবধি পৌঁছে দিতে এলো তখন তিনজনেরই মন বিষাদ-ভরা। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিয়োর্ড-ষ্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল আর তীরে ঐ দুটি মূর্ত্তি ক্রমশঃ ছোট হয়ে যেতে লাগল। তার পর অন্তরীপের অন্তরালে ছোট্ট গ্রামখানির কুটীরগুলোও একটির পর আর একটি মিলিয়ে গেল, তার পর ট্রোয়েনের সবটা চলে গেল—সেই সব পাহাড় আর জঙ্গল—যেখানে সে কাঠ কেটেচে, দল-ছাড়া পশুদের খুঁজে ফিরেচে! দ্রুত গতিতে সব জানা জিনিষগুলো অপসৃত হয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তার পর সবটাই অদৃশ্য হয়ে গেল, সেই সঙ্গে তার বালক বয়সেরও অবসান হ'ল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন সন্ধ্যা নাম্‌ল তখন অন্ধকারে তার সুমুখে অনেক দূরে সে অগণিত আলোক দেখতে পেল। তার পর ছোট কাঠের সিন্ধুকটি কাঁধে করে জেটির পাশের গলিগুলো বেয়ে গ্রাম্য লোকদের সেই হোটেলটির সন্ধানে চলল—যেখানে লফোটেন-যাত্রী নৌকারোহীদের সঙ্গে পূর্ব্বে কয়েকবার সে এসেছিল।

পরদিন সকালে, ঘরে-বোনা গ্রাম্য পোষাক পরে সে রিভার ষ্ট্রীট

বেয়ে পুল পার হয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে, পথ জিজ্ঞেস করতে করতে এক বাংলোতে গিয়ে উপস্থিত হলো। অবশেষে একটা বাগানের ভেতর সাদারঙ দেওয়া একখানি কাঠের বাড়ীর বাইরে এসে সে দাঁড়াল। এই সেই স্থান—যেখানে তার অদৃষ্টে কি আছে সে জানতে পারবে। গ্রাম্য-রীতি-অনুযায়ী সে রসুইখানার দোরে গিয়ে হাজির হল!

একটি শক্ত-সমর্থ চাকরাণী মস্ত সাদা "এপ্রন" পরে বেশ সশব্দে রসুইখানার জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখছিল; সেখানে কফি এবং অন্য ভালো ভালো খাদ্যদ্রব্যের মনোরম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি দোর খুলে গেল, আর গাউন-পরা একটি লোক দেখা দিলেন—লোকটি লম্বা, চুলগুলো লাল, লম্বা লাল নাকের ওপর সোনার চশমা চড়ানো আর ঘন কেশ এবং ছোট্ট খোঁচা খোঁচা গোঁফ জোড়াটি ঈষৎ পাকা। দু'একবার হাই তুলে হাঁচি সুরু হলো—হেঁই-চো—তার পর মস্ত রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে বিরক্তভাবে বলতে লাগলেন "আর হতভাগা সর্দ্দি, ছাড়বে না কিছুতেই! আরে বার্থা, আমার মোজা কই? শুকিয়েচে কি?

মেয়েটি মাথা হেলিয়ে বললে "আজ সকালে আগুন জ্বালার পর থেকেই তো টাঙ্গিয়ে রেখেছি।"

"আচ্ছা এই বালক ভদ্রলোকটি কে জানতে পারি কি?" সোনার চশমা এবার পুরোপুরি পীয়ারের দিকে ফিরল, পীয়ার দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল।

চাকরাণী বললে "বাবু, উনি নাকি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চান।"

"ও—গ্রাম থেকে এসেচে দেখচি। কিহে ছোকরা, তোমার কিছু বিক্রী করবার আছে নাকি?"

পীয়ার বলল "না"। একখানা চিঠি গিয়েছিল তার কাছে তাই··

লাল মাথাটি তাই শুনে রীতিমত ভীতিগ্রস্ত হলো আর গাউন-পরা দেহখানি পেছন দিকে সরতে লাগল কিছু একটা আশ্রয়ের আশায়। চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার মেয়েটির দিকে চেয়ে দীর্ঘ তর্জ্জনীটি পীয়ারের দিকে তুলে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, এদিকে চলে এসো তো বাপু।"

পীয়ার যে ঘরে গিয়ে ঢুকল তার দেয়াল-ভরা সারি সারি কেতাব আর মাঝখানে একটা বড় টেবিল্। "বসো হে বসো" বলে উদ্বিগ্নভাবে গলাটাকে পরিষ্কার ক'রে একবার চকিতের মত তার দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা পাইপ উঠিয়ে নিয়ে তাতে তামাক সেজে বললেন, "হুঁ, তা হলে সেই তুমি! এই হলো গে পীয়ার, হুঁ।" পাইপটা ধরিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে আবার হাঁচতে বাধ্য হলেন—শেষটায় টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে লম্বা পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে আবার ধূমপান করতে লাগলেন।

"দেখতে তুমি এরকমটি হয়েচ তা হলে?" বলেই হঠাৎ ফ্রেমে-বাঁধা একখানা ফটোর দিকে হাত বাড়ালেন। পীয়ার দেখিল—সৈনিক-বেশে সজ্জিত তার বাবার ছবি। স্কুলমাষ্টার চশমা উঠিয়ে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার পর আবার চশমা নামিয়ে পীয়ারের মুখখানি পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে কাটল, তার পর বললেন, "ও তাইত বটে, হুঁ; পীয়ারের দিকে ফিরে বললেন "বাপু, বড় হঠাৎ হয়ে গেল, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীর মৃত্যু একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আজ তাঁর কবর।"

পীয়ার ভাবল "শুভাকাঙ্ক্ষী? 'তোমার বাবা' বলচেন না কেন।"

স্কুলমাষ্টার জানালার দিকে তাকিয়েছিলেন, বললেন, হ্যাঁ কিছুকাল আগে তোমায় তিনি যা কিছু সাহায্য করেছেন সে সম্বন্ধে—হুঁ—সেই সম্বন্ধে সব কথাই আমায় জানিয়েছিলেন। আর যদি তাঁর কিছু হয়

তা হলে আমাকে তোমার 'পরে নজর রাখতে বলেছিলেন!" চশমাটা পীয়ারের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, "তা'লে, তা হলে এখন তুমি নিজে নিজেই ব্যবস্থা করে নেবে, কি বল?"

পীয়ার নিজের জায়গায় একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বলল, "হ্যাঁ"।

"এখন তোমায় ঠিক করতে হবে যে কোন্ রাস্তা তুমি ধরবে।"

পীয়ার আরো সোজা হয়ে ব'সে আবার বলল, "হ্যাঁ।"

"যাদের মাঝখানে এতদিন লালিত হয়েচ সেই সব সাদাসিধে লোকদের মত বোধ করি তুমিও জেলে হতেই চাও?"

অবজ্ঞাভরে মাথা নেড়ে পীয়ার বলল, "না।" এই লোকটা কি পীয়ারকে বোকা ঠাউরেচে নাকি!

"তা হলে কোনো কাজ-কর্ম্ম?"

"না।"

"ও, তা হলে বোধ করি আমেরিকা? বেশ সেখানে যাবার সঙ্গী পাওয়া মুস্কিল নয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল যেরকম দলে দলে সব লোক চলেচে তাতে—"

পীয়ার আত্মসম্বরণ করে বলল, "না, না, মোটেই তা নয়!" দেরী না করে অবিলম্বে বলে ফেলাটাই শ্রেয়ঃ। সহুরে ভঙ্গীতে বেশ সতর্ক উচ্চারণ সহ সে বলল "আমি ধর্ম্মযাজক হতে চাই।"

স্কুলমাষ্টার এক হাতে পাইপ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আর এক হাত কানের কাছে নিয়ে গিয়ে যেন ভাল করে শোনবার জন্যই জিজ্ঞাসা করলেন "কি?—কি বললে তুমি?"

পীয়ার বললে "ধর্ম্মযাজক" কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁর চেয়ারের পেছনটায় গিয়ে দাঁড়াল; কারণ, ভাব দেখে বোধ হচ্ছিল যেন স্কুল-মাষ্টার তার মাথার পরে পাইপটা ছুঁড়ে মারবেন।

কিন্তু হঠাৎ সেই লাল মুখখানা হাস্য-বিকশিত হয়ে উঠল আর সেই সঙ্গে এমনি একরাশি সবুজ দন্তরাশি উদ্ঘাটিত হলো যা পীয়ার আগে আর কখনো দেখে নি। তারপর কেমন একটু সুর করে মাথা নেড়ে বললেন, "ধর্ম্মযাজক? বাস্তবিকই তো, এ আর এমন কি একটা ব্যাপার!" উঠলেন, উঠে বারদুই ঘরখানা পাইচারি করে তিনি থামলেন, মাথা নেড়ে একটু গুরুগম্ভীর চালে একটা বইয়ের তাক লক্ষ্য করেই বলতে লাগলেন "হুঁ, বাস্তবিক, বাস্তবিক, আমাদের আশাটা একটু বড় রকমের, তাই না? কি বল?"

পীয়ারের দিকে হঠাৎ ফিরে বললেন, "দ্যাখো হে বন্ধুবর, তোমার কি মনে হয় না যে, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী আজ পর্য্যন্ত যা করেচেন তাতেই যথেষ্ট দয়া করেচেন?"

পীয়ারের গলাটা এবার একটু কাঁপতে লাগল, বলল, "হাঁ তা করেচেন বই কি!"

"তোমার মত অবস্থার অমন হাজার হাজার ছেলে রয়েচে যারা কনফার্ম্মেশনের পর সংসারে একান্ত নিঃসহায় হয়ে পড়ে, যাদের নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়, একটি জনপ্রাণীও যাদের সাহায্য করতে আসে না।"

পীয়ার অনিচ্ছাসত্ত্বেও দোরের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট-কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ।"

"আমি বুঝতে পারচি না তোমার মাথায় এ সব পাগলের খেয়াল কে ঢুকিয়েচে?"

অনেকটা চেষ্টা করে পীয়ারের কণ্ঠ দিয়ে বেরুলো "এই আমি বরাবর চেয়েচি। আর বাবাও—"

"কে? বাবা? কি, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা বলচ নাকি?"

পীয়ার আর থাকতে পারল না, বলল, "কেন তিনিই তো আমার বাবা ছিলেন ? না ?"

স্কুল-মাষ্টার টলতে টলতে পেছনে চেয়ারে বসে পড়লেন, বদ্ধপাগলের দিকে যেমন ক'রে হতাশভাবে লোকে চায় তেমনি ভাবে চেয়ে রইলেন। শেষকালে একটুখানি আত্মসম্বরণ ক'রে বললেন, "ছাখো ছোকরা কি বলে গিয়ে, আজ্ থেকে তাঁকে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই খুশি থাকতে পারবে না কি ? তাঁকে তাই বলাই কি উচিত নয় ?"

প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে পীয়ার অস্ফুটস্বরে বলল "হ্যাঁ।"

"নিশ্চয়ই তুমি, আর ওই যারা তোমার মাথায় এসব বাজে কথা ঢুকিয়েচে তারা—সেই টাকার কথাটা ভাবচ যা তিনি—হুঁ।"

"হ্যাঁ, সেভিং ব্যাঙ্কের হিসেব একটা নেই কি ?"

"ওঃ হো—তাই বল, হ্যাঁ আছে আছে, আমারই হাতে সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট আছে।"

তিনি উঠলেন, উঠে, একটা ড্রয়ারের মাঝ থেকে খুঁজে পেতে একখানা ছোট্ট সব্জে মলাট-দেওয়া খাতা বার করলেন। পীয়ারের দৃষ্টি আর সেদিক থেকে ফেরে না।

"এই তো সেই হিসেব। তোমার নামে জমা আছে আঠারো শ' ক্রাউন।"

সর্ব্বনাশ—পীয়ারের মনে হলো যেন সে মেজের ফাঁক দিয়ে একেবারে পাতালে গিয়ে পড়ল। দশ লাখ ক্রাউন—ধর্ম্মযাজক—বিশপ—ক্রিষ্টিয়ানিয়া—আরো যা-কিছু—সব স্বপ্ন অদৃশ্য হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

"যেদিন তুমি কারিগর কিম্বা কৃষক কিম্বা জেলের কাজ নিজের চেষ্টায় আরম্ভ করতে পারবে, আর আমি যেদিন আমার বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে বুঝতে পারবো, যে তোমায় সাহায্য করা উচিত, সেদিন আমি

এই বই তোমায় দেবো, তার পূর্ব্বে কিছুতেই না। আমি যা বললাম, বুঝতে পারচ তো?"

"হ্যাঁ।"

"আমি নিশ্চিত জানি যে, সেই পর্য্যন্ত যেন এই টাকা আমার কাছেই থাকে এবং তাতে কোনোমতে হাত না পড়ে, দাতারও ইচ্ছা এই ছিল।"

পীয়ার অস্ফুটস্বরে বললে, "হুঁ।"

"কি? কাঁদচ নাকি?"

"ন্—না তবে নমস্কার—"

"না, একটু বসো, যেও না। বসো। দু একটা কথার মীমাংসা এখনি আমাদের ক'রে ফেলা দরকার। প্রথমতঃ বাপু, তুমি আমায় বিশ্বাস করো। আমি যে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এ কি তুমি বিশ্বাস কর, না, কর না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ করি।"

"তা হলে মানচ যে, এই সব কলেজে যাওয়া ইত্যাদি খেয়ালগুলোকে মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিতে হবে?"

"আ—জ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর নিজেই তো দেখতে পাচ্চ যে তোমার তেমন মানসিক শক্তি আছে এটা ধরে নিলেও, যে টাকা রয়েচে তা দান হিসেবে মস্ত হলেও, তোমায় বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না।"

"আজ্ঞে ন্—না।"

"আর এ দিকে, যদি তুমি চাও, আমি খুসী হয়ে তোমাকে এখানকার একজন ভালো কারিগরের কাছে বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি। সেখানে তোমার খাই-খরচ লাগবে না, [illegible]

তা হলে বছর খানেক, বছর দুই জামা কাপড়ের বন্দোবস্ত করতে পারি। আর যতদিন নিজে উপার্জ্জন না করচ ততদিন বাজে খরচ ক'রে ওড়াবার জন্য হাত-খরচ না পাওয়াই ভালো।"

পীয়ার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল, দাঁড়ানো অবস্থাতেই যেন সে ঝুঁকে পড়ল। যখন সে দেখল যে সেই সবুজ বইখানা আবার ড্রয়ারে চাবি বন্ধ হলো, গাউনের নীচের পকেটে চাবির তোড়া সশব্দে ফিরে গেল, তখন তার মনে হলো কে যেন তার দিকে বিদ্রূপ ক'রে আঙুল উঠিয়ে বলচে, 'কেমন!'

"তারপর আর এক কথা। তোমার নাম। কি নাম অর্থাৎ কি ডাকনাম তুমি ব্যবহার করবে ভাবচ?"

কনফার্ম্মেশন-এর সময় বিশপ তার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, সে যেমন বলেছিল তেমনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বললে, "আমার নাম পীয়ার হল্‌ম্!"

স্কুল-মাষ্টার মুখ টিপলেন, চশমা খুলে পরিষ্কার ক'রে আবার পরলেন, বইয়ের তাকের দিকে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ও—হ্যাঁ, বটে, আমিও ঠিক তাই মনে করেছিলাম।"

তারপর এগিয়ে এসে স্নেহভরে পীয়ারের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ছাখো হে, সে হতে পারে না।"

পীয়ারের ভেতরটা কেঁপে উঠলো, সে কি আবার কোন অন্যায় করল?

"ছাখো বালক, তুমি কি ভেবে দেখেচ যে এইখানে আরো অন্য লোক ঠিক এই নামেরই থাকতে পারে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু—"

"থামো, থামো—আর যদি, এই কি বলে, এই বিষয়টা জানাজানি

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটা পাড়াগাঁয়ে ছেলে তার সোনালি মাথায় একটা টুপি দিয়ে নীলরঙের গ্রাম্য পোযাক পরে সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্চে, তাতে কার কি আসচে যাচ্চে। দুহাত পকেটে পুরে শীস্ দিতে দিতে চারদিকে দেখতে দেখতে, কখনো বা কিছুই না দেখে, দোকানের জানলার পানে চাইতে চাইতে চলেচে সে! কিন্তু ওই হ্যাটে-ঢাকা যে মাথাটি, তার ভেতরে চাইলে দেখতে পাবে হয়ত, ক্ষুদ্র হলেও একটা সমগ্র জগৎ হঠাৎ সেখানে ধ্বংস হয়ে গেছে; হয়ত রাস্তার লোকে পাছে দেখে ফেলে সেই ভয়ে কান্না চাপবার জন্যই প্রাণপণে শীস্ দিচ্চে সে। সামনের গাড়ী থেকে স'রে দাঁড়াতে গিয়ে সে একজন লোকের গায়েই গিয়ে পড়ল। লোকটা তার সিগারটা রাস্তার পাশের নালায় ফেলে দিয়ে রেগে ব'লে উঠল, 'হতভাগা গেঁয়ো অসভ্য কোথাকার'; এইমাত্র, তার পর মুহূর্ত্তেই সে এই ছেলেটার কথা সব ভুলে গেল কিন্তু আর একটু এগিয়ে যেতেই কোন আঙিনা থেকে একটা মস্ত কুকুর লাফিয়ে এলো, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে স্থূলাঙ্গিনী এক বৃদ্ধাকে উল্টে ফেলল; হ্যাট-পরা ছেলেটা তার সব দুঃখ-কষ্টের মাঝেও সারা দেহখানি আলোড়িত ক'রে উচ্চহাস্য না ক'রে থাকতে পারল না।

সেই দিন বিকেলবেলা পীয়ার দুর্গের নীচে একটা দেওয়ালের ওপর বসে বসে একটা ঘাসের ডাঁটা কামড়াচ্ছিল আর আঙুলের ডগাগুলোকে মটকাচ্ছিল। তার নীচে অক্টোবরের মৃদু সূর্য্যালোকে সহর আর ফিয়োর্ড—সেখানে থেকে, মলিন রঙের কুয়াসার মাঝ দিয়ে কারখানা থেকে, বন্দর থেকে কত রকমের কোলাহল, যান-বাহনের ঘড়-ঘড়ানি শব্দ তার

কানে আসছিল। সেখানে সে ব'সে রইল আর ওপরে দেওয়ালের পর দিয়ে শান্ত্রী তার রাইফেল ঝুলিয়ে একবার সামনে একবার পেছনে পায়চারি দিতে লাগল তালে তালে পা ফেলে—লেফট্, রাইট্ লেফট্—

খুব ঊর্দ্ধে উঠে যেতেও পারে—আবার গভীর নিম্নে পতনও হতে পারে, কিন্তু একেবারে ঘাড়খানা যদি না ভাঙে তো এমন কিছু ভয়ানক ক্ষতি তাতেও হয় না। ধীরে ধীরে পীয়ার বুঝতে লাগল যে, মোটের ওপর সে বেঁচেই আছে তখনো। দরদ দেখাবার, পরামর্শ দেবার কেউ থাকলেও, দুনিয়া যখন তোমার দিকে বিমুখ হয়ে দাঁড়ায়, তখন অবস্থাটাকে মন্দই বলতে হবে। কিন্তু যখন তোমার চারদিকের লোকেরা একেবারে অপরিচিত, তখন বসে থেকে খড়কুটো নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে নিজের ভাবনা একটু না ভেবে আর পথ কি আছে! পীয়ার ভাবছিল লম্বা গাউনপরা সেই জীবটির কথা—যে তার ব্যাঙ্কের বইখানা নিয়ে চাবি বন্ধ ক'রে, তার দিকে চাবি ঝন্‌ঝনিয়ে বলেছিল 'ব্যস্,' যে তাকে বিশপত্ব বিচ্যুত ক'রে, হাঁচতে হাঁচতে তাকে সেই পেশায় বাঁধবার চেষ্টা করেছিল যাতে পীয়ারকে সারাজীবন একখানি ইস্ত্রীকল নিয়ে দরজি পীয়ার বলে পরিচিত হ'তে হতো। কিন্তু সে কিছুতেই তা হবে না। ব'সে ব'সে পীয়ার নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল আর এপর্য্যন্ত যে বস্তুটার কোনো বিশেষ প্রয়োজন কখনো হয়নি, সেইটেকে সে কোথাও থেকে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগল; সে বস্তুটি হচ্ছে, এই সারাটা বিশাল জগতের বিপক্ষে দাঁড় করান যেতে পারে এমনিতরো একটি নিজের ইচ্ছাশক্তি! কি সে করবে এখন? ইচ্ছে হলো সে প্রথম ট্রোয়েনে ফিরে গিয়ে বুড়ো বাবা-মার সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করে: তারা তার জন্য দুঃখিত হবে, বলবে "আহা বেচারা", তারা

প্রার্থনাও করবে তার জন্য—কিন্তু সে জানে, একদিন কি দুদিন পরে তারা খাবার সময় তার দিকে তাকাতে থাকবে আর ভাববে যে, এখন আর তার খরচ জোগাবার কেউ নেই! আর ভাববে যে, দিন কাল বড় মাগ্‌গির। নাঃ—এখন আর সেখানে তার স্থান নেই। কিন্তু তা হলে কি করবে সে এখন? স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে যে দুনিয়ায় একেবারে একলা হওয়া বিশেষ সোজা ব্যাপার নয়।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সে বসে রয়েছে গির্জ্জা প্রাঙ্গণের পাশে শৈলগাত্রে হরিদ্রায়মান বৃক্ষরাশির তলে; আর বাবার কবর কোথায় হবে সেই কথাটাই কেমন স্বপ্নময় বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবচে। তাঁর সঙ্গে এই স্কুলমাষ্টারের কত বড় প্রভেদ! তাঁর উপদেশ দেবার কোনো চেষ্টাই ছিল না, তাঁর ছেলে নিজের কি পরিচয় দেবে, তা নিয়েও মাথাব্যথা ছিল না। তিনি কেন ম'রে গেলেন?

ওই সুন্দর বলিষ্ঠ মানুষটি—যিনি ব্রুশ দিয়ে এত যত্নের সঙ্গে নিজের কেশ শ্মশ্রু বিন্যাস করেছিলেন, তিনি এখন একটা কফিনের মধ্যে চুপটি ক'রে শুয়ে আছেন, আর শিগ্‌গিরই মাটি চাপা পড়বেন, এ ভাবতে তার কেমন অদ্ভুত মনে হতে লাগল।—

তখন লোকেরা পাহাড়ের ওপরে উঠে গির্জ্জা-অঙ্গনে প্রবেশ করচে, পরণে তাদের কালো পোষাক, মাথায় তাদের চক্‌চকে লম্বা হ্যাট—কিন্তু সেই সঙ্গে কটি-বন্ধপরা, আর পালক-দেওয়া হ্যাট-পরা কয়েকজন রাজ-কর্ম্মচারীও ছিলেন। তার পর এলো একদল সৈনিক ব্যাণ্ড, তাদের পেতলের যন্ত্রপাতি নিয়ে। ভিড়ের সঙ্গে পীয়ারও অঙ্গনের ভেতর গিয়ে ঢুকল, কিন্তু সকলের কাছে থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে একটা বড় মনুমেণ্টের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হলো "এ নিশ্চয়ই বাবার সমাধি"—অমনি তার সমস্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল।

পীয়ার অনুমান করল যে, ওই যারা মৃতাগার থেকে খোলা কবরের দিকে দুটো সারি বেঁধে মার্চ ক'রে আসচে তারা নিশ্চয়ই কেডেট স্কুলের হবে। জায়গাটা তখন প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে; মেয়েদের চোখে রুমাল উঠেচে; একটি প্রবীণা মহিলা, সৈনিকের পোষাক-পরা একটি দীর্ঘাকায় পুরুষের বাহু আশ্রয় ক'রে, কৃষ্ণ পরিচ্ছদে মৃতাগারে প্রবেশ করলেন। পীয়ার ভাবলে "উনি নিশ্চয়ই বাবার স্ত্রী আর ওই কালো পোষাকে তরুণী মহিলারা আমার সৎবোন্, আর ওই তরুণ লেফ্‌টেনাণ্ট—আমার সৎ-ভাই।" কি অদ্ভুত এ সব। প্রার্থনাবেদী থেকে সঙ্গীতের শব্দ আসতে লাগল। একটু পরেই ছজন সার্জ্জেণ্ট রাশি রাশি পুষ্পাচ্ছন্ন একটি কফিন নিয়ে বেরিয়ে এলো। "প্রেজেণ্ট আর্ম্মস্!" অমনি সৈন্যেরা তাদের অস্ত্র প্রদর্শন (present) করল, ব্যাণ্ড স্লোমার্চের তালে তালে বাজতে লাগল আর ওই দুসারি সৈন্যের মাঝ দিয়ে কফিনের আগে আগে এগিয়ে গেল। তার পেছনে শোকার্ত্তের দল ভিড় ক'রে এলো। সেই কৃষ্ণবেশা মহিলাটি আবার বেরিয়ে এলেন, রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে; চলতেই যেন পাচ্ছিলেন না, যদিচ সেই দীর্ঘ রাজকর্ম্মচারীটির বাহুটি বেশ ধরে ছিলেন। কিন্তু এই যুগলের ঠিক সামনে কফিনের পেছনেই সোনার এপোলেট-লাগানো সুন্দর সৈনিকবেশে পালক দেওয়া হ্যাট এবং তলোয়ার নিয়ে একটি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ যাচ্ছিলেন, তাঁর জামায় একটি প্যাডে দুই রত্নখচিত তারা। তার পর সেই শোকার্ত্তের লম্বা মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেই দিকে, যেখানে ধর্ম্মযাজক হাতে একখানা খুন্তি নিয়ে গোরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ধর্ম্মযাজক তার পিতার সম্বন্ধে কি বলেন শোনবার আগ্রহে পীয়ার ব্যগ্র হয়ে উঠল, যদিচ কেমন ক'রে সে যেন বুঝতে পেরেছিল যে, খুব

কাছে যাওয়া তার পক্ষে উচিত হবে না ; তবু সে নিজেরই অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে একটু কাছে এগিয়ে গেল।

ব্যাণ্ডের সঙ্গে কবরের পাশে একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত গাওয়া হলো। পীয়ার মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিলে। সে এত বেশি তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, সে বুঝতেই পারে নি যে, শোকার্ত্তদের মাঝে একজন তাকে খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করচেন, সেই লোকটির চোখে চশমা, মাথায় চক্চকে একটা হ্যাট। তিনি যখন হাঁচতে আরম্ভ করলেন তখন পীয়ার তাঁকে চিনতে পারল। ইনি সেই স্কুল মাষ্টারমশায়, তার দিকে এমনি বিকট উগ্রমূর্ত্তিতে চাইতে লাগলেন যে, মনে হলো চশমা থেকে হয়ত বা আগুনই ঠিকরে পড়বে।

কালো দস্তানা মোড়া হাতগুলো পরস্পরকে পীড়ন করতে লাগল ; তিনি পীয়ারের সামনে ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে লাগলেন, "তুমি—তুমি—তুমি কি পাগল নাকি ? এখানে তুমি কি করচ ? আজকের মত দিনে কি শেষটায় তুমি একটা ভয়ানক কাণ্ড করতে চাও ? যাও, শুনতে পাচ্চ, এক্ষুনি যাও এখান থেকে। ভগবানের দোহাই, কেউ দেখবার আগে এখান থেকে পালাও। ফের যদি তুমি এখানে আস, তা হলে—" এই শাসানো শুনতে শুনতে পেছন ফিরে পীয়ার পলায়ন করল, মনে হলো যেন মানুষের কণ্ঠস্বর, ব্যাণ্ডের সুর প্রার্থনায় বিপুলতর হয়ে উঠে তার পিঠে কেবলি আঘাত করচে আর তাকে তাড়া ক'রে চলেচে।

যখন সে থেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন সে অনেক নীচে সহরে গিয়ে পৌঁছেচে। একটা কথা সে স্পষ্ট বুঝল যে, স্কুলমাষ্টারের সামনে যাওয়া আর হতে পারবে না। তার সবি গেল ! সে যা করেচে তা হয়তো এত অন্যায় যে তাতে জেল পর্য্যন্ত হতে পারে, এমনিতরো সংশয় তার মন থেকে যেতে চাইল না।

পরদিন ট্রোয়েনের তারা যখন ডিনার খাচ্ছে, তখন বড় ছেলে জানালার বাইরে তাকিয়ে বলে উঠল, "ওই যে পীয়ার আসচে।"

সে প্রবেশ করতেই সেই ভালো-মেয়ে মানুষটি ব'লে উঠলো, "রক্ষে করুন ভগবান্, কি হয়েচে পীয়ার, অসুখ করেচে নাকি ?"

আঃ, আবার সেই পুরাণো পরিচিত চামড়ার ব্যাগের মাঝে আশ্রয় নিতে সেই রাত্তিরে বড় ভালোই লাগল। বুড়ীমা শয্যাপার্শ্বে বসে সান্ত্বনা দেবার জন্য ভগবানের কথা বলতে লাগল, কাপড়ের নীচে কিন্তু পীয়ারের হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসতে লাগল; কি জানি কেন তার এখন মনে হতে লাগল, ভগবান্ হচ্চে গাউন-পরা একরকমের স্কুলমাষ্টার। তবু যা হোক, বুড়ীমাকে কাছে পেয়ে, তার কথা শুনে সে সান্ত্বনা লাভ করল।

তার পর যে সব দিন এল, পীয়ারকে অনেক কিছুই সইতে হলো,—তার চলা-ফেরার আশে-পাশে অনেক টিট্‌কারী, 'ত্মাখো ত্মাখো ধর্ম্মযাজক যাচ্চেন' ব'লে অনেক ফিস্ ফিসানী। খেতে ব'সে প্রতি গ্রাস তাকে লজ্জা দেয়। খোরাক পোষাকের ব্যয় কতকটা বহন করবার জন্য দূরদূরান্তরের খামারে পীয়ার দিন-মজুরের কাজ খুঁজে ফেরে। তার পর যখন শীত আসবে তখন সবাই যা করে, তাকেও তাই করতে হবে,—ছোট অল্প বয়স হলে কি হবে, লফোটেনের মাছ ধরার কাজে ভাড়াটে চাকর হতে হবে।

কিন্তু একদিন গির্জ্জায় প্রার্থনার পর ক্লাউস ব্রক তাকে এক পাশে টেনে নিয়ে অনেক কথাই বলাবলি করল। প্রথম ক্লাউস বললে যে, সে এখান থেকে চলে যাচ্ছে, সহরে গিয়ে তাকে মিস্ত্রীর কারখানায় কাজ আরম্ভ করতে হবে, সেখান থেকে ইঞ্জিনীয়ার হবার জন্য যেতে হবে টেক্‌নিক্যাল কলেজে। তার পর সেদিন সহরে পীয়ারের কি

হয়েছিল সে সব শুনতে চাইলে। কারণ, যখন লোকগুলো উরু চাপড়াতে চাপড়াতে চাপাহাসি হেসে ভিখারী পীয়ারের ধর্ম্মযাজকত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, তখন ক্লাউসের ইচ্ছে হয়, ওই সবগুলাকে ধ'রে ক'সে উত্তম মধ্যম দেয়।

এমনি ধারা দুটি ষোল বছরের বালক কথা বলতে বলতে পাইচারি দিতে লাগল: আজ তার পুরানো হাঙ্গর মারার সাথী যেমন ক'রে তার পাশে এসে দাঁড়াল, তা পরবর্ত্তী জীবনে পীয়ার কখনো ভুলতে পারে নি। ক্লাউস বলল, "আরে ম্যান, আমার মত কর হে: তুমি তো লোহারের কাজ অল্পসল্প জানও; চল 'ওয়ার্কশপে' (কারখানায়), অবসরের সময়ে টেক্‌নিক্যালে যাবার পড়াটা তৈরী ক'রে নিও। তার পর কলেজে তিনটি বচ্ছর, আঠারো শ' ক্রাউনে বেশ হয়ে যা'ব'খন, বাস্ তারপর তো তুমি ইঞ্জিনীয়ার, তখন কারু কাছে অর্দ্ধপয়সাও ধার চাইতে হবে না।"

পীয়ার মাথা নাড়তে লাগল; কারণ তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ব্যাঙ্কের টাকা চাওয়া তো দূরে থাক, স্কুলমাষ্টারকে মুখ দেখানোর সাহসটুকু আর হবে না। না, ও ব্যাপারটা তার পক্ষে চুকেবুকেই গেছে।

"দুত্তোর না কি করেছে, তুমি কি বুঝতে পাচ্ছো না হে, ওই বাঁদর স্কুলমাষ্টারটা তোমার টাকা তোমায় না দিয়ে পারে না? চল না আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে; একসঙ্গে গিয়ে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে, তার পর দেখো তখন।"

ব'লে ক্লাউস ঘুসি বাগিয়ে এক দিকের কাঁধটাকে সবেগে সামনের দিকে এগিয়ে দিলে।

কিন্তু জানুয়ারী মাস এল যখন, তখন বরফ আর তুষার-ঝঞ্ঝার মাঝ দিয়ে উত্তরের পানে মাছ ধরবার আড্ডার দিকে সমুদ্র-পথ কেটে একখানি

লফোটেনযাত্রী জেলে-জাহাজে নাবিক বেশে অয়েলস্কিনের পোষাক প'রে পীয়ার চলল। সারাটা শীতকাল জেলের জীবন যাপন করল সে। সেখানে ডাঙায় পৌঁছে ছোট্ট ছোট্ট জেলে-ডেরার একটার মধ্যে সে স্থান পেল; তাতে ছুরি দিয়ে কাটা যেতে পারে এমনিতর জমাট বদ্ধ হাওয়ায় পাঁচ পাঁচজন জেলের এক একটি দলকে সার্ডিন মাছের মত ঠাসা হয়ে থাকতে হলো। আর সমুদ্রে—সেখানে হাওয়া ছিল বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক দিনই কর্ম্মহীন অবস্থায় বরফি-হিমে দেহ জ'মে শক্ত কাঠ হয়ে যাবার মত হ'তে লাগল; আবার যদি হাওয়া খারাপ রকম বইল তাহলে তো কথাই নেই; তখনি বা'র কর দাঁড আর টানো, কেবল টানো! বাঁকা বরফ-শীতল তরঙ্গ-প্রবাহের একখানি সীমাহীন প্রান্তরের ওপর দিয়ে টেনে চল দাঁড়; হাতগুলো জ'মে অসাড হয়ে গিয়ে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে মাত্র পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তবু টানো আর টানো!

এই সমস্তের মাঝ দিয়ে পীয়ার চলল; ভাবতে পারত না সে, তবু মাঝে মাঝে কখনো কখনো এই ভাবত যে, সে অবাধ্য হয়ে বাঁচতে চেয়েছে ব'লে সেই সব বড় বড় ভদ্রলোকেরা তাকে এই জীবনের দিকে কেমন ক'রে ঠেলে দিয়েচে। তারপর যখন চোদ্দ সপ্তাহ পরে লফোটেন থেকে ডিঙিগুলো এক মৃদু বসন্ত দিনে ফিয়োর্ডে এসে দাঁড়াল তখন পীয়ার তার উপার্জ্জনের হিসাব করবার সময় পেলে—উপার্জ্জন তার কিছুই হয় নি। তার সাজ-সরঞ্জাম আর খাইখরচের জন্য তাকে ঋণ করতে হয়েছিল; কালকের অংশে যা প্রাপ্য তাতে যদি তার সেই ঋণটা শোধ হয় তা হলেই তার সৌভাগ্য বলতে হবে!

কয়েক সপ্তাহ পরে সহরে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-র ফাটকে এসে একটি বালক দাঁড়াল, ঠিক তখন ঘণ্টা বাজচে আর লোকেরা স্রোতের মত বেরিয়ে আসচে। পীয়ার ক্লাউস ব্রককে খোঁজে।

"কি হে পীয়ার তুমি নাকি! লফোটেনে গিছলে, কিছু হাতে এসেচে তা হলে?"

দুটি বালক নিমেষকাল পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। ক্লাউসের মুখে কালিঝুলি মাখা, পরণে কাজের পোষাক। আর পীয়ার ঝড়ে-জলে বিকৃত মলিন।

ফ্যাক্‌টরীর ম্যানেজার ছিলেন ক্লাউসের মামা, তাঁর ভাগ্নে সে দিন বিকেলেই এপ্রেন্টিসীর জন্য একটি নূতন লোক নিয়ে আপিসে হাজির হল। সে বললে যে লোহারের কাজ কিছু সে আগে করেচে। ঘণ্টায় দুপেন্স হিসেবে তাকে তখনি কাজে ভর্ত্তি করা হল।

"তোমার নামটি কি?"

"পীয়া-র—"বাকিটা গলায় আটকে গেল।

ক্লাউস পূরণ ক'রে দিয়ে বললে, "হল্‌ম্।"

"পীয়ার হল্‌ম্? বেশ এতেই হবে।"

একটা দুঃসাহসিক কর্ম্ম করা হয়েচে এমনি ভাবে বালক দুটি বেরিয়ে গেল। যাই হোক, যদি দুঃখ-বিপদ আসেই, এখন তার সঙ্গে লড়াই করবে তারা দুজনে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সী-ষ্ট্রীট থেকে যে সরু গলিটা গেছে তারই ভিতর ঠিকে গাড়ীর মালিক গর্সেথ থাকে; তার পরিবারের মধ্যে একটি শীর্ণ চর্ম্মসার স্ত্রী, দুটি অর্দ্ধভুক্ত ঘোড়া, কয়েকখানা খড়খড়ে ছেকড়া গাড়ী আর স্লেজ। লোকটা একটা বিশ্রী রকমের মাতাল, নাকটা ভার লাল, চোখগুলো বীয়ার খেয়ে হল্‌দে; রাতগুলো মাতলামি ক'রে কাটে, তার পর শেষ রাত্তিরে যখন তার স্ত্রী ঠিক উঠি-উঠি করে তখন সে ফেরে। তার পর

গসে´থ নাক ডাকিয়ে আরামে নিদ্রা দেয়, আর সেই সকাল বেলা ভোর তার স্ত্রী তাকে অপদার্থ মাতাল ব'লে একেবারে মারমুখো হ'য়ে তাকে বাড়ীময় গালিগালাজ করে বেড়ায়।

পীয়ার যখন কাঁধে তার বাক্সটি নিয়ে এই রঙ্গমঞ্চে এসে নামল গসে´থ তখন আঙিনায় হাঁটু গেড়ে এক জোড়া চামড়ার গাড়ী-ঢাকনিতে চর্ব্বি লাগাচ্ছিল আর তার ভেতরে-ঢুকে-যাওয়া ঠোঁট আর ভীষণ-দৃষ্টি স্ত্রীটি পাকের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে বদমায়েস, শূয়ার এবং দুনিয়ার কলঙ্ক বলে গাল দিচ্ছিল। টেকো মাথায় সূর্য্যালোক ফলিয়ে হামাগুড়ি অবস্থায় গসে´থ চর্ব্বি লাগাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে মাথাটা তুলে খিঁচিয়ে উঠছিল, "মুখ সামাল্ পাজি বুড়ি মাগী।"

পীয়ার জিজ্ঞেস করলে, "ঘরভাড়া আছে কি ?"

বীয়ার টানা নাকটা তার দিকে ফিরিয়ে লোকটা টেনে আপনাকে ওঠালে, তার পর পা-জামায় হাত দুটো মুছে বললে, "আছে বই কি !" ব'লে উঠোনের পর দিয়ে নিয়ে গিয়ে, কয়েকখানা সিঁড়ি বেয়ে তাকে একটি ছোট ঘর দেখিয়ে দিলে; ঘরে রাস্তার উপর দুটো-সাসি-দেওয়া একটা জানালা। আর উঠোনের দিকে আধখানি জানালা। ঘরে চাদর-দেওয়া একখানি খাট। এক জোড়া চেয়ার আর সেই আধখানি জান্লার সামনে একটা টেবিল। মাসে দিতে হবে সাড়ে ছ' শিলিং। বেশ তাতেই রাজী। পীয়ার সেইখানেই প্রথম মাসের ভাড়া দিয়ে ঘরখানি ভাড়া ক'রে ফেলল; তার পর লোকটাকে বিদায় ক'রে, বাক্সটার ওপর ব'সে চার দিকটা দেখতে লাগল। কত লোক রয়েচে—যাদের মাথা রাখবার এতটুকু ঠাঁই নেই, পীয়ারের ত তবু নিজের বল্‌তে এই ঘর রয়েচে। বাইরে উঠোনে তখন সেই স্ত্রীলোকটির গালি-গালাজের চীৎকার আবার সুরু হয়ে গেছে ; নীচে আস্তাবলে ঘোড়াগুলো

খুর দিয়ে মাটিতে শব্দ করচে আর চিঁহিঁহিঁহিঁ স্থরু করেচে। পীয়ারের কিন্তু জেলে-ডেরায় আর চাষাপট্টিতে থাকার অভ্যেস ছিল, তাই এসব তাকে চঞ্চল করল না। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম সে একটি জায়গা পেয়েচে যা তার নিজের, যার চার-দেয়ালের মাঝখানে সে আপনাকে গৃহস্বামী বলতে পারে—নিজের কর্ত্তা বলতে পারে।

এবার খাওয়া-দাওয়া। বাইরে থেকে সে তার খাওয়ার জিনিষ নিয়ে এলো, সাধারণ গ্রাম্য খাদ্য এনে বাক্সটিতে রাখল। ডিনারের সময় জেলেদের মত বাক্সর পরে বসে চ্যাপ্টা রুটি আর ঠাণ্ডা মাংস দিয়ে বেশ এক পেট খেয়ে নিল।

তার পর সে তার নতুন কাজ আরম্ভ করল। এই কাজ সে করতে চায় কি চায় না, সে প্রশ্ন এখন নয়; এই হচ্চে তার সংসারে উন্নতি করবার একটা স্থযোগ আর সেজন্য তাকে কারো অনুমতির প্রতীক্ষা করতে হচ্চে না। সে চায় উন্নতি করতে। অল্প দিনের মাঝেই এই নতুন জীবন তার স্বপ্নকেও নতুন আকার দিতে লাগল। এখন সে একটা সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে, একজন লোহারের এপ্রেণ্টিস্ মাত্র—কিন্তু উর্দ্ধে একেবারে চূড়ায় বসে আছে একজন প্রভূত শক্তিশালী চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, চোখে সোণার চশমা, গায়ে সাদা ওয়েষ্ট কোট। একদিন সেও সেইখানে বসবে। এবার যদি কোনো স্কুলমাষ্টার এসে তাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করে—তা হলে বেশ তো, দেখুক না একবার চেষ্টা ক'রে! একদিন তারা তাকে গির্জ্জা-প্রাঙ্গণ থেকে বা'র করেছিল, একদিন এর শোধ সে নেবে; এর জন্যে হয়ত তার বছরের পর বছর লাগবে, কিন্তু একটি শুভদিন আসবে—যেদিন তাদের মাঝে যে-জন সেরা, তার মতই সে হবে এবং তাদের পুরোপুরি প্রতিদান সে দেবে সেদিন।

কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে খাদ্যভাণ্ডটি হাতে নিয়ে ভারি পা ফেলে যখন সে তার কাজে যায়, তখন কাঠের পুলের ওপর তার পদক্ষেপের ধপ-ধপানি যেন দৃঢ়সঙ্কল্প জানিয়ে এই কথাটাই বলে, "আজ আমি নতুন কিছু শিখবো —নতুন—একেবারে নতুন !"

বন্দরের বড় বড় কারখানা—জাহাজ তৈরীর কারখানা, ঢালাইয়ের কারখানা, কলঘর—এসব মিলে একটা গোটা সহর। আগুন, ধোঁয়া, জ্বলন্ত লোহা, বাষ্পচালিত হাতুড়ি, প্রবলবেগে ঘূর্ণ্যমান চাকা, গোলমাল আর কোলাহলের এই জগতে সে প্রবেশ করচে একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে—শুধু সে শিখবে আর জানবে, আর জেনেই চলবে। তার আশে পাশে অসংখ্য লোক রয়েচে যারা নিজের নিজের কোণটিতে দাঁড়িয়ে সেখানকার আটঘাটটুকু বুঝেই তৃপ্ত হয়ে রয়েচে, তাদের তার বেশি যাবার ইচ্ছেই নেই। তারা জীর্ণভগ্ন শ্রমিকের বেশেই জীবন কাটিয়ে দেবে আর সে এর মাঝ দিয়ে পথ কেটে একদিন যাঁরা এ-সবের হর্ত্তাকর্ত্তা তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে। কয়েক মাস তাকে লোহারের কারখানায় কাটাতে হবে, তার পর সে যাবে কলঘরে এবং তার পর ছুতোরদের ওখানে, তার পর পেণ্টারদের ওখানে কাজ শিখে শেষে ঐ জাহাজ তৈরীর কারখানায় পৌছুবে। এসব করতে দুটি বছর লাগবে তার। কিন্তু এর মধ্যে ঐ সব কারখানা আর তার মাঝের সব ব্যাপার তার কাছে একখানি নতুন বাইবেলের মত হয়ে দাঁড়িয়েচে; এ-যেন সকল বইয়ের সেরা বই, যা সে একেবার কণ্ঠস্থ করে নিতে চায়। শুধু একটু সময়ের প্রতীক্ষা মাত্র।

অভিনব অভিযানের (adventure) এই তো ক্ষেত্র! দিনের মাঝে কতবার সে নব নব বিস্ময়ের পানে চেয়ে থাকে;—একেবারে আশ্চর্য্য সব ব্যাপার, দেব-বাণীর প্রকাশের মত। তবু তো এসব ভগবৎ কৃপার সৃষ্টি নয়, মানুষেরই আবিষ্কার মাত্র! একটা বোতাম টিপে দিলে, আর

অমনি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার জীবন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো! সে এই সব অবাক্ পারা চেয়ে চেয়ে দেখে, আর বোঝার দুরূহ চেষ্টায় এক এক সময় সে রাত জেগে কাটায়। এসবের পশ্চাতে কিছু একটা আছে; নিশ্চয়, নিশ্চয় মন ব'লে একটা কিছু আছে,—সে মন ভগবানের সৃষ্টি নাও হতে পারে। এই সব ইঞ্জিনীয়াররা ধর্ম্মবক্তৃতাও দেয় না, ভজন টজনও করে না বটে, তবু এরাও এক রকমের ধর্ম্মযাজক। এ যে একটা নতুন জগৎ।

একদিন একটা প্রকাণ্ড বয়লারে পেরেক-ঠোকা কাজে গিয়ে সে সর্ব্ব-প্রথম এমন একটা শক্তির সাক্ষাৎ পেলে, যা তার দেহের শক্তি নয়। একটা বায়ু-ঠাসা নল পেরেকগুলোকে খুব দ্রুত একটির পর আর একটা বসিয়ে যাচ্ছিল, আর বয়লারের সেই বিকট শব্দ সারা সহরে শোনা যাচ্ছিল—এমনি প্রচণ্ড সে আঘাত! সেই উৎকট শব্দে পীয়ারের মাথা আর কান টনটন্ করতে লাগল, তবু কিন্তু পীয়ার হাসে। শরীরের ক্লান্তি সত্ত্বেও পরিশ্রম করতে সে অভ্যস্ত; কিন্তু এখানে সে দাঁড়িয়েছে প্রভুর মত, মন নিয়ে, আত্মা নিয়ে, শাসন শক্তি নিয়ে। সর্ব্বপ্রথম জীবনে তার এই অনুভব; তার শরীরের প্রতি শিরা বেয়ে বিজয়ের একটা আনন্দ-হিল্লোল বয়ে গেল।

কিন্তু সারা দীর্ঘ সন্ধ্যা সে একা বসে শুধু পড়ে আর পড়ে আর নীচের আস্তাবলে ঘোড়ার খুর-চালানো শোনে। দুপুর রাত কখন পেরিয়ে যায়, তার পর যখন সে শয্যায় প্রবেশ করে তখন শুধু একটা জিনিষ তাকে পীড়ন করতে থাকে,—তার একান্ত নিঃসঙ্গতা। ক্লাউস ব্রক তার মামার সঙ্গে থাকে, সুন্দর বাড়িটি,—পার্টিতেও যায়। আর সে এইখানে একলাটি পড়ে থাকে। এই রাতেই যদি সে মরে যায় তার কথা ভাববে এমন কেই বা আছে! কি ভীষণ একা সে এই অপরিচিত উদাসীন জগতে!

এর ফলে কখনো সে ট্রোয়েনের বুড়ী-মার কথা ভাবে, আর কখনো ভাবে দেশের সেই গির্জ্জার কথা, যার গোল ছাত অর্গ্যানের উদ্বেলিত সুরে উর্দ্ধে আকাশে বিলীন হয়ে যেত, আর সকলের মুখগুলো কেমন সুন্দর হয়ে উঠত! কিন্তু তার কাছে এখনকার সান্ধ্যপ্রার্থনা আর সেই পূর্ব্বের মত নেই; যে-সোপান বেয়ে সে উর্দ্ধে উঠবে তার শিখরদেশে আর সেই পক্ককেশ বিশপের এতটুকু অস্তিত্বও নেই। এখন সেখানে যে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার বিরাজ করচেন তাঁর সঙ্গে "আমাদের সদাপ্রভুর" কিম্বা ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্যের জীবনের কোন সম্পর্কই নেই। আর তার জীবনে এমন দিন আসবে না যেদিন সে, যে দুঃখলোকে তার মা রয়েছে সেখানে যেতে পারবে এবং তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে। যে-শক্তি এবং সামর্থ্যই তার হোক না, কোনো হেমন্ত সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আর সে নক্ষত্রদের গান গাওয়াতে পারবে না।

পীয়ার একটি বস্তু চিরকালের জন্য হারাল। যে-কূলে রাঙা মেঘ আকাশকে আচ্ছন্ন করে থাকে, যেখানকার হাওয়া স্বপ্নে ভরা, পীয়ার যেন সেই কূল থেকে দাঁড় বেয়ে কেবলি দূরে, আরো দূরে একটা অপূর্ব্ব নূতনের দিকে সরে যাচ্চে। পীয়ারের চাইতে কোনো প্রবলতর শক্তির এই ইচ্ছা!

সেদিন রবিবার, পীয়ার বসে পড়ছিল। দোর খুলে, ক্লাউস শীশ্ দিতে দিতে এসে ঢুকল, টুপিটা মাথার পেছনে হেলিয়ে বসানো।

"কি হে ভায়া, তুমি এইখানে থাক তা হলে?"

"হ্যাঁ এইখানে—ওই চেয়ার রয়েচে, বসো।"

কিন্তু ক্লাউস টুপি মাথায় দিয়েই পকেটে হাত দিয়ে, ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে, দাঁড়িয়েই রইল। শেষে বললে "বেশ, এটা বোধ হয় নিজেরই ফটো টেবিলে রাখা হয়েচে!"

"কেন, তোমার কাছে যেন এ নতুন ঠেকচে! সকলেই ফটো রাখে তা জান না বুঝি?"

"ওহে গর্দ্দভ, নিজের ফটো রাখে না! কেউ যদি এ দেখতে পায়, তা হলে, মজাটি এর বুঝতে পারবে!"

পীয়ার ফটো নিয়ে বিছানার নীচে ছুঁড়ে ফেল্লল। "যাক্‌গে, ওটা একটা রাবিস শুধু!"—বিড় বিড় করে বলল সে। বাস্তবিকই পীয়ার এটা ভুলই করেচে। দেয়ালে কাঁটা দিয়ে একখানা রঙীন ছবি টাঙানো ছিল, সেদিকে দেখিয়ে পীয়ার বললে, "আচ্ছা, এটা কেমন?"

ক্লাউস তামাকের কুচি দাঁতে কেটে খুব গম্ভীর ভাব ধরল, হাসি দমন করে বলল, "ও, ওটা!"

"হ্যাঁ, এখানা খুব ভাল একখানা পেণ্টিং, না? চার আনা দিয়ে কিনেচি এটা।"

"পেণ্টিং, হা হাঃ—বেড়ে! আরে বোকা গরু, এটা যে একটা ওলিওগ্রাফ তাও কি জানো না?"

"তা তুমি জান ভাই, তুমি সবই জানো।"

ক্লাউস বললে, "একদিন তোমায় আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে যাবো; আসল পেণ্টিং কাকে বলে দেখো তখন। ওটা কি ওখানে—ইংরাজী রীডার?"

পীয়ার ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কবিতা পড়চি শোনো" ক্লাউস বাধা দেবার সময়টুকুও পেল না, পীয়ার আবৃত্তি করল। যখন আবৃত্তি শেষ হ'ল, ক্লাউস তামাক চিবোতে চিবোতে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল; শেষে সে বলল, "হুঁ, আমাদের শেষ শিক্ষয়িত্রী ফ্রোকেন সেবেলিন যদি তোমার ও ইংরেজিটুকু শুনতেন তা হলে বাজি রেখে বলতে পারি যে তাঁর জন্য নার্স ডাকা দরকার হতো।"

মাত্রাটা বড়ই বেশি হয়ে পড়ল এবার। পীয়ার বইখানাকে ছুঁড়ে ফেলল আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে বেরিয়ে গিয়ে জাহান্নামে যেতে বলল। চটে আগুন একেবারে। তবু ক্লাউস এক ফাঁকে বলল, "যদি টেক্‌নিক্যাল প্রবেশিকা পাস করতে চাও, তোমার কারু কাছে পড়তে হবে এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ? তোমাকে একজন মাষ্টারের সাহায্য নিতেই হবে।"

"মাষ্টারের কথা বলতে তোমার আর খরচটা কি। তবে তোমায় বলচি যে ঘণ্টা পিছু দু আনা বেতন আমি দিতে পারি।

"আমি তোমার মাষ্টার যোগাড় করে দেব যিনি তোমায় সপ্তাহে বার দুই সাহিত্য, ইতিহাস আর অঙ্ক শেখাবেন। আমি জোর করেই বলতে পারি যে কোন হতভাগা ছাত্র তোমায় দিন সাত পেন্স হিসেবে পড়াতে রাজি হবে। তা বোধ করি দিতে পারবে, কি বল?"

পীয়ার শান্ত হয়ে এলো, একটু ভাবতে লাগল। "হ্যাঁ, যদি মাখনটা ছেড়ে দেওয়া যায় আর কফির বদলে জল খাই তা হলে—"

ক্লাউস হাসল, কিন্তু চোক তার জলে ভিজে ওঠে। কি দুর্ভাগ্য, সে তার সাথীকে কয়েক শিলিং ধার দিতেও পারে না—কিন্তু এতে তো চলবে না।

এমনি করে গ্রীষ্মকালটা কাটল। রবিবারে সকাল বেলা ছেলে-মেয়ের দল গ্রামের দিকে যাত্রা করে, সারাটা দিন মাঠে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে ব'লে; পীয়ার ঘরের ভেতর বই নিয়ে বসে' বসে' তাই দেখে। সন্ধ্যেবেলা সার্সি দেওয়া জান্‌লাটা দিয়ে মাথা গলিয়ে রাস্তাটার পানে সে তাকায় আর দেখতে পায় সেই ছেলেমেয়েদের; হ্যাটে ফুল আর সবুজপাতা লাগিয়ে সূর্য্যালোকে আর মুক্ত হাওয়ায় মাতাল হয়ে লাল টকটকে চেহারা নিয়ে কলরব করতে করতে ফিরচে তারা। আর সে,

বসে বসে কেবলি পড়তে হবে তাকে। কিন্তু হেমন্ত রাতে যখন দীর্ঘ রাত্রি আরম্ভ হয়, শোবার আগে পীয়ার একবার রাস্তায় বেড়াতে যায় আর প্রায়ই যায় সে ওই সাদা কাঠের বাড়ীটা পর্য্যন্ত যেখানে ম্যানেজার থাকেন। এই তো ক্লাউসের বাড়ী। আলোকিত বাতায়ন, গান-বাজনাও প্রায়ই হয়। যে সব সুখী লোকেরা ওইখানে থাকেন তাঁরা বই থেকে যা কখনো শেখা যাবে না, এমন সব ব্যাপার জানেন, করেনও। নাঃ এতে আর ভুল নেই যে তাকে অনেকটা পথ,—একটা দীর্ঘ, বড় দীর্ঘ পথ বেয়ে যেতে হবে কিন্তু সেখানে যাবে সে নিশ্চয়।

কর্ণেল হল্‌মের বিধবা স্ত্রী কোথায় থাকেন সেই কথাটা একদিন ক্লাউস নিতান্ত কথাচ্ছলে বলে ফেলল। পীয়ার একদিন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে পর বেরিয়ে সেই দিকে চলল, খুব সন্তর্পণে সেই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হল। বাড়ীটা ছিল রিভার ষ্ট্রীটে, বড় বড় গাছের আড়ালে প্রায় ঢাকা। পীয়ার বাগানের বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, কি একটা গোপন অনুভূতি তাকে কাঁপাতে লাগল। নীচে ওপরে বাতায়নের দীর্ঘ সারিগুলো সব আলোকিত, তার মাঝ থেকে তরুণ হাসির ধ্বনি আর একটি তরুণীর গানের আওয়াজ তার কানে এলো—নিশ্চয় তারা আজ কোনো পার্টি দিচ্চে। হিমেল হাওয়ায় কলারটা তুলে দিয়ে, সহরের মাঝ দিয়ে গাড়ীওয়ালার আস্তাবলের ওপরের বাসায় সে ফিরে এল।

নিঃসঙ্গ খাটুনে ছেলেটির কাছে শনিবারের সন্ধ্যা একটা উৎসবের মত আসে। তখন সে বিশেষ ক'রে গা ধুয়ে বাক্স থেকে নতুন কাপড় বার করে, বেশ পরিবর্ত্তন করে। নতুন ধোয়া কাপড়ের গন্ধে তার সেই বসন্ত-চিহ্নিত বুড়ীটির কথা মনে পড়ে, যে এই সব সেলাই করে জোড়াতাড়া দিয়ে সুন্দর ক'রে ভাঁজ করে রেখেছিল। ঠিক যেন

রবিবার আরম্ভ হয়ে গেছে এমনি একটা অনুভূতি নিয়ে সে বড় যত্নের সঙ্গে ওগুলো পরে।

আবার মাঝে মাঝে যখন রবিবারটা বড়ই দীর্ঘ লাগে, পীয়ার কাছের গির্জ্জাটায় গিয়ে ঢোকে। পাস'ন যা বলেন নিশ্চয়ই সব ভালই বলেন, কিন্তু পীয়ার তা শোনে না। তার চাই শুধু প্রার্থনা সঙ্গীত, অর্গ্যান, উঁচু গোল ছাত, রঙীন বাতায়ন। এখানেও লোকের মুখগুলো রাস্তার লোকের মুখের চাইতে আলাদা রকমের দেখায়; তাদের সমস্ত চিন্তা যাকে যাকে পাবার প্রয়াস করে যেন তারই খানিকটা আভা এসে লাগে তাদের মুখে। আর এখানটায় এলেই তার কেমন নিজের ঘরের মত লাগে। যদিচ এখানকার প্রত্যেকটি প্রাণীই তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবু তাদের সঙ্গে পীয়ার কেমন একটা আত্মীয়তা অনুভব করে।

কিন্তু অবশেষে একদিন প্রার্থনা সঙ্গীতের মাঝখানটায় তাকে বিস্মিত করে হঠাৎ কেমন তার অন্তর বলে উঠল, "তোমার বোনকে পত্র দেওয়া উচিত তোমার, সেও তোমারি মত এই দুনিয়ায় একা।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা পীয়ার পত্র লিখতে বসল। একেবারে নবাবী সুর ভেঁজে সে লিখল যদি কোনো রকমের সাহায্যের তার প্রয়োজন থাকে তা হলে শুধু তাকে জানানো দরকার। আরো লিখল যে যদি তার সহরে আসার ইচ্ছে হয় তা হলে সে তার কাছে এসেই থাকতে পারে। পত্রের শেষে লেখা হলো, "তোমার স্নেহের ভাই, পীয়ার হলম, ইঞ্জিনীয়ার এপ্রেন্টিস্।"

কয়েকদিন পরে সুন্দর সামান্য বাঁকানো হাতের লেখা ঠিকানা এক চিঠি এল। এই সবে মাত্র লুইসের কনফার্মেশন হয়েচে। যে কৃষকের বাড়ীতে সে রয়েচে সে তাকে শীতকালটা গয়লানীর কাজে রাখতে চায়

তবে তার আশঙ্কা যে তার পক্ষে ও কাজটা একটু বেশী রকমের কঠিন হবে, তাই সে রবিবার সন্ধ্যাবেলার ষ্টীমারেই সহরে আসচে—"ইতি প্রণত তোমার বোন্ লুইসে হগেন।"

পীয়ার একটু চমকেই উঠল; তার মনে হল যেন এবার একটা গুরুতর দায় সে কাঁধে করচে।

রবিবার দিন সন্ধ্যাবেলা শক্ত ফেল্টের হ্যাটটি মাথায় দিয়ে নীলরঙের স্যুটটি পরে জেটির দিকে সে চলল। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম সে একজনের অভিভাবক হতে চলেছে; তার চেয়েও যার অবস্থা খারাপ, এখন থেকে এমনি করে একজনের পিতা এবং সহায়ক হবে সে. এ একটি অভিনব ব্যাপার। সেই আমুদে ভদ্রলোকটির কথা তার মনে এলো যিনি একদিন ট্রোয়েনে তাঁর ছোট ছেলেটির তত্ত্ব নিতে এসেছিলেন। হ্যাঁ, যদি কিছু করতে হয় তো ঐরকম! সে ঠিক ওই রকম হতে চায়। নিজের অজান্তে সে তার বাবার চাউনি এবং চলা, হাসি এবং বে-হিসেবী বেপরোয়া রকম-সকম অনুকরণ করতে লাগল। "বেশ বেশ বেশ বেশ," এই যেন সে মনে মনে বলতে লাগল। কল্পনায় হয়ত বা সে তার চিবুকে সেই পরিষ্কার লৌহধূসর দাড়িটুকুও অনুভব করছিল।

ছোট সবুজ রঙের ষ্টীম-বোটটা অন্তরীপের মোড় ফিরে জেটির কাছে এসে থাম-থাম হল, জাহাজে ওঠার তক্তা লাগান হল, কুলীরা ডেকে লাফিয়ে পড়ল, যাত্রীরা সব তাড়াহুড়ো করে তীরে এসে নামল। যে বোনটিকে সে কখনো দেখেনি তাকে সে কি ক'রে চিনবে সেই কথাটাই বিস্মিত মনে পীয়ার ভাবছিল।

ডেকের ভিড় পাতলা হয়ে এলো অল্পক্ষণের মাঝেই, লোকেরা সব জেটি থেকে সহরের দিকে রওনা হতে লাগল।

তখন পীয়ার একটি তরুণী কৃষক-কন্যাকে দেখতে পেল, তার এক

হাতে একটা বাক্স, আর এক হাতে বেহালার কেস্। পরণে ছিল তার একখানি ছাই-রঙের পোষাক আর সুন্দর চুলের উপর ছিল একখানি কালো রুমাল; মুখখানি ফ্যাকাসে, কিন্তু মুখের গড়নটি খুব সুন্দর। তার মায়েরি মত চেহারা, ঠিক যেন তার ষোল বছর বয়সের মা। মেয়েটি তার চারিদিকে তাকাতে লাগলো। শেষে কতকটা শঙ্কিত ভাবে, কতকটা সপ্রশ্নভাবে চোক দুটো তার পীয়ারের উপর নিবদ্ধ হল।

"তুমি কি লুইসে ?"

"তুমি পীয়ার ?"

নিমেষকাল স্মিতমুখে তারা পরস্পরকে নিরীক্ষণ করে করস্পর্শ করল। তারা দুজনে বাক্সটাকে বয়ে নিয়ে চলল, কিন্তু পীয়ার এরি মধ্যে এতটা সহুরে হয়ে পড়েছিল যে রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রাঙ্কটার একদিকে একটি গ্রাম্য মেয়েকে নিয়ে আর দিক নিজে ধরে চলতে তার কেমন লজ্জা করছিল। বাঁধানো রাস্তার পরে ঐ মেয়েটির মোটা জুতোগুলো কি বিশ্রী শব্দই করছিল! কিন্তু সবটা সময় তার লজ্জা হচ্চে মনে করে লজ্জা হতে লাগল।

ওই বাঁকা ভুরুর নীচে থেকে নীল নীল চোক দুটি যে ক্রমাগতই তার দিকে চাইতে লাগল! কি বলছিল তারা? তারা বলছিল, "হ্যাঁ আমি এসেচি, তুমি ছাড়া এই বিশ্বসংসারে আমার কেউ নেই—আমি এসেচি," এই কথাই তারা বলতে লাগল।

ভায়োলীন-কেস্‌টার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, "ওটা বাজাতে পারো ?"

হেসে উত্তর দিলে ও, "আমার বাজনা—যা তা শুধু!" তখন সে বললে যে, যে বুড়ো সেক্সটনের কাছে সে শেষ দিক্‌টায় ছিল তার কনফার্মেশনের জন্যে নতুন পোষাক দিতে-না-পেরে এই বেহালাটি দিয়েচে।

"তা'লে কনফার্ম্ম হবার কালে নতুন পোষাক পাও নি ?"

"না।"

"কিন্তু তোমার—সুন্দর পোষাক-পরা আর আর মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার বড় বিশ্রী লাগছিল, না ?"

সে মুহূর্ত্তকাল চোক বুজে থেকে বলল, "হ্যাঁ বড় বিশ্রী।"

একটুখানি এগিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "তোমায় অনেক জায়গায় থাকতে হয়েচে, না ?"

"বোধ হয় পাঁচ জায়গায়।"

"ও—ওঃ সে তো কিছুই না। আমি ন' জায়গায় থেকেচি"—বলে মেয়েটি আবার মৃদুহাস্য করল।

পীয়ারের কামরায় যখন তারা এসে পৌঁছল তখন মুহূর্ত্তকাল দাঁড়িয়ে মেয়েটি চারিদিক দেখে নিলে। এরকমটা কখনো সে দেখবার আশা করে নি। সহরের বাসায় সে আগে কখনো থাকে নি, বদ্ধবাতাসের গন্ধে তার নাকটা একটু সিঁটকে উঠ্ল।

বড় অন্ধকার আর দম-আঠকানো ভাব এই ঘরটার।

পীয়ার বললে, "আলো জ্বালচি।"

মেয়েটি ঈষৎ লজ্জিত ভাবে হেসে উঠল, জিজ্ঞেস করল, "কোথায় শোব আমি ?"

"তাই ত! কি হবে ?" বলে পীয়ার মাথা চুলকাতে লাগল, "ভাখো বিছানা তো একটি মাত্র।" এর পর দুজনেই উচ্চহাস্য করে উঠল।

মেয়েটি বললে, "তা হলে আমাদের একজনকে মেজেয় শুতে হবে।"

পীয়ার উৎফুল্ল হয়ে বলল, "ঠিক, তাই হবে, আমার দুটো বালিশ আছে, একটা তুমি নিও, আর দুটো কম্বল—যাক্, শীত করবে না তোমার।"

মেয়েটি বললে, "আর তারপর আমার আর একটা জামা এর ওপর পরে নেব। বোধ করি তোমার একটা ওভার কোট—"

"বাস্‌রে চমৎকার! তাহলে ও নিয়ে আর কিছুই আমাদের ভাবনার রইলো না।"

"কিন্তু তুমি খানা আনো কোত্থেকে?" মেয়েটি সব বিষয় পরিষ্কার করে বুঝে নিতে চায় আর কি।

মেয়েটিকে তখনি কোন হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবার যথেষ্ট পয়সা তার নেই ভেবে তার কেমন লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু মাষ্টারের মাইনে দিতে হবে পরের দিন, তার খাদ্যের বাক্সটিকেও ভরতি করবার সময় হলো।

বললে, "রাত্তিরে ঐখানে ষ্টোভে করে কফি জ্বাল দিয়ে রাখি, সকালে সব তৈরী থাকে। শুকনো খানা ওখানে ঐ বাক্সটায় রাখি। সামান্য 'সাপারে'র (supper) যোগাড় দেখচি।" বাক্স খুলে খুঁজে পেতে একটুকরো রুটি আর সামান্য মাখন পাওয়া গেল; ষ্টোভের ওপর কেটলিটা বসল। টেবিল থেকে কাগজপত্র সরিয়ে তারপরে ভোজ বিছানোর সাহায্য করল মেয়েটি। ছুরি মাত্র একটি, কিন্তু দুটো ছুরির চাইতে একটাতে মজা হলো বিস্তর। অল্পক্ষণের মধ্যে তারা চেয়ারে বসে—(চেয়ার দুটোই ছিল)—দুটিতে নিজের ঘরে সর্ব্বপ্রথম ভোজন গ্রহণ করতে লাগল।

ঠিক হলো যে লুইসে মেঝেয় শোবে। যাতে তার ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্য খুব ভাল করে যখন তাকে পীয়ার ঢাকাঢুকি দিতে লাগল, তখন দুজনাই খুব হেসে নিল। বাতি নেবার আগে পর্য্যন্ত তারা জানতেই পারে নি যে হৈমন্তিক ঝড় আরম্ভ হয়েচে আর 'উত্তর-পশ্চিমা' হাওয়া ছাতের পর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে চলেচে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে সেই অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তারা দুটিতে বার্ত্তালাপ করতে লাগল।

এই যে নিজের একটি আত্মীয়কে—সেও আবার একটি তরুণী মেয়েকে সত্যি করে পাওয়া, এটা পীয়ারের পক্ষে একটা অভিনব ব্যাপার। তারি কাছে মেঝের 'পরে সে শুয়ে রয়েচে; এখন থেকে এই সংসারে তার যা হবে না হবে সেজন্য সে দায়ী। কি ক'রে সে এই কাজটি করবে?

সে শুনতে পেল মেয়েটি পাশ ফিরচে। মেঝেটা খুব সম্ভব শক্ত।

"লুইসে?"

"কি।"

"মাকে কখনো দেখেছিলে?"

"না।"

"তোমার বাবাকে?"

"আমার বাবা?" বলেই ছোট্ট একটুখানি হাসি।

"কেন? তাঁকেও তুমি দেখনি?"

"দূর বোকা, কি ক'রে দেখব? মা কি নিজেই জানত সে কে?"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ। তারপর কেমন বেকুবের মত পীয়ার বললে, "তা হলে, তুমি আর আমি—আমরা একেবারে একা!"

"হ্যাঁ—আমারা তো তাই।"

"লুইসে, এখন তুমি কি করবে ভাবচ?"

"তুমি কি করচ?"

তখন পীয়ার তার সব অভিপ্রায় তা'কে জানালে। লুইসে কিছুক্ষণ কিছুই বললে না—নিশ্চয়ই সে পীয়ারের মহান ভবিষ্যতের কথাটাই শুয়ে শুয়ে ভাবছিল।

শেষে সে কথা বলল।—"তোমার কি মনে হয় ধাত্রীবিদ্যা শিখতে হলে বেশী খরচ হবে?"

"দাই ? আরে তুমি কি তাই হতে চাও নাকি লুইসে ?" পীয়ার হাসি চাপতে পারলে না। এই সংসারে সে তাকে সাহায্য করবে এই কথা শোনার পর থেকে এতদিন সে এই জল্পনা-কল্পনা করচে তা হলে।

আবার দুঃসাহসিক জিজ্ঞেস করল, "আমার হাতগুলো কি বড্ড বড় ?" সেই অস্ফুট ফিস্‌ফিসানি পীয়ারই শুধু শুনতে পেল।

করুণায় পীয়ারের অন্তর ব্যথিয়ে উঠল। তার ম্লান সুন্দর-গঠন মুখখানির সঙ্গে তার লাল ফোলা হাতগুলো যে অত্যন্ত বেমানান তা সে ইতিমধ্যেই দেখেছিল। আর সে জানত যে পাড়াগাঁয়ে যদি কারু হাত বেশ সুন্দর আর ছোট্ট হয় তা হলে তারা তাকে "দাই-এর হাত" বলে।

পীয়ার দেয়ালের দিকে ফিরে বললে, "সে কোনো রকমে হয়ে যাবে'খন।" সে শুনেছিল যে ধাত্রীবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করতে হলে নাকি কয়েক শ' ক্রাউন লাগে। ঐ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে তার অন্ততঃ কয়েক বছর তো লাগবে। বেচারা মেয়ে! কি দীর্ঘকালই তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে।

এর পর তারা চুপ করল। উত্তর-পশ্চিমা হাওয়া ছাতের ওপর গর্জ্জন করতে লাগল। তার পর ভাই বোন ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে পীয়ার যখন জেগেছে, তখন লুইসে ছোট্ট ষ্টোভে কফি বসিয়েচে। লুইসে তার বাক্সটি খুলল, হলদে সায়াটা বার করে কাঁটায় ঝুলিয়ে দিলে, একজোড়া নতুন জুতো দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখলে, কয়েকখানা লিনেনের অন্তর্বাস ( under-linen ) আর উলের মোজা তুলে দেখে, আবার ভেতরেই রেখে দিলে। তার ইহসংসারের যথাসর্ব্বস্ব এই ছোট্ট বাক্সটিতে।

পীয়ার উঠেচে এমন সময়ে হঠাৎ লুইসে ব'লে উঠল, "ইস্—উঠোনে ও ভয়ানক গণ্ডগোলটা কিসের ?"

পীয়ার বলল, "ও—ও ও'কিছু না ; ও হচ্চে জব্-মাষ্টার আর তার স্ত্রী ; প্রতি শুভ প্রভাত তাদের এই ভাবেই চলে, তোমার শিগ্‌গিরই এটা স'য়ে যাবে।"

আবার তারা ছোট্ট টেবিলটির সামনে বসল, তারা কফি খায়, হাসে, পরস্পরকে চেয়ে দেখে। লুইসে ইতিমধ্যে চুল বেঁধে নিয়েচে, দুটি সুন্দর বেণী তার কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে।

পীয়ারের বেরিয়ে পড়ার সময় হলো ; বাড়ী থেকে বেশী দূর গিয়ে যেন পথ হারিয়ে না ফেলে সে সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতবেগে নেমে গেল।

কারখানায় ব্রকের সঙ্গে দেখা, সে তাকে বললে যে তার বোন সহরে এসেচে।

ব্রক জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তাকে নিয়ে কি করবে এখন ?"

"আপাততঃ আমার সঙ্গে থাকবে।"

"তোমার সঙ্গে ? কিন্তু তোমার যে শুধু একখানি কামরা, আর এক খানি বিছানা হে !"

"তা—সে মেঝেয় শুতে পারবে।"

"সে ? তোমার বোন ? সে শোবে মেঝেয়, আর তুমি বিছানায় ?" বলতে শ্বাস রোধ হয় আর কি !

পীয়ার দেখল আবার সে ভুল করেচে ; তাড়াতাড়ি বলল, "আরে আমি শুধু তামাসা করছিলাম। লুইসেই শোবে বিছানায়।"

ফিরে এসে দেখে লুইসে গাড়ীওয়ালার স্ত্রীর কাছ থেকে কড়াইখানা চেয়ে নিয়ে তাতে কিছু মংাস ভেজেছে আর আলু সিদ্ধ করেচে ; সুতরাং এবার তারা রাজভোগে বসে গেল !

কিন্তু দেয়ালের সেই রঙীন ছবিখানা দেখে যেই মেয়েটি জিজ্ঞেস

করল ওখানা পেন্টিং কিনা, পীয়ার একেবারে একজন মস্ত বড় বিজ্ঞলোক হয়ে পড়ল, "ওটা—পেন্টিং ? দূর বোকা, ওটা তো একটা ওলিওগ্রাফ মাত্র ! একদিন তোমায় আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে যাব, তখন বুঝতে পারবে যে সত্যিকার পেন্টিং কি রকমের হয়।" তার পর আঙুল দিয়ে টেবিলটা বাজাতে বাজাতে বলল, "বেশ, বেশ, বেশ !"

তাদের মাঝে স্থির হলো যে সংসার চালাতে হলে লুইসের অবিলম্বে কোনো কাজ নেওয়া দরকার। প্রথমেই তারা যে হোটেলে কাজের সন্ধানে গেল, লুইসে সেইখানেই রসুই-ঘরের মেঝে পরিষ্কার করবার আর আলুর খোসা ছাড়ানোর কাজ পেলে।

শোবার যখন সময় এলো তখন সে লুইসেকে বিছানায় শোবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। সে বুঝিয়ে বললে, "আরে, কাল তো শুধু একটা মজা করেছিলাম। এখানে সহরে মেয়েরাই সব সময় সব জিনিসের ভালোটা পেয়ে থাকে—এই ভদ্র চাল-চলন।" শক্ত মেঝেয় যখন সে হাত-পা ছড়িয়ে দিলে তখন তার একটা অভিনব অনুভূতি হলো। ঐ সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ঘরখানি অতিথিকে স্থান দিতে হবে বলে যেন বিস্তীর্ণতা লাভ করল। আরেক জনের জন্যে স্বেচ্ছায় যে সে শক্ত মেঝেয় শোয়াটা বরণ করেচে এর মাঝেও তার কোন দুঃখ রইল না।

বাতি নেবার পর কিছুক্ষণ সে শুয়ে শুয়ে লুইসের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনল। শেষে বলল,—"লুইসে ?"

"কি।"

"তোমার বাবা কি—তাঁর নাম কি হগেন ছিল ?"

"হ্যাঁ, সার্টিফিকেটে তাই তো বলে।"

"তা হলে তুমি হচ্চ ফ্রোকেন হগেন, বেশ শোনায়, না ?"

"ওফ্, এবার দেখচি আমায় ঠাট্টা আরম্ভ করলে।"

"তার পর যখন তুমি ধাত্রী হবে, তখন ফ্রোকেন হগেন নিশ্চয়ই এক ডাক্তারের সঙ্গে পরিণীতা হতে পারবে, কি বল?"

"দূর, সে হতেই পারে না—আমার যে রকমের হাত!"

"তুমি কি মনে কর যে তোমার হাতগুলো এতই বড় যে ডাক্তারের সঙ্গে তোমার বে হতে পারে না?"

"ওফ্ তুমি একটা পাগল, হা হা হাঃ!"

"হা-হা-হা!"

খুশ মেজাজে একটি ভালো বন্ধুর সঙ্গে এক ঘরে থাকার শান্তি আর স্বচ্ছন্দতা নিয়ে তারা কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

"আচ্ছা, লুইসে, শুভরাত্রি!"

"শুভরাত্রি, পীয়ার!"

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শীত প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখনো এমনি ধারাই চলতে লাগল। এখন লুইসেও পয়সা রোজগার করে, খরচপত্রের সাহায্য হয়, এমন কি ইচ্ছে হ'লে রোজই হোটেলে গিয়ে চারপেন্স টুকরো হিসেবে মাংসের কেক্ কিনে তা দিয়ে বেশ ভালভাবেই খাওয়া দাওয়া করতে পারে। পীয়ারের জন্যে একটা খাটও তারা সংগ্রহ করেচে, সেটা ক দিনের বেলা মুড়ে রাখা চলে আর অল্প দিনের মধ্যেই তারা এও বুঝতে পেরেচে যে কাপড় পরা বা ছাড়ার সময় তাদের মাঝখানে লুইসের উলের শালখানা টাঙিয়ে একটু পরদা করাটা ভদ্ররীতি-নীতি সঙ্গত। লুইসেও গ্রাম্যভাষা ছেড়েচে, তার ভাইয়ের মত নাগরিক ভাষা ধরেচে।

পীয়ার যখন জেগে শুয়ে থাকে, প্রায়ই একটা কথা তার মনে আসে। "মেয়েটা তো একেবারে হুবহু মারই মূর্ত্তি—একেবারে নিশ্চিত—যদি এও সেই রাস্তা ধরে চলে! নাঃ, ও তা করবে না নিশ্চয়। আরে, এটা আর বুঝতে পারচো না তুমি! ও সব কিছুই হবেনা, হবেনা, ওরে আমার প্রিয় ফ্রোকেন হগেন!"

দিনভোর তাদের মাঝে দেখাশোনা হয়ই না, কারণ সেই ভোর বেলা তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর সন্ধ্যে বেলা পীয়ার বাড়ী ফেরে। পীয়ার যখন বক্তৃতা আরম্ভ করে আর লুইসেকে সতর্ক করে বলে, যদি কোন পুরুষ তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে, যেন সে গ্রাহ্যই না করে, লুইসে শুধু হাসে। একদিন যখন ব্রক তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো আর লুইসের সঙ্গে কথা বলবার সময় চোখের নানা ভঙ্গী করতে লাগল, পীয়ারের ইচ্ছা হল তার ঘাড়টি ধরে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দেয়।

তারপর বড়দিন এলো; দীর্ঘ সন্ধ্যাবেলা তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর উজ্জ্বল আলো-দেওয়া দোকানে মন-ভোলানো ঝক্‌ঝকে সোনার দ্রব্যসম্ভার আর নানা রকমের বেশভূষা প্রভৃতি দিয়ে সাজানো বাতায়নগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। লুইসে কেবলি জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ও জিনিসটার দাম কত ব'লে মনে কর, ওই লেস্‌টা, ওই গাউনটা, ওই মোজা, ওই সোনার ব্রুচগুলোর। পীয়ার বলে, "আগে যে হোক্ ওই ডাক্তারের সঙ্গে, তখন ওসব কিনো।" এ পর্য্যন্ত তাদের কারুর ওভারকোট নেই, যখন ঠাণ্ডা লাগে, পীয়ার কোটের কলারটা তুলে দেয়, লুইসে তার মোটা উলের পোষাকটা আর এক-জোড়া ভাল গ্রাম্য দস্তানা যথাসাধ্য কাজে লাগায়, তাতেই বেশ গরম হয়। এখন সে রুমালের বদলে সাহস ক'রে একটা হ্যাট কিনেচে;

তাই লোকে হয়ত তাকে খুব সুন্দর মনে ক'রে তাকে দেখচে ভেবে সে এদিক ওদিক না তাকিয়ে থাকতে পারে না।

'বড় দিনের সন্ধ্যায়' পীয়ার বালতি করে জল উঠোন থেকে নিয়ে গেল, লুইসে সারা ঘরটাকে বেশ ক'রে মেজে পরিষ্কার করল, তারপর তারাও গা ধুয়ে পরিষ্কার হলো, গ্রাম্য রীতিতে পরস্পরের পিঠ আর কাঁধ পরিষ্কার করতে সহায়তা করল।

পীয়ার অনেকটাই সহুরে হয়েচে, তাই সে বোন্‌কে কয়েকটা ছোট্ট উপহার দিলে ; মেয়েটা এসব জানতো না, তাই পীয়ারের জন্ম কিছুই সে আনেনি ; যখন সে ব্যাপারটা বুঝল তখন খুব কাঁদল। মিঠাইওয়ালার ওখানে গিয়ে সিরাপের সঙ্গে মেখে কেক্ খেলো, চকোলেট খেলো, তারপর লুইসে তার বেহালায় একটি প্রার্থনার সুর বাজাল—তার যথাশক্তি ভাল ক'রে। পীয়ার প্রার্থনাপুস্তক থেকে বড় দিনের পাঠ পড়ল—ট্রোয়েনে বড় দিনের সন্ধ্যায় তারা ঠিক যেমনটি করতো, সেই রাত্তিরে বাতি নেবাবার পর জেগে তারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। তারা পরস্পরকে কথা দিলে যে, যখন তারা দু'জনে নিজের নিজের দিক দিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে তখন তারা পরস্পরের কাছে থাকার ব্যবস্থা করবে যাতে তাদের ছেলে-পিলেরা এক সঙ্গে খেলাধুলো ক'রে পরস্পরের বন্ধু হতে পারে।

"আচ্ছা লুইসে, এই আইডিয়াটা তোমার কেমন লাগে ? ভালো নয় ?"

"হ্যাঁ ; কিন্তু সত্যি কি তুমি তাই করবে ভাবচ ?"

"নিশ্চয়ই ; বাস্তবিক আমি তাই করবো।"

কিন্তু এর পর শীতকালের সন্ধ্যেবেলা যখন লুইসে বসে বসে পীয়ারের পথ চায়—কারণ পীয়ার প্রায়ই ওভার-টাইম্ কাজ করে—লুইসের মাঝে

মাঝে বাস্তবিক ভয় করে। ওই তার পায়ের শব্দ হলো বুঝি সিঁড়িতে! যদি সে পায়ের শব্দ দ্রুত এবং ব্যগ্র হয়, লুইসে একটু কাঁপে। ঘরে ঢুকেই পীয়ার চেঁচিয়ে ওঠে, "হুর্‌রে বোন, আজকে আমি একটা নূতন জিনিস শিখেছি।" "তাই নাকি পীয়ার!" তার পরেই মোটর পাওয়ার প্রেসার সিলিণ্ডার ক্রেন স্ক্রু,—আরো এমনি কত-কি-র সম্বন্ধে এক বচন-বন্যার সূত্রপাত আর কি! লুইসে বসে বসে শোনে, মৃদু মৃদু হাসে কিন্তু একটি বর্ণও ওসবের বোঝে না, আর পীয়ার যেই তা দেখতে পায়, অমনি সে ভীষণ উগ্র হয়ে ওঠে। বলে, "বোকা গাধা কোথাকার!"

তারপর দীর্ঘসন্ধ্যারাত্রি সে ঘরে বসে কখনো নিজে, কখনো মাষ্টারের কাছে পড়তে থাকে, আর লুইসেকে হতাশভাবে চুপ করে বসে থাকতে হয়, ছুঁচের একটা ফোঁড় তুলতেও সে সাহস পায় না। কিন্তু একদিন পীয়ারের মাথায় খেয়াল চাপল, তার বোনেরও পড়া দরকার; ব্যস্‌—বোনকে পরের দিন সন্ধ্যাবেলার জন্য ইতিহাসের এক পড়া দিয়ে বসল। কিন্তু পড়বার সময় সে পাবে কোত্থেকে! তারপর সে তাকে শ্রুতিপাঠ লেখাতে সুরু করল তার বানান শোধরাবার জন্যে—কিন্তু আগাগোড়া লুইসে কেবলি ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে দিনের বেলা এতগুলো মেজে পরিষ্কার করতে হয় আর এত আলুর খোসা ছাড়াতে হয় যে তখন তার শরীর যেন সীসার মত ভারি হয়ে উঠে।

পীয়ার রেগে ঘরময় পাইচারি করতে করতে তাকে ধমকায় আর বলে, "দ্যাখো লক্ষ্মী মেয়েটি, তুমি যদি ভাবো যে বিনা শিক্ষায় এ সংসারে তুমি উন্নতি করতে পারবে, তাহলে সে তোমার ভয়ানক ভুল। পীয়ার তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ে—কিন্তু বেশিক্ষণ যায় না, আবার তার মাথা টেবিলের 'পরে ঝুঁকে পড়ে আর সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যায়। তখন

পীয়ার বুঝতে পারে যে, না জাগিয়ে যত ধীরে পারা যায় তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার।

বসন্তকাল। কিছুদিন যেতেই পীয়ার অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার এলেন, ঘরটার দিকে তাকিয়ে, হাওয়া শুঁকে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। লুইসে সেদিন ছুটি নিয়েছিল, ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটাকে কি মানুষ থাকার ঘর বলে? ভাল থাকবার আশা কর কি ক'রে এখানে?"

পীয়ারের মুখ আগুনের মত লাল, শুয়ে কাসছিল, ডাক্তার পরীক্ষা করলেন, বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, যা মনে করেছিলাম তাই; শ্বাসযন্ত্র ফুলেচে।" আবার ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও একে।"

পীয়ারকে নিয়ে যাবে ভেবে ভয়-কাতর হয়ে লুইসে ব'সে রইল। তারপর ডাক্তার যাবার বেলা তার দিকে একটু ভালো করে তাকিয়ে বললেন, "ত্মাখো, লক্ষ্মী, তোমার নিজেরও একটু সতর্ক থাকা দরকার। তোমায় যেমন দেখাচ্চে আমার বোধ হচ্চে একটু বেশী আলো আর হাওয়া পাওয়া যায় এমন ঘরে তোমাদের বাসা বদল করা বিশেষ দরকার।"

শুভ প্রভাত! ডাক্তার যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই হাসপাতাল-এম্বুল্যান্স (Hospital ambulance) এসে হাজির। একটা ষ্ট্রেচারে করে পীয়ারকে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হল। তারপর চাকাওয়ালা সবুজরঙের বাক্সটা দোর খুলে তাকে গ্রাস করল; তারা লুইসেকে সঙ্গে পর্য্যন্ত যেতে দিলে না। তাদের সেই ঘরখানির মাঝে সারাটা সন্ধ্যা একলাটি বসে বসে সে কাঁদতে লাগল।

হাসপাতালটি হলো সেই পুরানো ধরণের। সহজে মানুষ সেখানে আসতে চায় না। ভেতরে যে কষ্ট আর দুর্দ্দশার রাজত্ব চলে, বাইরের দেয়ালগুলো থেকেই যেন তার বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায়। সাধারণ বিভাগে—

যেখানে গরীবেরা যেতো,—সর্ব্বদাই এত বেশী লোকের ভিড় যে সেখানে একই ঘরে নানান্ রকমের রোগী ভর্ত্তি করতে হয়, আর ফলে রোগীরা প্রায়ই পরস্পরকে সংক্রামিত করে। যখন কোন অপারেশন করতে হয়, ষ্ট্রেচারের ওপর রেখে ভরা শীতের সময়ও খোলা প্রাঙ্গণের মাঝ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সব সময়ই তার গায়ে একটা কম্বল থাকে ব'লে অন্যেরা সাধারণত ভাবে যে, ওকে মৃতের ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

যখন পীয়ার চোখ খুলল তখন তার মনে হলো যেন একজন লোক তার শয্যায় পায়ের দিকে সাদা ব্লাউজ পরে দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তার বলেই বোধ হচ্ছিল তাঁকে, বললেন, "আচ্ছা, জ্ঞান ফিরে আসচে বলে মনে হচ্চে, না?" পীয়ার একজন নার্সের কাছে পরে জানতে পেরেছিল যে, সে নাকি চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় অজ্ঞান হয়ে ছিল। দিনের পর দিন সে শুয়ে পড়ে রইল, সেখানে শুধু একটি মাত্র বোধ নিয়ে—কে যেন আগুনে-লাল লোহা দিয়ে খুঁচিয়ে তার বুকের ভেতরটা ক্রমাগত ছেঁদা করে চলেছে, আর শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আস্ছে। খানিক পর-পর কে যেন আসে, মুখে পোর্ট মদ আর স্যাপ্থা ঢেলে দেয়; সকাল-সন্ধ্যা কার কোমল হাত গরম জল দিয়ে সযত্নে তাকে ধুইয়ে দেয়।

তারপর ধীরে ধীরে গৃহটি তার চোখের সুমুখে স্পষ্ট, পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাকে যে মণ্ড দেওয়া হয়, সেটা খেতে যেন তার ভাল লাগে। ক্রমশঃ তার আশপাশে মানুষগুলিকে যেন সে চিনতে পারে। ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে দু'টি-একটি কথা কয়।

তার ডানপাশে শুয়েছিল কালো-চুল হলদে-মুখ একজন ডকের কুলি, নাকটা তার ভাঙা। রোগ তার আর যাই হোক, স্পষ্টই পীয়ারের রোগ নয়। সে বিশ্রী ভাষায় পথ্য সম্বন্ধে অনুযোগ করে নার্সকে উত্যক্ত করে, দিব্যি গেলে বলে যে, সে নাকি রিপোর্ট করবে। অপর পাশে একটি

ক্ষীণকায় মুচি, ছবিতে খৃষ্টের মত, তার দাড়ির রঙটি একটু কটা, আর গাল দুটো জ্বরে লাল। সে ক্যান্সার হয়ে মরতে বসেচে। তারি সঙ্গে সমকোণ করে শুয়েছিল একটি লোক পয়গম্বরের ( prophet ) মত, মোজেসের মত মুখ আর দেহের গড়ন তার; সাদা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দাড়ি আর কি! ক্ষয়রোগের শেষ সীমায় সে পৌঁছেচে, তার কাসির শব্দটা ঠিক নাল-গাড়া কলের শব্দের মত। কোঁকাতে কোঁকাতে সে বলে, "হুঃ, শুধু যদি জার্ম্মানীতে যেতে পারতাম, তাহলে তবু হয়ত বাঁচতে পারতাম।" তারি পাশের লোকটা—ছোট দাড়ি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, একটু মাথা খারাপ,—সে ভাবে সে হচ্চে সেপাইদের কর্পোরাল। প্রায়ই রাত্তিরে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে' বলে' ওঠে, 'য়্যাটেনসন্'—আর সবাই জেগে ওঠে।

একটি লোক সারা-গা ঘা নিয়ে এপাশ-ওপাশ মোড়া দিয়ে সারাক্ষণ গোঙায়। কিন্তু একদিন সে লোসন করবার 'আলকোহল' খানিকটা খেয়ে বসল। তারপর তার কখনো কান্না—কখনো গান! আর ছিল এক লাল দাড়িওয়ালা চশমা-পরা ব্যাপারী। মাথার ভেতর হঠাৎ সে একদিন গুলি চালিয়ে বসে। গুলিটা ডাক্তারেরা বার করে ফেলেছে। শুয়ে শুয়ে সে ব্যক্তিটি তার এই অদ্ভুত পরিত্রাণের জন্যে ভগবানকে দিনরাত্রি ধন্যবাদ জানায়।

নাইট্-ল্যাম্পের অস্ফুট আলোকে এই মস্ত ঘরটায় রাত্তিরে যখন পীয়ার জেগে থাকে তখন অদ্ভুত ঠেকে তার; মনে হয় যেন তার চারদিকের বিছানাগুলোয় পরলোকের জীবগুলো সব নড়াচড়া করচে। দিনের বেলা রোগীদের আত্মীয় বন্ধুরা তাদের দেখতে আসে, তখন পীয়ার অতি কষ্টে কান্না চেপে রাখে। মুচির এক স্ত্রী আর এক ছোট মেয়ে আসে, তার পাশে এসে বসে' তার দিকে এমন করে' চেয়ে

থাকে, যেন তারা তাকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারে না। সেই পয়গম্বরটিরও স্ত্রী আছে। সে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে।—আর আর সকলেরও কেউ-না-কেউ আছে তত্ত্ব নেবার। কিন্তু লুইসে কোথায়? সে আসে না কেন?

ডান দিকের লোকটির বোনটি মাটিতে লুটিয়ে পড়া ময়লা সিল্কের জমকালো বেশে ভূষিত হয়ে স াঁ করে' এসে ঢোকে, জুতোর গোড়ালি গেছে ক্ষয়ে কিন্তু বড় বড় পালক দেওয়া হ্যাটখানি চমৎকার! বসে' পায়ের 'পরে পা তুলে সে জিজ্ঞেস করে, "কি বিদ্‌ঘুট্টি, কেমন আছো?" তারপরও দু'টিতে 'মাছি, তেলাপোকা' 'গ্যালিয়ট,' 'কিং রিং' আরো এমনি সব অদ্ভুত নাম-আলা সব বন্ধুদের বিষয় অদ্ভুত ধরণে কি-সব বলাবলি করে। একদিন সে 'শজারু'র ভেট স্বরূপ এক বোতল ব্রাণ্ডি কোনো রকমে লুকিয়ে বিছানার চাদরের নীচে রেখে গেল। যেই সে চলে গেল আর 'লাইন ক্লিয়ার' দেখা গেল, পীয়ারের এই পার্শ্ববাসীটি বোতলটি বার করে তার ছিপিটি খুলে ফেলল আর পীয়ারকে 'পানের' আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, "নাও হে বেটা, নাও, এতে উপকার করবে।" না, পীয়ার পান করল না। তখন ডকের মজুরের খাট থেকে ঢক্ ঢক্ শব্দ হলো, তার অল্পক্ষণ পরেই গলা খুলে গান আরম্ভ হয়ে গেল।

শেষে একদিন লুইসে এলো। এলো সে তার পরিষ্কার হ্যাটখানি মাথায় দিয়ে, চারদিকে চাইতে চাইতে একটি ছোট্ট বাণ্ডিল হাতে নিয়ে। হাসপাতালের (রুগী-ওয়ার্ডের) বদ্ধ বাতাসে দম যেন তার বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই পীয়ারকে দেখে মৃদু হেসে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সে সন্তর্পণে তার কাছে এগিয়ে এলো। পীয়ার এতখানি বদলে গেছে দেখে লুইসে বিস্মিত হ'ল। কিন্তু পীয়ারের শিয়রে যখন সে বসলো, তখন যদিও চোখ জলে ভ'রে উঠছিল, তবু সে হাসতে লাগল।

"তা হলে এত কাল পরে এসেচ ?"

লুইসে ফুঁপিয়ে বললে, "আগে যে তারা আমায় আসতে দেয় নি।" তখন পীয়ার জানতে পারলে যে লুইসে রোজ এসেচে কিন্তু রোজই এই কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েচে যে, পীয়ার এত অসুস্থ যে, তার সঙ্গে কারু দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে না।

দীনবেশা তরুণীটিকে ভালো করে দেখবার জন্যে সেই নাক-ভাঙা লোকটা তার গলাটা বাড়িয়ে দিলে। লুইসে তখন তার বাণ্ডিল থেকে তার উপহার বার করতে লাগল—এক বোতল লেমনেড আর কয়েকটা কমলালেবু।

কিন্তু একদিন কি দু'দিন পরে একটি ঘটনা ঘটল যা পরজীবনে প্রায়ই তার স্মরণে এসেচে।

সারাটা বিকেল বেলা ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে যখন সে জেগে উঠল, তখন আলো জ্বালা হয়ে গেছে, আর একটা ম্লান, অস্পষ্ট পীত আলো সমস্তটা ওয়ার্ডের ওপর পড়েচে। আর সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েচে বলে বোধ হল, চতুর্দ্দিক তখন খুব শান্ত, শুধু ঘা-ওলা লোকটা অল্প অল্প কাতরাচ্চে। তখন দোর খুলে গেল পীয়ার দেখলে, লুইসে সতর্ক মৃদু পদক্ষেপে ভেতরে এলো, বগলে তার ভায়োলীন কেস্‌টা নিয়ে। যেখানে তার ভাই শুয়েছিল সেখানে সে এলো না, ওয়ার্ডের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে বেহালাটি বার করে নিয়ে একটি ইষ্টারের স্তবগান বাজাতে আরম্ভ করল।

ঘায়ের মানুষটা গোঙানো বন্ধ করল ; চারদিকের খাটে রুগীরা সব চোখ খুলে চাইল। ভাঙা-নাক ডকের মজুরটা খাটের 'পরে উঠে বসল, মুচি তার জ্বর-বিকৃত স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে কনুয়ে ভর দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে' বলতে লাগল, "এই তো ত্রাণকর্ত্তা, আমি জানতাম তুমি আসবে।" তারপর সব নিস্তব্ধ হল। লুইসে তার বেহালার 'পরে দৃষ্টি স্থির করে'

তার যথাশক্তি বাজাতে লাগল। ক্ষয়রোগী মাথা তুললো, কাসতে সে ভুলে গেল; কর্পোরাল 'য়্যাটেন্শনের' অবস্থায় দেহখানাকে ধীরে ধীরে শক্ত করে' তুলল; ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী হাত যোড় করে সামনের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। স্তবের সহজ সুরে যেন ওই সব হতভাগ্যরা নতুন প্রাণ লাভ করতে লাগল; তারি জ্যোতিঃ ফুটে উঠল তাদের মুখে। কিন্তু সেই আধ-আলোয় তার দণ্ডায়মানা বোনটির দিকে চেয়ে চেয়ে পীয়ারের মনে হতে লাগল যেন, লুইসে সেই স্তবগীতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে, যেন উর্দ্ধে উধাও হয়ে যাবার জন্যে সে পাখা পেয়েচে।

যখন তার বাজানো শেষ হল, মৃদুপদে সে তার খাটের কাছে এলো, তারপর পীয়ারের কপালে তার ফুলা হাত চাপড়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বহুক্ষণ সেই ম্লানান্ধকার ওয়ার্ডে সব নিঃশব্দ হয়ে রইল, শেষে মরণোন্মুখ মুচি অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, "ধন্যবাদ তোমায়—আমি জানতাম—জানতাম, তুমি বেশী দূরে নেই প্রভু!"

পীয়ার যখন হাসপাতাল ছাড়ে তখন ডাক্তার বললেন, যেন গিয়েই সে কাজ আরম্ভ না করে—শক্তি অর্জ্জন করবার জন্যে পল্লীর দিকে তার বেড়াতে যাওয়া দরকার। পীয়ার মনে মনে বললে, "মশায়ের পক্ষে বলাটা তো খুবই সোজা কিনা।" দিন দুই পরেই সে আবার ওয়ার্কশপে (কারখানায়) গেল।

কিন্তু বোনের সঙ্গে তার ব্যবহার আগের চাইতে বেশী বিবেচনার পরিচয় দিতে লাগল। খুঁজে-পেতে সে তার বোনের জন্য সেলাইয়ের একটা কাজ জোগাড় করে' তাকে কঠিন মেজে পরিষ্কারের কাজ থেকে মুক্ত করল।

অল্পকালের মধ্যেই আনন্দের সঙ্গে লুইসে দেখতে পেল যে তার হাত আগের মত ফোলাও নেই, লালও নেই, বাস্তবিক ধীরে ধীরে তার হাত কোমল এবং সুন্দর হয়ে উঠচে।

পরের বছর শীতে পীয়ার যখন সন্ধ্যেবেলা পড়ত, লুইসে বাড়ীতেই বসে বসে তার নিজের পোষাক, ক্লোক, নতুন হ্যাট তৈরী করত। অল্পদিন পরেই সে বেড়াবার সাথী পেল এই সুন্দরী তরুনীটীকে। কিন্তু যখন লুইসে পাশ দিয়ে যায়, লোকেরা তাকে দেখবার জন্য ফিরে তাকায় আর পীয়ার ভ্রূকুটি করে, হাতের মুঠা শক্ত হয়ে উঠে। শেষে একদিন লুইসের অসহ্য হয়ে উঠল, বিদ্রোহিনী বলে উঠল, "দ্যাখো, পীয়ার, স্পষ্ট বলচি তোমায়, যদি তুমি ফের ওরকম কর, তা হলে আমি আর তোমার সঙ্গে বেরুবো না।"

পীয়ার গর্‌গর্‌ করতে করতে বলল, "বেশ বেশ লক্ষ্মী, যাক্‌ আমি আছি, তোমার কোনো ভয় নেই। তোমাকে নিয়ে আবার মার মত ব্যাপার আমি হতে দিচ্চি না কিছুতেই।"

"বেশ, কিন্তু মোটের উপর আমার এখন বয়স হয়েচে। আমার পানে লোকের তাকানো তো বন্ধ করতে পারবে না, বোকাচন্দ্র!"

সেবার হেমন্তে ক্লসব্রোক টেক্‌নিক্যাল কলেজে ঢুকল; তাই এখন সে টুপিতে কলেজ-ব্যাজ পরে আর সিগারেট খায়; হাতে ছড়িও উঠেচে। প্রকাণ্ড, চওড়া চেহারা হয়েচে তার, চলবার সময় একটু দুলে দুলে চলে; কপালের ওপর একরাশি কালো চুল এসে পড়েচে; চারদিকে সে তাকায় এমনি ধরণে যেন সে বলে, "কি, করতে হবে কিছু? বেশ তো, চলো।"

একদিন সন্ধ্যেবেলা সে এলো, লুইসেকে তার সঙ্গে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইল। তরুণীর মুখ আনন্দে লাল হয়ে উঠল আর পীয়ারও না

বলতে পারল না। কিন্তু যখন তারা ফিরে এল তখন পীয়ার উঠোনের বাইরের ফটকে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতীক্ষা করছিল।

অল্পদিন পরেই একদিন রবিবারে ক্লস আবার এলো লুইসেকে গাড়ীতে করে' একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে। এবার লুইসে পীয়ারের দিকে তার অনুমতির আশায় না চেয়েই তৎক্ষণাৎ "হ্যাঁ" বলে ফেলল। পীয়ার আপন মনে বলল, "আ-চ্ছা, সবুর কর না!" সেদিন যখন লুইসে ফিরে এল সন্ধ্যেবেলা, পীয়ার তার ওপর এক ভয়ানক বক্তৃতা ঝাড়ল।

অল্পকালের মধ্যেই পীয়ার বুঝতে পারল যে, মেয়েটি প্রায় চোক বুজে পথ চলচে আর তাকে কখনো বলবে না, এমনি সব স্বপ্ন দেখেচে! দিন যতই যায়, হাতগুলো তার ততই শুভ্র হয়ে ওঠে, আগের চাইতে লঘুপদে সে চলে যেন কোন্ অশ্রুত সঙ্গীতের ছন্দে! সব সময় ঘর-গৃহস্থালীর কাজের সঙ্গে কোন্ গানের গুঞ্জন লেগেই থাকে; যেন তার অন্তরাত্মার মধ্যে কোন্ আনন্দ আজ প্রকাশ চায়।

বসন্তের শেষাশেষি এক শনিবারে লুইসে সবে বাড়ী এসে খাওয়ার আয়োজন করচে, পীয়ার তার খুব ভালো জামা পরে' একটা পার্সেল নিয়ে ধুপ-ধাপ্ করতে করতে ভেতরে এলো।

"আরে লক্ষ্মী, এই নে! আজ আমাদের এখানে রাত্তিরে বিরাট ভোজ।"

"কেন—এসব কি ব্যাপার?"

"'টেক্‌নিক্যালের,' প্রবেশিকা পাস করেচি, হুর্‌রে! আগামী হেমন্তে—আগামী হেমন্তে আমি ছাত্র হব!"

"বাঃ চমৎকার! আমার ভারি আনন্দ হচ্চে!" হাতটা মুছে নিয়ে লুইসে পীয়ারের হাত চেপে ধরল।

"এই নাও—মাছ, মাংস,—আর এই নাও এক বোতল ব্রাণ্ডি, এই আমার জীবনে প্রথম। ক্লসও পরে আসচে আমাদের সঙ্গে একগ্লাস তাড়ি খাবে। আর এই ছানা; আজ রাত্তিরে দেখ না কি ফুর্ত্তিটাই হয়!"

ক্লস এলো; দুই যুবকে মিলে তাড়ি পান করল, সিগারেট খেলো, তার পর তাদের বক্তৃতা হল আর লুইসে তার বেহালায় স্বদেশ সঙ্গীত বাজাল, ক্লস তার দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলি বলতে লাগলো, "আরো—আরো!"

ক্লস যখন যায় তখন পীয়ারও তার সঙ্গে গেল। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ক্লস তার বন্ধুর বাহু ধরে ফিয়োর্ডের ওপর ম্লান চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি তুলে শপথ করে' বললে, "যতদিন পীয়ার একেবারে সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় না উঠবে ততদিন সে তাকে কখনো ছাড়বে না, কখনো না, কখনো না।" তা ছাড়া সে বললে যে, সে নাকি 'সোসিয়ালিষ্ট' হয়েচে, সমস্ত শ্রেণীগত ভেদের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। আর লুইসে—লুইসে হচ্চে সারা দুনিয়ার সেরা মেয়ে, তাই এখন—পীয়ারকে যখন পরে জানতেই হবে, এখনই সে জানতে পারে যে ক্লস আর লুইসে, দুজ'নে তখন পরস্পরকে বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েচ।

পীয়ার ক্লসকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে, "বাড়ী যাও এখন, ঘুমোও গে।"

"এ্যাঁ তুমি ভাবচ আমার পরিবারকে—এই সারা দুনিয়াটাকে আমি তুচ্ছ করতে পারি তেমন পুরুষত্ব আমার নেই?"

পীয়ার বললে, "শুভরাত্রি।"

পরদিন সকালে যখন লুইসে বিছানায় শুয়ে তার ব্রেকফাষ্ট খেতে চাইলে, তখন হঠাৎ লুইসে হাসতে লাগল, দুষ্টামীর ভঙ্গীতে বলে উঠল, "এ আবার কি হচ্চে তোমার?"

পীয়ার কর্ম্ম সুরু করে বললে, "কামানো।"

"কামাচ্চো! বাবু হবার জন্যে এমনি মরিয়া হয়ে উঠেচ যে, চামড়াটাই চেঁচে ফেলতে চাচ্চ। তা ছাড়া যে চাঁচবার কিচ্ছুই নেই ওখানে সেটা জানো তো।"

"চুপ করো। আজকে আমার সাম্‌নে যে কাজ, তার কি জান তুমি!"

"কী সে কাজ শুনি! বারো ছেলের বিধবা মায়ের সঙ্গে প্রণয়ের চেষ্টা নাকি?"

"যদি জান্‌তে চাও তো শোনো, আমি যাচ্ছি সেই স্কুল মাষ্টারটার কাছে, আমার সেই সেভিংসব্যাঙ্কের পাসবুকখানা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে যাচ্ছি।"

এবার লুইসে উঠে বসল। বলল, "বল কি!"

হ্যাঁ; এর জন্যে সে এক বছরেরও বেশি হল কাজ করে' এসেচে, এবার সে তা সম্পূর্ণ করতে যাচ্চে। এবার সে দেখাবে সে কি দিয়ে তৈরী; সে একটা ছোক্‌রা—না এই দুনিয়ার যে-কোন গাউনপরা লোকের সামনে দাঁড়াতে পারে এমনি একজন মানুষ, সেইটে সে আজ দেখাতে চায়। কামাচ্চে সে এই প্রথম—তা ঠিক। আর তার কারণ হচ্চে আজকের দিনটা কোনো মামুলি দিন নয়—একটা মস্ত দিন।

প্রসাধন শেষ করে' বেশ একটা ভঙ্গী করে' তার সেরা হ্যাটখানা মাথায় দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

তার ফেরার প্রতীক্ষায় লুইসে সারাটা সকাল বাসায় রইল, শেষে সিঁড়িতে তার আসার শব্দ শুনতে পেল।

"বা-ব্বা!" বলে পীয়ার ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রইল।

"তারপর? পেয়েচ সেটা?"

পীয়ার হাসল, কপালটা মুছে কোটের পকেট থেকে একখানি সবুজ-মলাট বই বার করল। "এই নাও, লক্ষ্মী, তিন বছরের জন্য মাসে পঞ্চাশ ক্রাউন। মাইনে—বই—তার ওপর খাওয়া পরা—একটু কষ্ট হবে বটে, কিন্তু তাই করা যাবে আর কি! বাবা ছিলেন খাঁটি মানুষ, যে যাই বলুক গে।"

"কিন্তু কি ক'রে করলে তুমি? স্কুলমাষ্টার কি বললেন?"

বললেন, "তুমি কি ভাবো যে, তোমার মত ছেলে, যার এতটা বয়স ওভাবে কেটেচে সে কখনো টেকনিক্যাল কলেজে যেতে পারে?" তখন আমি বললাম, "আমি তো পাস করেচি।" "এ্যাঁ কি বল? কি ক'রে পাস করলে?" বলে' নাকের 'পরে চশমাটা একটু নীচের দিকে নামালেন। তারপর বললেন, "না, না, ওহে বালক, আমার কাছে ওসব গল্প করতে আসা বৃথা।" আমি তখন সার্টিফিকেটখানা মেলে ধরলাম, এবার অনেকটা নরম হয়ে এলেন। বললেন, "এ্যাঁ, বাস্তবিক নাকি! আশ্চর্য্য!" ইত্যাদি। কিন্তু শোন লুইসে, এই হেমন্তে আর একজন হল্‌ম্ ভর্ত্তি হয়েচে সেখানে।"

"পীয়ার, তুমি কি বলচ যে সে তোমার সৎ-ভাই?"

"বৃদ্ধ গাউনধারী বললেন তা' হবেনা, কখনো না, আমি বললাম, 'দুনিয়ায় আমার জন্যেও জায়গা থাকাটা দরকার আর আমি ব্যাঙ্ক বইখানা চাই।' তিনি বললেন, 'আইনতঃ তোমার অধিকার আছে ব'লে তোমার একটা ধারণা হয়েচে বোধ হচ্চে'—বলে' ভয়ানক উগ্র হয়ে উঠলেন। তখন আমি ইঙ্গিতে জানালাম যে, কোনো আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে' বিষয়টা ঠিক কিনা জানবার ইচ্ছে আছে আমার; শুনে তো রাগে একেবারে টগবগ করতে লাগলেন আর চারিদিকে হাতটাকে ছুঁড়তে লাগলেন। যা হোক, তবু কিন্তু একটু পরেই নরম হয়ে গেলেন,

বললেন যে এ ব্যাপারের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলবেন। আর বললেন, 'ভালো কথা, তোমার নাম ব্রোয়েন, বুঝলে, পীয়ার ব্রোয়েন—"হো—হো—হো—পীয়ার ব্রোয়েন! ভারি পছন্দের নাম তাঁর! ত্রে-কেটে-ধা! বলি, চল একটু বাইরে গিয়ে খোলা হাওয়া খেয়ে আসি।"

তখন কিম্বা তারপরও পীয়ার ক্লস-ব্রকের কথা কিছুই বললে না, আর ক্লস নিজে গ্রীষ্মে বাড়ী চলে গেল। গ্রীষ্ম যতই এগোয়, সহরটা যেন গরমে সিদ্ধ হতে থাকে, আর নলের দুর্গন্ধে চারিদিক ভরে ওঠে। আস্তাবলের বদ্ধ বিশ্রী হাওয়া ক্রমে তাদের কুঠুরীতে আসতে লাগল, এক এক সময় মনে হতে লাগল বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে।

পীয়ার বলল একদিন, "ত্যাখো, একটা কথা, বাড়ীভাড়ার জন্তে কয়েকটা শিলিং বাস্তবিক বাড়িয়ে একটু ভদ্ররকমের ঘর নেওয়া দরকার।"

লুইসেরও মত তাই। কারণ আগামী হেমন্তে কলেজে ভর্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পীয়ারকে বাধ্য হয়ে ওয়ার্কশপে থাকতে হবে; তাঁর ছুটি নেবার অবস্থা তেমন নয়।

একদিন সকালবেলা একটা বড় রুষীয় শস্যের নৌকার ইঞ্জিন ঘরে কি মেরামত করবার জন্তে পীয়ার একদল শ্রমিকের সঙ্গে ষ্টেষ্কিয়েরের দিকে রওনা হবে এমনি সময় লুইসে এসে তাকে তার গলাটা দেখবার জন্তে অনুরোধ করে বললে, "এই খানটায় বড় লাগচে।"

পীয়ার একটা চামচ দিয়ে জিভটা চেপে ধরে কিছুই খারাপ দেখতে পেলে না। বললে, "তার চাইতে ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে জেনে এসো, বাস্তবিক কি হয়েচে।"

কিন্তু মেয়েটি গ্রাহ্যই করল না, বললে, "দূর—এ নিয়ে আবার অত কি!"

এক সপ্তাহের চেয়েও বেশিদিন তাকে সেই সঙ্গীদের সঙ্গে নৌকায় কাটাতে হল বাইরে। যখন সে ফিরে এল, তখন বাড়ির দিকে

তাড়াতাড়ি আসতে আসতে হঠাৎ লুইসে আর তার গলার অসুখের কথাটা মনে পড়ল। এসে দেখলে জব্-মাষ্টার গাড়ীর চাকায় তেল দিচ্চে আর তার গিন্নি তাকে জানালা দিয়ে ঝুঁকে তাড়না করচে। প্রকাণ্ড মোটা লাল নাক সমেত মুখখানা ফিরিয়ে গাড়ীওয়ালা বললে, "তোমার বোন হাসপাতালে—ডিপ্‌থিরিয়া হাসপাতালে গেছে। ডাক্তার সপ্তাহ খানেকের বেশী হবে, এসে তাকে নিয়ে গেছেন। তারপর থেকে তাদের লোকেরা প্রায়ই আসে আর জিজ্ঞেস করে, "সে কে, কার,—আমরা তো কিছুই জানিনে। তুমি কোথায় তাও জিজ্ঞেস করেছিল—তাও আমরা জানতাম না। তবে বলচি তোমায়, তার অবস্থা সত্যি খারাপ ছিল—"

পীয়ার দ্রুত বেরিয়ে গেল। সেদিনটা গরম পড়েচে, হাওয়ায় বদ্ধ গুমোট। পীয়ার এগিয়ে চলল—সমস্তটা সী ষ্ট্রীট বেয়ে, জেলেদের পাড়ার মাঝ দিয়ে অন্তরীপের পাশ দিয়ে অনেকটা রাস্তা সে এগিয়ে গেল। তখন সে দেখল একখানি গাড়ী, মামুলী কাজের-গাড়ী তার দিকে আসছে, তার ওপর একটা শবাধার। গাড়োয়ান গাড়ীর ওপর বসে ছিল, আর একটা লোক হ্যাট্ হাতে করে' তার পেছনে হাঁটছিল। পীয়ার দৌড়াতে লাগল—শেষে অন্তরীপের শেষ সীমায় হল্‌দে রঙের লম্বা বাড়ী-খানা দেখতে পেল। ডিপ্‌থিরিয়া রোগীদের প্রতি কি রকম আচরণ করা হয় সে সম্বন্ধে যে-সব ভয়ানক গল্প সে শুনেছিল সে-সব তার মনে পড়ল,—মনে পড়ল, শ্বাস নেবার জন্যে কেমন করে' তাদের গলা কেটে ফাঁক করে দেওয়া হয়, লোহা পুড়িয়ে লাল করে তা দিয়ে গলার মাঝে কি পুড়িয়ে ফেলা হয়—উঃ! যখন সে মস্ত বেড়ার কাছে পৌঁছে ঘণ্টা বাজাল, তখন ঘামে সারা শরীর ভেসে গেছে, রুদ্ধশ্বাসে ফাটকে হেলান দিয়ে সে দাঁড়াল।

ভেতরে পায়ের শব্দ হল, চাবি ঘোরান হল ; লাল গোঁফ, কঠিন নীল চোখের চারিদিকে দাগ—একজন দারোয়ান মাথা বার করে' বললে, "এরকম করে' ঘণ্টাটাকে ঝাঁকাচ্চেন কেন ?"

"ফ্রকেন হগেন—লুইসে হগেন ভাল আছে ? সে কেমন আছে, কেমন আছে ?"

"লু—লুইসে হগেন ? লুইসে হগেন নামের মেয়ে ? আপনি তাকে খুঁজতে এসেচেন ?"

"হ্যাঁ, সে আমার বোন, বল—তা না হলে' আমায় ভেতরে দেখতে যেতে দাও।"

"একটু দাঁড়ান। আপনি কি সেই মেয়েটির কথা বলচেন—যাকে সপ্তাহখানেক আগে এখানে আনা হয়েছিল ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—কিন্তু আমায় ভেতরে যেতে দাও।"

"কোত্থেকে সে এসেচে, তার কেউ আত্মীয় আছেনকি না জানবার জন্যে কি কম হাঙ্গাম করতে হয়েচে ! কিন্তু এই গরমে আর তাকে আমরা রাখতে পারলাম না। আপনি আসার পথে গাড়ীর পরে একটি শবাধার দেখতে পান নি ?"

"কি—কি—কি বলচ—?"

"আপনার আগে আসা উচিত ছিল। পীয়ার বলে' একজনের সে খুব খোঁজ করছিল। 'মেট্রন'কে দিয়ে কোথায় যেন একটা চিঠিও লিখিয়েছিল—লেভাঙ্গের, না ? যার কথা বলছিল, আপনিই কি তিনি নাকি ? যাক্, এসেছেন তা হলে' শেষটায় ! হ্যাঁ—সে চার-পাঁচদিন হলো মারা গেছে। সেণ্ট মেরীর গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে তাকে গোর দেবার জন্যে তারা এই গেল।"

পীয়ার মুখ ফিরিয়ে অন্তরীপের উপর দিয়ে ধূমাচ্ছন্ন সূর্য্যালোকিত

নগরের দিকে তাকালো। নগরের দিকে সে চলল, চলতে চলতে গতি দ্রুত হয়ে এল ; শেষে টুপি খুলে, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁদতে কাঁদতে সে দৌড়তে লাগল। মাথার ভেতর ঘূর্ণীর মত একটা চিন্তা পাক খাচ্ছিল, ভাবছিল, "আমি কি মদ-মাতাল হয়েচি—জাগতে পাচ্চিনে কেন ? এ কি ? এ কি ?" তবু সে দৌড়েই চলল। কোন গাড়ী তবু চোখে পড়ল না। জেলে পাড়ার ছোট ছোট রাস্তাগুলোর কেবলি বাঁক আর কেবলি মোড়। শেষে আবার সে সী-ষ্ট্রীটে পৌঁছল—ওই দূরে সামনে ধীর গতিতে সেই গাড়ীখানা চলেচে। ঠিক দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়ী-খানা ডানদিকে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল, পীয়ার সেই মোড়ে যখন পৌঁছল তখন গাড়ীখানার কোন চিহ্ন কোথাও নেই, তবু সে এলো-মেলো দৌড়িয়ে চলল। বোধ হচ্চিল, রাস্তায় অন্য লোক রয়েচে—ছেলেরা লাল বেলুন উড়াচ্ছে, মেয়েরা চুপড়ি নিয়ে আর পুরুষেরা ষ্ট্র-হ্যাট আর ছড়ি হাতে চলেচে।

পীয়ার কিন্তু তার লাইন ধরে' সামনের দিকে দৌড়ে চলল। লোকগুলোকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে, যারা সামনে পড়ল তাদের ফেলে দিয়ে কেবলি সামনের দিকে ছুটে চলল। কিং ষ্ট্রীটে গাড়ীখানা আবার তার চোখে পড়ল, এবার আগের চাইতে কাছে। যে লোকটা টুপি হাতে গাড়ীর পেছনে চলছিল, তার লাল কোঁকড়ানো চুল ; যে-সব মৃতের শবানুগমী মেলে না, নিশ্চয়ই ইনি সেই সব শবের অনুগমন ক'রে পেট চালিয়ে থাকেন। গাড়ীখানা যখন গির্জ্জা-প্রাঙ্গণের ভেতর ঢুকচে, পীয়ার তখন গিয়ে ধরল তাদের, তখন সে তাদের পেছনে চলবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ল সে, দাঁড়াতে পর্য্যন্ত সে পারে না। গাড়ীর পেছনের লোকটি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,

"কি হয়েচে আপনার ?" গাড়োয়ান ফিরে তাকাল, তারপর আবার সে গাড়ী হাঁকিয়ে চলতে লাগল।

গাড়ী থামল, পীয়ার একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। একটি তৃতীয় লোক এল—বোধ হলো কবর খুঁড়বার জন্যে—পীয়ার শুনল, পাদ্রীর জন্যে কতক্ষণ হাঁ করে থাকতে হবে এই নিয়ে তারা তর্কবিতর্ক করচে। গাড়োয়ান তার ঘড়ি দেখে বলল, "সময় তো হয়ে গেল, না ?" কবর খুঁড়্‌নেওয়ালা সম্মতি জানিয়ে বললে, "হ্যাঁ, ক্লার্ক তো বলেছিলেন এই সময়েই আসবার কথা"—বলে' সে তার নাকটা পরিষ্কার করে নিলে।

একটু পরেই ধর্ম্মযাজক মশায় কালো পোষাক পরে আর সাদা 'কলার' লাগিয়ে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হলেন; নিশ্চয়ই সেদিন আরো মৃত সৎকার করবার ছিল। পীয়ার একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল; শবাধার গাড়ী থেকে ওঠানো হলো, কবরের কাছে এনে তাকে নামিয়ে দেওয়া হলো, পীয়ার শূন্য দৃষ্টিতে বোকার মত তাকিয়ে রইল। লাল নাকের ওপর চশমা চড়িয়ে একটি লোক একটা প্রার্থনা-গ্রন্থ নিয়ে এলেন, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন গাইলেন। ধর্ম্মযাজক মশায় খোন্তা ওঠালেন, প্রথম খোন্তায় তোলা মাটি লুইসের 'কফিনে'র ওপর পড়বার শব্দে যেন আহত হয়ে পীয়ার এমনি চমকে উঠল যে, আর একটু হলে সে পড়েই যেত।

চোক তুলে যখন আবার সে চাইলে, তখন সেখানে কেউ নেই। ঘণ্টা বাজচে আর তখন গির্জ্জাপ্রাঙ্গণের আর এক অংশে একটা ভিড় জমেচে। পীয়ার যেখানে ছিল সেখানেই নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইল।

সন্ধ্যেবেলা কবর খুঁড়নেওয়ালা যখন ফাটকে তালা দিতে এল, তখন সে অগত্যা পীয়ারের ঘাড় ধরে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে সচেতন ক'রে বললে, "তালাবন্ধ করবার সময় হয়েচে, এখন যেতে হবে তোমায়।"

পীয়ার উঠল, চলবার চেষ্টা করল, তার পর ধীরে ধীরে অন্ধের মত ঠোকর খেতে খেতে ফাটক পেরিয়ে রাস্তা বেয়ে সে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখতে পেল যে, সে একটা আস্তাবলের প্রাঙ্গণের ওপরের সিঁড়ি বেয়ে উঠচে। ঘরে ঢুকেই, যে অবস্থায় সে ছিল সেই অবস্থায়ই খাটে চিৎ হয়ে পড়ল, তেমনি ধারা সে শুয়েই রইল।

দিবসের অবরুদ্ধ তাপ ফেটে পড়ল বারিবর্ষণে, সেই বর্ষণের ঝর ঝর শব্দ হতে লাগল তার মাথার 'পরে, ছাতে আর নলের ভেতর দিয়ে সেই জলপ্রপাতের মত পড়তে লাগল। নিজের অজ্ঞাতসারেই পীয়ার চমকে উঠলো—লুইসে তো এই বৃষ্টিতে রাস্তায় রয়েচে, তার যে ক্লোকটার দরকার এখন সেইটে বার করবার জন্যেই যেন পীয়ার তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল; পরমুহূর্ত্তেই চমকে গিয়ে আবার ধীরে ধীরে খাটে শুয়ে পড়ল।

পা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে মাথাটা গুঁজে সে পড়ে রইল। কত ঝড়-ঝঞ্ঝার মৃত্যুর, আর নিষ্করুণ কোন্ ইচ্ছার নির্ম্মম উদাসীন শাসনের অধীন এই বিশ্বজগতের অসহায় মানুষের কত দৃশ্য তার মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে ভিড় ক'রে দ্রুত গতিতে চলতে লাগল।

তখন সে এই সর্ব্বপ্রথম যেন স্বয়ং বিধাতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে চেঁচিয়ে বললে, "এ-সবের মাঝে কোনো অর্থ নেই, আমি এ বরদাস্ত করবো না।"

ছোটবেলায় সে যে প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে শিখেছিল সেই প্রার্থনার জন্যে যখন সে রাত্তিরে চিরাভ্যাসের মত হাত জোড় করতে যাচ্চে বুঝতে পারল, তখন হঠাৎ সে অট্টহাস্য ক'রে উঠল, তার পর দৃঢ়মুষ্টি হয়ে চীৎকার ক'রে বললে, "না, না, না—আর কখনো না।"

ফের তার মনে হলো যে, ঈশ্বর কতকটা ওই স্কুলমাষ্টার মশায়ের মত—যারা বেশ আছে তিনি তাদেরি পোষণ করেন। "হ্যাঁ, যাদের

মা-বাপ আছে, বাড়ী-ঘর, ভাই-বোন, সাংসারিক সম্পদ আছে, আমি তাদের যত্ন নিই, তাদের রক্ষা করি। কিন্তু এই যে বালক এই বিশ্ব-সংসারে একাকী প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রে চলেচে, তার যেটুকু আছে সেটুকুও আমি কেড়ে নেব। ও ছেলেটা কারু কাছে কিছু না। ও যখন গরীব, দাও ওকে শাস্তি, ওর যখন কেউ নেই দেখবার, দাও ওকে মাটিতে ফেলে। ও ছেলেটা কারু কেউ না—কিছুই না।" ওঃ—ওঃ—হো! ঘুসি পাকিয়ে দেয়ালটাকে সে আঘাত করতে লাগল।

তার ছোট জগতের সবটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। হয় তো ঈশ্বর একে-বারেই নেই, আর নয় তো সে ঈশ্বর নির্ম্মম নির্ব্বিকার—দুটোই সমান খারাপ। স্বর্গরাজ্য মেঘের মাঝে মিলিয়ে গেল, ঊর্দ্ধে একটা শূন্য ছাড়া কিছুই রইল না। ওরে, মহামূর্খের মত আর হাতযোড় করিস্ না! মাটির ওপর দিয়ে চল্—যেমন করে স্কুলমাষ্টারকে তুচ্ছ করেছিলি তেমনি ঈশ্বরকে, নিয়তিকে তুচ্ছ ক'রে মাথা উঁচু ক'রে চল্। ত্রাণের জন্য তোর মা তোকে আর চায় না, সে আর কোথাও নেই। সে মরে গেছে, মরে মাটি হয়ে গেছে। এই জগতে তোর জন্যে, তোর মার জন্যে, যে কোন প্রাণীর জন্যে এর বেশি কিছু থাকতে পারে না।

সেখানে সে পড়ে রইল। ঘুমুতে সে চায় তবু কোন্ এক অস্পষ্ট সুদূর আধ-আলোর মাঝে যেন কালো আর সোনালি ঢেউয়ের দোলা খেতে খেতে সে মগ্ন হতে লাগল। একটা কিসের শব্দ এলো—ও কিসের শব্দ?—বেহালার। সেই প্রার্থনা-সঙ্গীত! লুইসে—এ কি তুমি বাজাচ্চো? তখন সে যেন তাকে সেই অস্পষ্ট আলোয় চিনতে পারল। কি ম্লান মূর্ত্তি তার! কিন্তু তবু সে বাজাতে লাগল। তখন সে ওই আলো-ছায়ার অর্থ বুঝতে পারল।

দৈনিক জীবনের চেতন-লোকের পারে এই জগৎ—এ জগৎটি তার।

"পীয়ার আমায় এখানে থাকতে দিও।" কে যেন তার মাঝখানে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ লুইসে, ওইখানে তুমি থাকবে। ঈশ্বর না থাক্, অমরতা না থাক্, তবু তুমি ওইখানে থাকবে।" লুইসে মৃদু হাসল তখন, আর বাজাতে লাগল। পীয়ার যেন স্বর্গকে, ভগবানকে তুচ্ছ ক'রে লুইসের জন্য একটি ছোট্ট গোল প্রার্থনা-মন্দির তৈরী করতে লাগল, যেন সে তার জন্যে নিজের হাতে শাশ্বত কালের একটি প্রার্থনাকে ধ্বনিত করতে চায়। এ কি হলো তার মাঝে? কেউ তাকে সান্ত্বনা দেবার নেই, তবু যা-কিছু প্রাণময় সবকে, এই ধরণী আর নক্ষত্র-মণ্ডলকে সে যেন তার অন্তরতম সত্তা থেকে কি নিবেদন ক'রে দিলে, আর তার শোকের অবসান হলো। তখন মনে হলো, তার সঙ্গে সব যেন প্রার্থনার বিশাল তরঙ্গের তালে তালে কেবলি দোল খাচ্ছে। পাছে সে জেগে ওঠে, পাছে জেগে দেখে যে এ-সব মাত্র একটা সুন্দর স্বপ্ন, সেই ভয়ে সে হাত ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে' সেখানে পড়ে রইল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

টেকনিক্যাল কলেজে ছুটোর ঘণ্টা বাজতে সুরু হ'ল আর এলো-মেলো ভাবে ছড়ানো লম্বা বাড়ীগুলো থেকে ছাত্রের প্রবাহ বেরিয়ে এসে ফাটক পার হয়ে ছোট ছোট দল বেঁধে ভিন্ন পথে সহরের দিকে রওনা হল।

সতের থেকে সুরু করে ত্রিশ কিম্বা তারো বেশী, নানা বয়সের যুবকদের এ এক বিচিত্র সমূহ! কতক ছাত্র সেই সনাতন ধরনের—বাপ-মা যাদের শেষ পন্থা হিসেবে এখানে পাঠিয়েছেন—কারণ, "ইঞ্জিনীয়ার হওয়াটা যে কোনো সময়ে হ'তে পারে"; কতক সেই তরুণ

মাণিকেরা যাঁদের মনোযোগটা পুস্তকের চেয়ে প্রসাধনেই বেশী, যাঁরা কাজ করবার বালাই চুকিয়ে "কোন রকমে পাশ" হবেনই আশা করেন; আর কতক সৈনিক ধরনের কাঠখোট্টা যুবক, যাদের গড়ে' তোলা হয়েছিল সেনা-বিভাগের জন্য কিন্তু তারাও তো "যে-কোনো সময় ইঞ্জিনিয়ার হ'তে পারে।" আর ছিল কৃষক-বালকেরা, যারা মুখস্ত বিদ্যার জোরে বেশ প্রবল বেগে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেচে; এখন তারা তাদের মোটা মেটেরঙের গ্রাম্য পোষাক পরে' মাথায় কলেজ-ক্যাপ পরেচে আর দেখতে দেখতে এখান থেকে পাশ করে' প্যাঁস-নে-পরা মস্ত লোক হবার স্বপ্ন দেখচে। ফ্যাকাশে-পানা তরুণ-উদ্যমীরাও আছেন—যাঁরা সম্ভবতঃ পরিণামে অভিনেতা হবেন; সমালোচক-নিহত ভূতপূর্ব্ব অভিনেতারাও আছেন; বোধ হয় তবু ইঞ্জিনিয়ার হবার প্রচুর জীবনীশক্তি এঁদের রয়েচে। তরুণেরা যখন তাদের উৎফুল্ল ভাবনাহীন গতিতে সহরের দিকে যায়, এখানে সেখানে এক আধজন বয়স্ক লোক হয়ত বিষণ্ণ হাস্যে এদের দিকে ফিরে চায়। বেশীর ভাগের কপালে যে কি আছে তা বলা বিশেষ শক্ত নয়। কলেজ শেষ হলেই তারা যাযাবর পাখীদের মত এই বিশাল জগতে ছড়িয়ে পড়বে। হাজার হাজার মাইল দূরে, ঘর ছেড়ে বন্ধুবান্ধব ছেড়ে কতক আফ্রিকায় লু'-লেগে মরবে, কতক চীনেদের হাতে খুন হবে, কতক পেরুর পাহাড়ে খনির রাজা হবে, কতক সাইবেরিয়ায় ফ্যাক্টরীর কর্ত্তা হবে। এই সমস্তখানা গ্রহ তাদের ঘর। শুধু সামান্য কয়েকজন—আর তারা প্রায়ই ছেলেদের সেরা নয়—স্বদেশেই থাকবে, তারা ষ্টেট রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে আপিসে বসবে আর পাঁচ বছর পর পর বারো পাউণ্ড হিসাবে মাইনে বাড়ার প্রতীক্ষা করবে।

বগলে বই নিয়ে সহরে ফেরার পথে একদিন ক্লাউস পীয়ারকে বললে, "ওই সেই ছেলে, তোমার সেই ভাই, ওই!"

"ছাখো, ক্লাউস, বলে রাখচি তোমায়, দয়া করে' তুমি তাকে আমার ভাই ব'লো না। আর এক কথা—আমার বাবা চাষা ছিলেন এ ছাড়া আর একটি কথাও তুমি কাউকে কখনো ব'লতে পারবে না। আ্যমার নাম হল্‌ম্ আর এ নাম আমার বাবার খামারের নামে, এটা মনে থাকে যেন, বুঝেচ ?"

"আচ্ছা বেশ, তুমি অত উত্তেজিত হয়ো না।"

"তুমি কি মনে কর ওই হামবড়াকে এই মনে করে' খুসী হতে দেব যে, আমি তার মন যোগাতে চাই ?"

"না, না, তা কেন ?" ক্লাউস অসন্তুষ্ট হয়ে ঘাড় কুঁচকে শীস্ দিয়ে এগিয়ে চল্‌ল।

"কিম্বা এই মনে করতে দেব যে, আমি তার সম্ভ্রান্ত পরিবারে অশান্তি আনতে চাচ্ছি ? না, একদিন আমি হয়ত এর শোধ তার ওপর নেব, কিন্তু এ-রকম করে নয়।"

"বেশ, কিন্তু যাই হোক্ ভায়া, অন্যে তার সম্বন্ধে কি বলে তা শোনবার শক্তি নিশ্চয়ই তোমার আছে ?" ক্লাউস তার কথা বলতে লাগল। শোনা যায়, ফার্দ্দিনান্দ হল্‌ম্ সম্বন্ধে তার পরিবারের লোকেরা হতাশ হয়ে পড়েন। মিলিটারী একাডেমীর লেখা-পড়া সে ছেড়ে দেয়, কারণ তার মনে হয় যে, সৈনিকেরা আর তাদের কাজ একটা উদ্ভট হাস্যকর ব্যাপার। তারপর অল্পকাল ধর্ম্মবিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা চল্‌ল, সেটা তার আরো খারাপ বোধ হয়; শেষে ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে মোটামুটি সৎ পেশা মনে ক'রে টেকনিক্যাল কলেজে এসে খুঁটি গাড়া হয়েছে। ক্লাউস জিজ্ঞেস করল, "এখন কি বল হে ?"

"আমি এতে এমন কিছু দেখবার মত তো পাচ্চি নে।"

"আর একটু ধৈর্য্য ধর, এখনো গল্পের সারটুকুই বাকী। কয়েক হপ্তা

আগে সে রাস্তায় একটা পুলিশকে, একটা ছোট ছেলেকে অপমান করেচে না কি করেচে ব'লে খুব পিটিয়েছিল। তার পর তো ভয়ানক কুৎসিৎ কাণ্ড—হাতে হাত কড়া, পুলিশ কোর্ট, জরিমানা ইত্যাদি। গত শীতে করল কি না, সকলকে জানিয়ে দস্তরমত এবং খোলাখুলি সে তার মায়ের এক দাসীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করল। তার মা যখন তাকে না জানিয়ে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলেন, তখন সে বিদ্রোহী হয়ে একেবারে বাড়ীই ছেড়ে দিলে। এখন তো সে সমাজের অভিজাত শ্রেণী আর তাদের ক্রিয়াকলাপের ওপর একেবারে হাড়ে চটা, তাদের পরে অগ্নিবর্ষণ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার। এতে তোমার কি মনে হয় ?"

"আচ্ছা বলি মশাই, আমার সঙ্গে ও-সবের সম্পর্কটা কি ?"

"যাই হোক, আমার কাছে কিন্তু এটা তার ভয়ানক সাহসের কাজ বলে মনে হয়। আর যদি পারি তো আমি তার সঙ্গে আলাপও করবো। ওরা বলে যে সে নাকি খুব পড়াশুনা করেচে আর বুদ্ধিও নাকি বেজায় রকমের।"

পীয়ার কলেজে যেদিন প্রথম গেল সেদিনই সে ফার্দিনান্দ হল্‌মের কথা শুনতে পেল আর মনোযোগ সহকারে তাকে দেখল। ফার্দিনান্দকে দেখতে লম্বা আর সোজা, লালচে ধরণের চুল, মুখখানি দাগে ভরা, চোখে কালো প্যাঁস-নে। সাধারণ কলেজ-ক্যাপ সে মাথায় দিত না, তার মাথায় ছিল মেটে-রঙের শক্ত ফেল্ট-হ্যাট, বয়স মনে হয় চব্বিশ কি পঁচিশ।

পীয়ার মনে মনে বলেছিল, "সবুর হে সবুর করো। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহ তুমিও সেদিন সেখানে ছিলে—যেদিন তারা আমায় গির্জ্জাপ্রাঙ্গণ থেকে তাড়িয়েছিল। কিন্তু এখানে তো সে সব আসচে না তোমায় সাহায্য করতে। তুমি হয়তো আমার আগে সুরু করে এটা-ওটা-সেটা শিখে নিয়েচ, কিন্তু—একটু সবুর করো না!"

কিন্তু একদিন সকালে বাইরে প্রাঙ্গণে সে দেখতে পেল যে, ফার্দিনান্দও এবার তার দিকে তাকাচ্ছে, তাকে ভালো করে দেখবার জন্যে চশমাটাকে সোজা করে বসাচ্চে। পীয়ার তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে সরে গেল।

ফার্দিনান্দ কিন্তু তার ম্যাট্রিকুলেশনের জোরে সরাসরি এক ক্লাস ওপরে স্থান পেল। আর তার বিষয়ও ছিল ভিন্ন—রাস্তা আর রেলওয়ে তৈরী; সেজন্যে ওই প্রাঙ্গণে আর যাতায়াতের পথে ছাড়া তাদের দেখা হতো না।

কিন্তু বড়দিনের অল্প পরেই একদিন অপরাহ্নে বড় ডিজাইনের ক্লাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করচে, এমন সময় সে তার পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দেখে ক্লাউস ব্রক—আর ফার্দিনান্দ হল্‌ম্।

হল্‌ম্ বললে, "আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলাম"—তারপর ক্লাউস তাদের পরিচয় করিয়ে দিলে; সে তার তর্জ্জনীতে লাল আংটিপরা প্রকাণ্ড সাদা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "বোধ হচ্চে আমাদের দুজনেরই এক নাম, ব্রক আমায় বলেচে যে আপনার জন্মস্থান হল্‌মের থেকেই আপনার ও নামটি হয়েচে।"

পীয়ার বলল, "হ্যাঁ, আমার পিতা সাধারণ কৃষক ছিলেন," কথাগুলোর মাঝে দৈন্যের সুর ফুটে উঠল দেখে পীয়ার তৎক্ষণাৎ নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল।

ফার্দিনান্দ মৃদু হেসে বলল, "সে তো ভালো কথাই।"

"আচ্ছা প্রথম টার্মের Projection drawing কি অতদূর এগিয়েচে? জিজ্ঞেস করলাম ব'লে কিছু মনে করবেন না। মিলিটারী একাডেমীতে এই রকমের কাজ অনেক করতে হয়েছিল কি না, তাই এ জিনিসটা আমি অল্প একটু জানি।"

পীয়ার ভাবল, "ও, পরামর্শ দেবার দুঃসাহস দেখচি তো খুব!" জোরে বল্‌ল, "Senior class-এর Drawing বোর্ডে ছিল প'ড়ে, তাই দেখচি কতদূর কি করতে পারি।"

ফার্দিনান্দ তার দিকে আড়চোখে চেয়ে, মাথা হেলিয়ে বল্‌লে, "গুড বাই, আশা করি আবার দেখা হবে" ব'লে বুটের মচ্ মচ্ শব্দ করতে করতে সে চলে গেল। তার সহজ ব্যবহার, চাল-চলন, তার গলার আওয়াজ, সব যেন পীয়ারকে উত্যক্ত করে অপদস্থ করতে লাগল। বেশ তো—আর কিছুদিন সে অপেক্ষা করুক, তারপর—!

দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়। ফার্দিনান্দ হল্‌মকে পরাস্ত করবার চাইতে অন্য কাজ জুটল। লুইসের জামা-কাপড় তখনো তার ঘরে অস্পৃষ্ট অবস্থায় ঝুলচে, তার জুতো খাটের নীচে তেমনি রয়েচে; তার এখনো মনে হয়, একদিন নিশ্চয়ই দোর খুলে সে এসে ঘরে ঢুকবে। রাত্তিরে যখন সে একলাটি শোয়, তার মনে কেবলই প্রশ্ন ওঠে, "এখন সে কোথায়? কেন সে মারা গেল?—আর কি কখনো তার সঙ্গে দেখা হবে না? যেমনটি সে একদিন রোগীদের ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজিয়েছিল, এখনো সে তাকে তেমনিটিই দেখে, কিন্তু এখন তার শুভ্র বেশ; তার যে পাখা হয়েচে এটাও খুবই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তার সঙ্গীতও সে শোনে, সে সঙ্গীত তাকে যেন দোলায় শুইয়ে কেবলি দোল দিতে থাকে। এই সমস্ত মিলে একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জগৎ রচনা হলো, যেন রবিবারের শান্তিময় আত্মনিবেদনের পরম আশ্রয়। বিশ্বাস কিম্বা ধর্ম্মের কোনো ধার সে ধারল না, তবু এটি রইল। দিনের বেলা কাজের মাঝখানে কখনো কখনো যেন তার আর এক স্বতন্ত্র চেতনা জেগে ওঠে আর সে তারের ওপর বেহালার ছড়ের টানে যে সুর ফুটে ওঠে তা শুনতে পায়; বহুদূর থেকে অকূল-তরঙ্গের

মত সে সুর এসে তাকে সমন্বয়ের শান্তিতে ভরে দেয়, নিজের অজ্ঞাতে তখন সে হাসে।

তবু প্রায়ই গির্জ্জার অর্গ্যান-সঙ্গীতের বিপুল বিশাল তরঙ্গের মাঝে নিজের সত্তাকে ছাড়িয়ে দেবার একটা তৃষ্ণা তার মধ্যে জেগে ওঠে। কিন্তু যখন গির্জার দোরগোড়া দিয়ে সে যায়, তখন সে-চলার মাঝে একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে। হয়তো কোন সর্ব্বশক্তিময় ইচ্ছাই তার কাছ থেকে লুইসেকে কেড়ে নিয়েচে। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে তেমন ইচ্ছাকে ধন্যবাদ দিতে কিম্বা তার কাছে নত হতে সে চায় না। মনে মনে সে প্রতীক্ষা করবে একটা হিসাব-নিকাশের—অনন্তের মাঝখানে কার সঙ্গে তার যেন একটা বোঝাপড়া একদিন করতে হবে, আর সেদিন সে আপনাকে স্বাধীন—একেবারে স্বাধীন বলে জানতে চায়।

রবিবারের প্রভাতে যখন গির্জায় ঘণ্টা বাজা সুরু হয়, সে তাড়াতাড়ি বই নিয়ে বসে, বইয়ের মাঝেই যেন সে শান্তি খোঁজে। জ্ঞানের দ্বারা কি তার ওই প্রার্থনা-সঙ্গীতের সুরতৃষার নিবৃত্তি হতে পারে? যখন প্রথম সে কারখানায় কাজ আরম্ভ করল, তখন প্রায়ই সে অবাক চোখে কোনো না কোনো বিস্ময়কর ব্যাপারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত—আর আজ সে নিজে বিস্ময়কর ব্যাপার করবার শক্তি সংগ্রহ করচে। তাই সে পড়ে, কেবলি পড়ে, শিক্ষকের কাছ থেকে বই থেকে যা-কিছু পায় সবই পান করে চলে, আর নিজে নিজেই সব কথা ভাবে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ, নির্দ্দিষ্ট কাজ ভালই, কিন্তু পীয়ার সব সময়ই আরো সামনের দিকে দৃষ্টিকে চালনা করে; তার মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—কেবলই প্রশ্ন—সমস্যার পর নতুন নতুন সমস্যা—সব সময় সে এগিয়ে চলচে কেবলি সামনের দিকে, নতুনের দিকে, অজ্ঞাতের দিকে। পদার্থ বিদ্যায়, রসায়নে, গণিতে শুধু সে এক-পা এগিয়েচে মাত্র। কিন্তু সে জানে, তার সামনে আরো কত জগৎ

রয়েচে, আর তাকে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে সেদিকে। সেদিন কি আসবে—যেদিন পীয়ার এসবের শেষ প্রান্তে গিয়ে উপনীত হবে? জ্ঞান কি? মানুষ যা-কিছু শিখেচে, তার কি ব্যবহার সে করেচে? ওই যারা এত-কিছু জানত, সেই সব শিক্ষকদের দিকে তাকাও—তাদের জীবন কি আর সকলের চেয়ে মহত্তর, সমৃদ্ধতর, উজ্জ্বলতর হয়েছিল? বেশী অধ্যয়ন কি মানুষকে একদিন সেইখানে নিয়ে যেতে পারবে যেখানে কোন এক রাত্রিবেলা তার অঙ্গুলি সঙ্কেতে নক্ষত্রমণ্ডলী সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে? তবু যাই হোক, এগিয়ে চলতে হবে। কিন্তু তবু জ্ঞান কি রবিবারের প্রার্থনা-সঙ্গীতের ওই উচ্ছ্বসিত আনন্দ দিতে পারবে যাতে সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়, যা মানুষকে নামহীন আনন্দলোকে উধাও করে নিয়ে যায়, যাতে মানুষের অন্তরাত্মা অনন্ত আকাশের মত বিস্তৃতিলাভ করতে পারে? যাক্, সকালে সন্ধ্যায় কেবলি এগিয়ে যাওয়া আর এগিয়ে যাওয়া—সেইটেই সবার সেরা কাজ।

একদিন বসন্তকালে তখন নগরের ছায়াবীথির গাছে গাছে কলি ধরা সুরু হয়েছে মাত্র, ক্লাউস ব্রক আর ফার্দ্দিনান্দ হল্ম্ নর্থ ষ্ট্রীটের কাফেতে বসেছিল। ফার্দ্দিনান্দ বললে, "ওই তোমার বন্ধু যাচ্চে!" জান্‌লা দিয়ে দুজনেই দেখতে পেল, পীয়ার রাস্তার অপর পাশের পোষ্ট-আফিসের সামনে দিয়ে যাচ্চে। তার পোষাক ময়লা, জুতো অপরিষ্কার, সুন্দর মাথায় কলেজ-ক্যাপ দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে চলেচে, তবু যেন পথের সব কিছুই দেখতে দেখতে সে চলেছে।

ক্লাউস বল্‌ল, "ও কি ভাবতে ভাবতে চলেচে, তাই মনে করতে আমার আশ্চর্য্য লাগে।"

"দ্যাখো, আমার বোধ হচ্চে ওই রকমের গাড়ী সে আগে কখনো দেখে নি, গাড়োয়ানকে থামাতে যাচ্ছে নাকি হে—"

পাচ্ছে তাকে দেখে ফেলে সেই জন্ম ক্লাউস জান্‌লা থেকে সরে গিয়ে হেসে বল্‌ল, "যা সে জানতে চায় তা বা'র করবার জন্মে ওই চাকার তলায় সে গুড়ি মেরে ঢুকবে এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।"

ফার্দ্দিনান্দ চশমাটাকে ঠিক করে বসিয়ে বল্‌ল, "তাকে বড় ক্লান্ত, ম্লান দেখাচ্চে, বোধ করি তার আত্মীয়স্বজনের অবস্থা বিশেষ ভালো নয় ?"

ক্লাউস চোখ খুলে ফার্দ্দিনান্দের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "পকেটে টাকা ধরে না, এমন অবস্থা নয় বলেই তো মনে হয়।"

বিয়ার খেয়ে সিগারেট টানতে টানতে তারা আরো অনেক কথা বলাবলি করতে লাগল, শেষে হঠাৎ ফার্দ্দিনান্দ জিজ্ঞেস করল, "ভাল কথা—তোমার বন্ধুর মা-বাপ কি বেঁচে আছেন ?"

পীয়ারের পারিবারিক কথা বলবার কোনো রকম ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে সে সংক্ষেপে বল্‌ল, "আমার বোধ হয়, না।"

"আমার ভয় হচ্চে তোমায় কেবলি প্রশ্ন করে আমি উত্ত্যক্ত করে তুলেচি, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে ওই যুবকটিকে আমার কেমন মনে লেগেচে। তার মুখে যেন কি একটা—কি একটা রয়েচে যা মনকে বড় আকৃষ্ট করে—এমন কি তার ওই চলার ভঙ্গীটা পর্য্যন্ত—আগে যেন কোথায় আমি ঠিক এমনি ধারা কাকে চলতে দেখেচি! শুনতে পাই, সে নাকি ষ্টীম ইঞ্জিনের মতো কাজ করে!"

"কাজ করে! যে রকম ভাবে পিষচে, অল্পদিনেই ওর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হলো বলে! আমার বিশ্বাস, ও ভাবে যে বেশি জানতে পারলে, শেষে—হাঃ হাঃ হা—!"

"শেষে কি ?"

"কি আর! ভগবান্‌কে জানতে পারবে!"

ফার্দিনান্দ জান্‌লা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বল্‌ল, "খুবই অদ্ভুত বটে।"

"গত রবিবার পাহাড়ের ওপর হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা। জানো কি করছিল সেখানে? ভূ-তত্ত্ব অধ্যয়ন হচ্ছিল! কোথাও কোন বিষয় বক্তৃতা হচ্ছে—সে জ্যোতিষই হোক আর কোনো ফরাসী কবির বিষয়ই হোক—নির্ব্বিঘ্নে শপথ করে বলতে পারা যায়, পীয়ার সেখানে বসে 'নোট' নেবে। ওরকম লোকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলে না। হঠাৎ কোনো একটা নতুন নাম—ধর না য়্যারিষ্টটল—তার চোখে পড়ল। ব্যস্‌, নতুন কিছু তো! অমনি চল্‌ল রাতের পর রাত জাগা আর গ্রীক অনুবাদ দিয়ে মাথাটিকে ভরতি করা। যে-লোক ওই ধরণে চলে তার সঙ্গে পা ফেলে চলা কি করে পারা যায়? যা হোক, একটি বিষয় কিন্তু সে কিচ্ছু জানে না।"

"সে কি?"

"সুরা আর নারী—আর সাধারণ ভাবে ধরতে গেলে আমোদ-প্রমোদ। মাইরি বলচি, সে আর যাই হোক তরুণ নয়!"

কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাসের ভঙ্গীতে ফার্দিনান্দ বল্‌ল, "বোধ করি ওসব করবার অবস্থাই তার নয়।"

তারা দুজন আরো কিছুক্ষণ বসে রইল; ক্লাউস যেই একটু অসতর্ক হয়, ফার্দিনান্দ ফাঁকে ফাঁকে পীয়ারের সম্বন্ধে এক একটি ছোট্ট প্রশ্ন করে বসে। দ্বিতীয় গ্লাস যখন শেষ হচ্চে ততক্ষণে ক্লাউস বলে ফেলেচে যে "লোকে বলে পীয়ারের মা কি বলে—বিশেষ সুবিধার লোক ছিলেন না।"

ফার্দিনান্দ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তার বাবার কথা কিছু জানো?"

শুনে অস্বস্তিতে ক্লাউসের মুখ লাল হয়ে উঠল, বাধো-বাধো গলায়

বল্‌ল "কেউ সে কথা জানে না; সত্যি বলচি আমি জানলে তোমায় বলতাম নিশ্চয়। কে যে তার বাবা কেউ তা জানে না। খুব সম্ভব তার বাবা আমেরিকায়।"

ফার্দ্দিনান্দ হেসে বলল, "আমি দেখচি, তার পারিবারিক কথা আরম্ভ হলেই তুমি ভয়ানক চেপে যাও।" কিন্তু ক্লাউসের মনে হল যেন তার সঙ্গীটির মুখখানি ম্লান হয়ে উঠেচে।

কয়েকদিন পরে পীয়ার যখন তার আস্তাবলের ওপরের ঘরে একলাটি বসে আছে, সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হল আর তার পরেই দোর খুলে ফার্দ্দিনান্দ হল্‌ম্‌ প্রবেশ করল।

পীয়ার অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল, চেয়ারের পেছনটা ধরে নিজেকে যেন সামলাতে লাগল। যদি সেই হামবড়া স্কুলমাষ্টারের কাছ থেকে এসে থাকে, কিম্বা ধর, তার নামটা কেড়ে নিতে এসে থাকে তা হলে একটি ধাক্কা সিঁড়ি থেকে,—বাস্‌!

দর্শকটি হ্যাটটা রেখে একটা আসন দখল করে বল্‌ল, "ভাবলাম আপনি কোথায় থাকেন একবার দেখে যাই, আপনাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আক্রমণ করেচি দেখচি, আপনাকে বিরক্ত করে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।"

"ও, তাই নাকি?" বলে পীয়ার যতটা দূরে বসা সম্ভব তত দূরে বসল।

"সামান্য যে কয়েকবার আমাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয়েচে, আমি দেখেচি আপনি আমায় পছন্দ করেন না। কিন্তু দেখুন ওটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না।"

হাসবে কি না কিছুই স্থির করতে না পেরে পীয়ার বললে, "আপনার বলবার উদ্দেশ্য?"

"কিছুই না, আমি আপনার বন্ধু হতে চাই এইমাত্র। আমি আপনার সম্বন্ধে যতটুকু জানি হয়ত আপনি আমার সম্বন্ধে তার ঢের বেশী জানেন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আ—চ্ছা, আপনি কি সব সময়ই অমনি টেবিলে আঙুল ঠক্‌ঠক্ করেন নাকি? হা—হা—হা! বাঃ, এ যে আমার বাবারও অভ্যাস ছিল!"

পীয়ার ফার্দ্দিনান্দের দিকে নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইল, কিন্তু আঙুল নাড়া তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

"দেখুন, আপনি যেভাবে জীবন যাপন করচেন তাতে আমার হিংসা হয়। আপনি যখন লক্ষপতি হবেন তখন ওই লক্ষ মুদ্রার মূল্য হবে ঢের বেশী আর তার পর আমাদের চাইতে আপনি জীবন সম্বন্ধে ঢের বেশি জানেন। সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের ভেতরে "শিক্ষা" আর "পাঠ" আর কি-কি সব কলের মত পুরে দেওয়া হয়েছে; সেজন্যে আমাদের চাইতে আপনার কাছে বই-পড়া জ্ঞানেরও আধ্যাত্মিক মূল্য ঢের বেশি। আপনি তো ইঞ্জিনিয়ারিংএর জন্য তৈরী হচ্চেন, না?"

পীয়ার বললে, "হ্যাঁ," কিন্তু তার মুখের ভাব স্পষ্টই বল্‌ল, "তাতে তোমার কি?"

"ভালো, আমার মনে হয়, এই যে আধুনিক যন্ত্রবিদ্ ইনি একরকমের ধর্ম্মযাজক—না, হয়ত তাঁকে সেই প্রাচীন প্রমিথিউসের উত্তরাধিকারী বলাই উচিত। সেটাও খুব গৌরবের আভিজাত্য, নয় কি? আচ্ছা, আপনার কি কখনো মনে হয়েচে যে প্রকৃতির ওপর মানবাত্মার প্রত্যেক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা তাঁদের সর্ব্বশক্তিমত্তা অল্প অল্প করে হারাচ্চেন? আমার সব সময় মনে হয়, যেন আমরা আগুন, ইস্পাত, যান্ত্রিক শক্তি আর মানব-চিন্তাকে বিধাতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রের মত ব্যবহার করচি। একদিন আসবে, যেদিন আমাদের

প্রার্থনা করবার কোনো প্রয়োজন থাকবে না। সেই মুহূর্ত্ত আসবে, যখন স্বর্গীয় শাসকেরা সন্ধি করতে বাধ্য হবেন, আর আমাদের কাছে তখন তাঁদের হাঁটু গাড়বার পালা আসবে। আপনি কি মনে করেন? আমার তো মনে হচ্চে যে **জিহোবা** ইঞ্জিনীয়ারদের পছন্দ করেন না।"

পীয়ার সংক্ষেপে উত্তর দিলে, "শোনায় বেশ।" কিন্তু মনে মনে সে স্বীকার করল যে, তার নিজের মনে যা প্রকাশের জন্য সংগ্রাম করছিল ফার্দ্দিনান্দ তাকেই ভাষায় ব্যক্ত করেচে।

ফার্দ্দিনান্দ বলতে লাগল. "আপাততঃ আমাদের দুজনকেই ছোট ছোট বিষয় নিয়েই তৃপ্ত হতে হবে, তা ঠিক। আর এ স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে, একটুখানি রাস্তা, এক টুকরো রেলওয়ে তৈরী করা, একটা খাল কিম্বা কিছুর ওপর একটা পুল বানানো—এসব আমার খুব ভালো লাগে না। কিন্তু যদি বাইরের বিস্তৃত জগতে বেরিয়ে পড়া যায়, তা হলে পরে যথেষ্ট করবার মত কাজ পাওয়া যাবে—যাতে আমাদের ভেতরে যদি সত্যি কিছু থাকে তাকে বিকশিত করে তোলবার প্রচুর অবসর পাওয়া যাবে। যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে নানা জাতিকে জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপনা করেচে, এবং যেখানে গিয়েচে সেইখানেই জাতিকে সংগঠিত করেচে, সভ্য করেচে, আমি সেই সব মস্ত সৈনিকদের হিংসা করতাম। কিন্তু আমাদের কালে, একবার জগতে বেরিয়ে পড়তে পারলে ইঞ্জিনীয়াররাও মস্ত মস্ত কাজ পেতে পারে—হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী জলাভূমিকে শুকিয়ে দিতে পারে, নীল নদীকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, দুটো মহাসমুদ্রকে সংযুক্ত করে দিতে পারে। একদিন আমি ওই রকমের কাজ হাতে নেবো। যেই এখানকার কাজ আমার শেষ, অমনি এখান থেকে উধাও হয়ে যাব!

তারপর ভবিষ্যতে যে-সব ইঞ্জিনীয়ার আসবেন, ধরুন দুশো বছর কি অমনি, তাদের' পরে তারায় তারায় ভ্রমণের পথ নির্ম্মাণ করবার ভার রইল। সিগার খাই তো কোনো আপত্তি নেই আপনার ?”

“না, খান্, কিন্তু বড় দুঃখিত, যে আমার কাছে—”

“তা হোক্, ধন্যবাদ আপনাকে, আমার কাছে আছে।” বলে ফার্দিনান্দ সিগার-কেস্‌টা বার করে পীয়ারকে নিতে বল্‌ল। পীয়ার অসম্মত হলে, ফার্দিনান্দ নিজে একটা সিগার ধরাল।

“দেখুন, আমার সঙ্গে চলুন না, কোথাও গিয়ে ডিনার খাওয়া যাক্ ?”

দর্শকের দিকে পীয়ার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, এসবের মতলবটা কি ?

“সাধারণতঃ আমি একটি পাকা স্পার্টান, কিন্তু সম্প্রতি তারা বাবার ষ্টেটটার ভাগাভাগি শেষ করেচে তাই বর্ত্তমানে পকেটে কিছু টাকা আছে। সুতরাং একটা ছোটখাটো ডিনারে একটু আমোদ করবো না কেন ? কাপড় ছাড়তে চান তো, আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্চি—তবে আপনার ইচ্ছে হয় তো অমনি আসুন।”

পীয়ার আরো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়তে লাগল। এসবের পশ্চাতে কি কোনো ব্যাপার আছে ? না, এই ছোকরাই বাস্তবিক আশ্চর্য্য রকমের ভালো ? শেষে এসব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দিয়ে সে কলারটা বদলে তার ভালো পোষাক পরে চলল !

তুষারশুভ্র টেবিল ক্লথ দিয়ে ঢাকা ছোট ছোট টেবিল, ফুলদানিতে ফুল, ভাঁজকরা ন্যাপকিন, কাচপাত্র আর মদের গ্লাসে সাজানো প্রথম শ্রেণীর রেস্তরাঁয় এই তার জীবনে সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ। ফার্দিনান্দ সহজ স্বচ্ছন্দভাবে তার সাথীকে বন্ধুর মত আদর-অপ্যায়ন করতে লাগল। খাওয়ার সময় বেশির ভাগ আলোচনা করল সে পীয়ারের বাল্যজীবন নিয়ে।

কফি, সিগার খাওয়ার সময় যখন হলো, ফার্দিনান্দ টেবিলের ওপর দিয়ে তার পানে ঝুঁকে বল্‌ল "দেখুন, আমাদের পরস্পরকে তুমি বলাটা আপনার উচিত মনে হয় না ?"

এবার পীয়ার বাস্তবিক অন্তরের সঙ্গে বলে' উঠলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"জানো তো ভাই, আমরা দুজনেই হলুম্।"

"হ্যাঁ, তা বটে।"

"আর তারপর কে জানে আমাদের মাঝে হয়তো কোন সম্পর্ক থাকতেও পারে। আরে, অমন ক'রে তাকিও না ভাই! আমায় তুমি বন্ধু বলে' মনে কর, আর আমার দ্বারা যা করা সম্ভব তা আমায় করতে বল, আমি শুধু এইটুকুই চাই। অন্য কেউ সঙ্গে থাকলে অবশ্য আমাদের একজনের টাকায় আর একজনের খাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু ক্লাউস-ব্রককে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে, কি বল ?"

পীয়ারের প্রবল ইচ্ছা হলো ছুটে পালাবার। ও কি তা হলে সব জানে নাকি ? যদি তাই হয়, তা হলে সে সোজাসুজি বলে ফেলে না কেন ?

বসন্ত সন্ধ্যার স্পষ্ট আলোকে যখন দুজনে তারা বাড়ী ফিরল, ফার্দিনান্দ তার সঙ্গীর হাত ধরে বলল, "তুমি শুনেচে কিনা জানি না, বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই। কিন্তু তোমায় যেদিন আমি প্রথম দেখেছি তখনই আমার মনে হয়েচে যে, আমরা পরস্পরের আপনার। সত্যি বলতে কি তোমায় দেখে কি জানি কেন বড় বেশি বাবার কথা মনে পড়েছিল। আর ছাখো, তিনি প্রেমিক প্রকৃতির ভদ্রলোক ছিলেন।—"

পীয়ার চুপ করে রইল, ব্যাপারটা আর এগুলো না সেদিন।

কিন্তু এর পরের কদিন পীয়ারের বড় উদ্বেগে কাটল। ফার্দিনান্দ

যে কতটা জানে পীয়ার তা ঠিক বুঝতে পারে না, আর প্রাণ থাকতে সে নিজের কোনো কথাই তাকে বলতে চায় না। ফার্দিনান্দও কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করে না, শুধু যেন তারা কত বছরের বন্ধু, এমনি ভাবে পয়লা-নম্বর সাথীর মত সে ব্যবহার করে। পীয়ারের বাল্যজীবন সম্বন্ধেও সে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না, আর নিজের পরিবারের উল্লেখও কখনো করে না! পীয়ার সব সময় নিজেকে সতর্ক করে রাখে, কিন্তু তবু যখনই তাদের দেখা হয় খুসী না হয়ে পারে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ফার্দিনান্দের বাসায় ক্লাউসের সঙ্গে তার পানোৎসবে নিমন্ত্রণ হলো। ফার্দিনান্দের কামরা বেশ সুসজ্জিত, দেয়ালে ছবি আর তার বাপ-মার ফটোগ্রাফ। সেখানে সৈনিক বেশে তার বাবার যুবাবয়সের ফটোগ্রাফও ছিল ; আর একটি ছিল তার ঠাকুরদার, তিনি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জজ্। ফার্দিনান্দ মৃদু হেসে বল্‌ল, "আমার আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ তোমার গুণেরই পরিচয়।"

ক্লাউসব্রক এর দিক থেকে ওর দিকে তাকায় আর ওদের মাঝে পরিচয়টা কতদূর গড়িয়েচে তাই বিস্মিত মনে ভাবে।

গ্রীষ্মাবকাশ ঘুরে এলো, ছাত্রেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ক্লাউসের বাড়ী যাবার কথা। একদিন ফার্দিনান্দ পীয়ারের ওখানে এসে বল্‌ল, "ছাখো হে, আমার পরে একটু কৃপা করতে হবে তোমায়। এই গরমে আমি সমুদ্র-তীরে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু আমার পাহাড়ের দিকে যাবারও সুযোগ আছে। তা বলে এক সঙ্গে তো দু'জায়গায় আর যেতে পাচ্চিনে, আমার হয়ে একটা জায়গা তুমি নিতে পার না? অবশ্য খরচ আমার।"

পীয়ার হেসে বল্‌ল, "না, ধন্যবাদ।" কিন্তু যাবার ঠিক আগে ক্লাউসব্রক যখন বল্‌ল, "দ্যাখো পীয়ার, আমরা দুজনে মিলে যদি লুইসের কবরের ওপর একখানা মার্বেল পাথর বসাই তো কেমন হয়?"

পীয়ার অন্তরের আবেগে ক্লাউসের কাঁধ চাপড়ে বলল, "ক্লাউস কি বলবো তোমায়, তুমি যে কত ভালো!"

তার পর গরমের ছুটিতে পীয়ার একলা পদব্রজে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। যখনই সে সুযোগ পায়, কোনো খামারে গিয়ে বলে "খামারের একখানি ভালো ম্যাপ চাই কি আপনার। যতক্ষণ কাজ করবো ততক্ষণ আমায় থাকতে দিতে হবে আর দশ ক্রাউন পারিশ্রমিক।" এমন ক'রে ছুটিটা তার বেশ ভালোই গেল, আর যখন সে ফিরে এলো তখন উপরি কিছু টাকাও এলো পকেটে।

স্কুলে দ্বিতীয় বৎসর অনেকটা প্রথম বৎসরেরই মত কাটল। একমনে সে তার কাজ ক'রে চলে। কখনো তার দুই বন্ধু আসে, সন্ধ্যে বেলা একটু আমোদ প্রমোদ করতে টেনে নিয়ে যায়। নিদ্রিত নগরের মাঝদিয়ে গেয়ে চীৎকার ক'রে হৈ-চৈ ক'রে যখন শেষে সে অন্ধকারে একলাটি শুয়ে পড়ে, তখন তার অন্তরাত্মার সঙ্গে মুখোমুখি তার একটা স্বতন্ত্র জীবন সুরু হয়। কোথায় চলেচ, পীয়ার? তোমার এই সমস্ত পরিশ্রমের লক্ষ্য কি? যেন সে সান্ধ্য-প্রার্থনা করছে এমনি বিনম্র-চিত্তে সে উত্তর দেবার চেষ্টা করে; কোথায়? কেন, আমি তো মস্ত ইঞ্জিনীয়ার হতে যাচ্চি। আচ্ছা, তার পর? প্রমিথিউসের সন্ততিবর্গ —যারা বিধাতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালনা করচে, আমিও তাদের একজন হব। আচ্ছা, তার পর? আমি সেই সোপান তৈরী করতে সাহায্য করব—যা বেয়ে মানুষেরা উর্দ্ধে—আরো উর্দ্ধে, আলোকের দিকে, আত্মার দিকে প্রকৃতি-বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে

যাবে। তারপর? তারা সুখে থাকবে, বিবাহ করবে, ছেলোপলে হবে, সুন্দর ঐশ্বর্য্যময় গৃহে বাস করবে। তারপর? ও, তা একদিন তো বার্দ্ধক্য আসবেই, মৃত্যু হবেই। তার পর? তার পর? বল, তার পর?

সে স্বপ্ন-জগতে লুইসে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গীতের অরুণ-তরঙ্গে তাকে দোলা দিয়ে কেবলি বাজিয়ে চলেচে, সেই জগতের আশ্রয় নিয়ে, এমনি সব সময় পীয়ার একটা অস্পষ্ট সান্ত্বনা পায়। কিন্তু এইখানেই যেন সে সব চাইতে বেশি ক'রে আরো—কিসের তৃষ্ণা অনুভব করে!

ফার্দ্দিনান্দ তার কলেজের পড়া শেষ ক'রে তার কথা-মত বৃহৎ-জগতে বেরিয়ে গেল, তার সঙ্গে গেল ক্লাউস তাই সারাটা তৃতীয় বছর পীয়ারকে বেশির ভাগ সময় একলা দেখা যায়; সব সময় বই বগলে ক'রে মাথা নীচু ক'রে সে চলে।

ঠিক তার শেষ পরীক্ষার জন্যে সে যখন তৈরী হচ্চে, এমনি সময় ফার্দ্দিনান্দের এক পত্র এল মিশর থেকে। তাতে লেখা, "ওহে তরুণ, এখানে চলে এসো! আমরা এতদিনে লণ্ডনের ব্রাউন ব্রাদার্স ব'লে এক মস্ত ব্রিটিশ ফার্ম্ম থেকে ভাল কাজ পেয়েচি—এই ফার্ম্ম কানাডায় রেলওয়ে, ভারতবর্ষে পুল, আর্জ্জেন্টিনায় বন্দর, এখানে মিশরে খাল আর বাঁধ তৈরী করচে। আমরা তোমার জন্যে সূত্রপাত হিসেবে ড্রাফ্‌টস-ম্যানের একটি ছোট পোষ্ট জোগাড় করতে পারি। তোমার আসার খরচ পাঠালাম, চলে এসো।"

পীয়ার কিন্তু তখনি গেল না। কলেজে সে মেকানিক্সের অধ্যাপক হ'য়ে আরো এক বছর থেকে তার সৎভাইয়ের মত রাস্তা আর রেলওয়ে নির্ম্মাণের বিষয় পড়তে লাগল। এই বিষয়েও সে কারু

পিছনে পড়ে থাকবে না এমনি একটা গোপন প্রবৃত্তি তাকে চালনা করছিল।

যতই বছর কাটতে লাগল, তার সাথীদের পত্রে ততই লোভনীয় আর জরুরী তাগিদ আসতে লাগল। ক্লাউস লিখল, "এইখানে ইঞ্জিনীয়ার হচ্চে একজন মিশনারী, জিহোবাকে ঘোষণা করবার জন্যে নয় কিন্তু ইউরোপের শক্তি এবং সাধনাকে প্রচার করবার জন্যে, ভায়া তোমাকেও এতে সাহায্য করতেই হবে। এইখানে একজন মস্ত জেনারেলের কাজ তোমার প্রতীক্ষা করচে।

শেষে, এক হেমন্ত দিনে, নগরের চতুপার্শ্বে যখন বনানী হরিৎ হ'য়ে উঠছে, পীয়ার তার মস্ত নতুন ট্রাভেলিং ট্রাঙ্কটা গাড়োয়ানের জায়গায় বেঁধে বাসা থেকে রওনা হল। যাত্রার পূর্ব্বে লুইসের কবরের জন্য ছোট একগুচ্ছ ফুল নিয়ে গির্জ্জাপ্রাঙ্গণ অবধি গেল! কে বলতে পারে আবার কখনো সে ওই সমাধিস্থান দেখতে পাবে কি না!

ষ্টেশনে এসে পীয়ার মুহূর্ত্তকাল ফিরে তাকালো সেই পুরানো সহরটির পানে—ওই সেই গির্জ্জা আর সেই প্রাচীন দুর্গ—যেখানে শান্ত্রী পাইচারী দিচ্চে আকাশের পটভূমির ওপর। এই কি তার যৌবনের সমাপ্তি হলো? লুইসে—আস্তাবলের ওপরের ঘর—হাসপাতাল—ক্ষতগ্রস্তের হাসপাতাল—কলেজ তার পর ওই সেই ফিয়োর্ড, এই সমুদ্রের তটেই কোথাও অনেক দূরে নিশ্চয়ই একখানি ছোট ধূসর জেলে-কুটীর রয়েচে, তাদের কাছে বিদায় উপহার স্বরূপ যে-তামাক আর কফির পার্শেল পাঠানো হয়েচে, হয়ত ঠিক এই সময় বসন্ত-চিহ্নিত গৃহিণী আর তার কুশপেয়ে ভালমানুষটি তা পেয়েচে।

পীয়ার যাত্রা করল রাজধানীর দিকে, তার পর সেখান থেকে বিশাল জগতের মাঝে।

# দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েক বছর বেশ কতকগুলো বছর কেটে গেল, আবার গ্রীষ্ম এলো, জুন মাস এলো। সেদিন সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রটা এমনি শান্ত আর অচঞ্চল, মনে হচ্ছিল যেন ধূসর আর গোলাপীরঙের আকাশটাকে প্রতিবিম্বিত করে একখানি বিশাল দর্পণ মেলিয়ে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে একখানি প্যাসেঞ্জার ষ্টীমার য়্যাণ্ট্‌য়ার্প থেকে ক্রিষ্টিয়ানিয়ার দিকে পথ কেটে চলেছে। ষ্টীমারে অনেক যাত্রী, কিন্তু কারু শুতে যাবার প্রবৃত্তি নেই, ডেকের ওপরটা বড় সুন্দর, হাওয়াটি আতপ্ত। প্যারিস কিম্বা মুানিক থেকে ঘরফেরতা কতকগুলি কলাশিল্পী সময় কাটাবার জন্য আমোদ খুঁজতে লাগল; কেউ বা সুরার ফরমায়েস দিলে, অন্যেরা খুঁজে পেতে একটি কনসার্টিনা বার করলে; তারপর অনতিকালের মধ্যেই, কেউ জানতে পারলে না কি ক'রে পুরো দমে নাচ সুরু হয়ে গেল। দু-একটি সাবধানী মা তাঁদের মেয়েদের বলতে লাগলেন "না, মাইডিয়ার হতে পারে না।" কিন্তু বেশিক্ষণ গেল না, মায়েরাও নাচতে সুরু করলেন। চশমা পরা ডাক্তার একটা পিপার ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন; অল্পক্ষণের মধ্যেই আর্টিস্ট দুজন এক সাদা-দাড়ি কাপ্তেনকে চেয়ারে বসিয়ে ডেকময় ঘোরাতে লাগল। রাত্রিটা এমনি স্বচ্ছ, অরুণ আকাশ এত সুন্দর হাওয়াটি এত কোমল যে, এই উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে সকলেরি প্রাণ আনন্দে হাল্‌কা হয়ে উঠল।

চিত্রকর ষ্টোরাকের তার ভাস্কর বন্ধু প্রোসকে জিজ্ঞেস করলে, "ওই,

কাষ্ঠমূর্ত্তি ভিখিরীটা কে হে, একটু আমোদ-স্ফূর্তি থেকে সরে রয়েচে একটা মস্ত কেউ কেটার মতো ?”

“ওই লোকটা ? ডিনারে যখন আমাদের মিশরীয় পাত্র নিয়ে কথা হচ্চিল, তখন যিনি এসে বিকটভাবে মাষ্টারী সুরু করেছিলেন—ইনি সেই লোক।”

“মাইরি, ঠিক বলেচে। আমার বোধ হয় ইনি ভ্রাম্যমান ইস্কুল-মাষ্টার মশায়। যখন আমরা গ্রীক ভাস্কর্য্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখনও আবার দয়া করে আমাদের ভুল সংশোধন করতে সুরু করেছিলেন।

“সকালে শুনলাম ডাক্তারের সঙ্গে এসিরীয় প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা হচ্চে। ইনি নাচবেন না এতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?”

যে লোকটির কথা এরা বলছিল সেই লোকটি মাঝারি গড়নের, বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মাঝে বলে বোধ হয়; একটু দূরেই ডেক চেয়ারে শুয়ে। মাথার টুপি থেকে সুরু করে খাকী জুতোর ওপর তক্ আগা-গোড়া ছাই-রঙের পোষাক ঢাকা। মুখের রঙ ফ্যাকাশে কটা; ছোট কটা দাড়ি পাকা সুরু হয়েচে। দৃষ্টি তার নর্ত্তকদের অনুসরণ করছিল আর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। এই পীয়ার হল্‌ম্।

বসে বসে সে দেখছিল আর সে যে আর সবাইকার মত আপনাকে ছেড়ে দিতে পারে না তাই ভেবে নিজের ওপর বিরক্ত হচ্ছিল। কিন্তু কত দীর্ঘকাল সে নিজের দেশবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করেনি তাই এখন তার মনে কেমন একটা অনিশ্চয়তার দ্বিধা জাগতে লাগল, আর তাদের মাঝে বসে নিজেকে প্রায় বিদেশীর মতই মনে হতে লাগল। আর অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নরওয়ের উপকূলে শিলা দ্বীপগুলো দেখা দেবে এই চিন্তা তার মনে এক অদ্ভুত উত্তেজনার সৃষ্টি করতে

লাগল; বাইরের বিশাল জগতের মাঝখানে সে এই মুহূর্ত্তটির স্বপ্ন দেখেছে কতবার!

কিছুক্ষণ পরে তার চারদিকে ডেকে নিঃশব্দতা নেমে এলো, সেও নীচে নেমে গেল কিন্তু কেবিনে কাপড় না ছেড়েই সে শুয়ে পড়ল। তার মনে পড়তে লাগল সেই সময়কার কথা, যখন নির্ধন অজ্ঞাত অবস্থায় সে এই পথ দিয়েই বাইরের জগতে যাত্রা করেছিল, আর তার চোখের সুমুখ থেকে তার স্বদেশের শেষ দ্বীপের চিহ্নটুকুও সমূদ্র বলয়ের নীচে মিলিয়ে গিয়েছিল। তারপর কত ঘটনা ঘটেচে। এখন যে শেষকালে সে বাড়ী ফিরচে সেখানে তার জন্যে কোন্ জীবন প্রতীক্ষা করচে?

সকালের দিকে ছুটোর অল্প পরে সে আবার ডেকে এলো, ষ্টীমারখানা তখন ঘন কুয়াসার মাঝ দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে চলেচে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইলো। অধীর ভাবে ডেকে পাইচারি দিতে দিতে ভাবলে "দূত্তোর!" তার মনে হলো যেন তার পরম মুহূর্ত্তটি হারিয়ে যাচ্চে, নষ্ট হয়ে যাচ্চে। কিন্তু হঠাৎ সে রেলিংএর ধারে থেমে গিয়ে পূবের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

ওই যেন কি দেখা গেল না? বহুদূরে অস্পষ্ট কুহেলিকার গভীরতা ভেদ করে একটি উজ্জ্বল চিহ্ন দেখা দিল; ধূসরতার পুঞ্জ সজীব সচল হয়ে উঠল, আর লাল রঙে রঙিয়ে উঠে পাতলা হয়ে যেতে লাগল, যেন অগ্নি-শিখার লহর বয়ে চলেচে। আঃ. এখন সে বুঝতে পেরচে! এই তো সূর্য্যগোলক সমুদ্রের মাঝ থেকে উঠচে। জাহাজের ওপর যেখানে যেখানে রাত্রির শিশির সঞ্চিত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটি বিন্দু সোনার মত জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল। নিমেষে নিমেষে চারদিক সুস্পষ্ট এবং সুপ্রকাশ হয়ে উঠতে লাগল, দৃষ্টির প্রাসারও বাড়তে লাগল। কি হচ্চে

তা স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করবার পূর্ব্বেই, ধূসর অন্ধকাররাশি পাহাড়ের আকারে পুঞ্জীভূত হয়ে ভাসতে ভাসতে ঊর্দ্ধে উধাও হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর সব সুপ্রকাশ—উজ্জ্বল নবীন প্রভাত, নীল সমুদ্রের ওপর স্বচ্ছ সূর্য্যালোকিত আকাশ!

এখন দূরবীণ বার করবার সময় হলো; বহুক্ষণ দূরবীণের ভেতর দিয়ে তন্ময় দৃষ্টি মেলে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওই! একি তার কল্পনামাত্র? না, অনেক দূরে, সামনে, আকাশ আর সাগরের মাঝখানে সে স্পষ্ট একটা কালো রেখা দেখতে পাচ্চে। এই প্রথম শিলাদ্বীপ। যাক্ এই তো নরওয়ে!

হঠাৎ পীয়ারের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে মনে হলো; দাঁড়াতে পাচ্ছিল না সে, তবু পাইচারি দিতে দিতে বার বার থেমে সে ওই সুদূর ধূসর রেখাটির পানে তাকাতে লাগল। দ্রুত পক্ষচালনা করতে করতে লম্বা-গলা সমুদ্র-পাখীরাও দেখা দিলে! তারা যেন স্বাগত সম্ভাষণ জানায়!

শিলাদ্বীপগুলোর মাঝ দিয়ে ষ্টীমারখানি রেখা টেনে চললো; চারদিকে ছোট ছোট শিলাস্তূপ আর দ্বীপের একটা জগৎ প্রকাশ পেল। ওই সর্ব্ব প্রথম লাল জেলে-কুটীর, তারপর ওই ক্রিষ্টীয়ানসাণ্ডের প্রবেশপথ, তার দুপাশে কত বনাকীর্ণ পাহাড়, কত দ্বীপ; সেখানে সাদা সাদা কুটীরগুলো, সামনে সবুজ ঘাসের জমি আর পতাকা-দণ্ড নিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

পীয়ার সব দেখতে লাগল, ক্ষুধার্ত্তের মত সব সে পান করতে লাগল। কি সুন্দর রসাস্বাদ, তার মনে হলো যেন ক্ষুধা তার মিটবে না বহুক্ষণ ধরে পান করলেও!

তারপর রৌদ্রোদ্ভাসিত দিবস আর জ্যোতির্ম্ময়ী রাত্রির মাঝ দিয়ে জাহাজখানা সমুদ্র-তট বেয়ে চলল। নীল জল-প্রণালীর ওপর উড়ন্ত সাদা

সমুদ্র-চিলের দলগুলো, সমুদ্র তীরের ছোট ছোট সহরের বাতায়নে ফুল লাগানো সাদারঙের লম্বা লম্বা কাঠের বাড়ীগুলো, পীয়ার দেখতে লাগল। এর আগে সে কখনো এদিক দিয়ে যায় নি, তবু কে-যেন তার মাঝে মাথা নেড়ে বলতে থাকে, "আবার এইখানে ফিরে আসা গেল।" ক্রিষ্টিয়ানিয়া ফিয়র্ডের সারাটা পথ পাতার গন্ধ, প্রান্তরের গন্ধ ভেসে আসতে লাগল; সমুদ্রের তীরে তীরে সূর্য্যালোক উজ্জল কত খামার-বাড়ী দেখা যেতে লাগল। ওই তো যেন একটা বেশ বড রকমের খামার বাড়ী না? পীয়ার আবার মাথা নাড়ল। তার কাছে সবই যেন লক্ষ্মীশ্রী-মাখা, আর আপন ঘরের মতই প্রিয় মনে হতে লাগল, যদিচ এও সে বুঝছিল যে, মোটের ওপর সে তার নিজের দেশেও একজন বিদেশী ভ্রমণকারী ছাড়া বিশেষ কিছুই নয়। কেউ তো তার জন্য প্রতীক্ষা করচে না, তাকে ঘরে ডেকে নেবার কেউ তো নেই! তবু, একদিন হয়ত এ অবস্থার মাঝে পরিবর্ত্তন হতেও পারে।

ক্রিষ্টিয়ানিয়ায় জেটির পাশে গিয়ে যখন জাহাজখানা ভিড়লো, অন্য যাত্রীরা রেলিং ধরে সারি বেঁধে দাঁড়াল, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজন ডেকে এসে উঠতে লাগল, তারপর অশ্রু, হাসি, চুম্বন-আলিঙ্গন। জেটিতে নামবার সময় পীয়ার হ্যাট্‌টা মাথা থেকে উঠিয়ে নিল (অভিবাদন জানাবার উদ্দেশ্যে) কিন্তু ঠিক তখন তার দিকে চাইবার অবসর কারু ছিল না। একটা হোটেল-কুলির কাছে তার 'লগেজ' দিয়ে পীয়ার একা বিদেশীর মত সহরের মাঝ দিয়ে চল্‌তে লাগল।

নরওয়ের আলোকময়ী রাত্রিতে ঘুমানো তার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠলো। সে বাস্তবিক ভুলেই গিয়েছিল যে এখানে সারারাতই আলো থাকে। সহরটা একটা রাজধানী, অথচ পীয়ারের কাছে এ এতই ছোট্ট যে যেখানেই সে যায় তার মনে হয় যেন কয়েক পা মাত্র সে এসেচে।

এই তো তার আপন দেশের লোকেরা, তবু সে কিন্তু কাউকেই জানে না; তাকে অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই। আবার পীয়ার ভাবে একদিন এ সমস্তই অন্য রকম দাঁড়াতে পারে।

শেষে, একদিন একটা বইয়ের দোকানের জান্‌লার দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় পিছন থেকে শুনতে পেল, "একি, পীয়ার হল্‌ম্ নিশ্চয়ই ?" টেক্‌নিক্যাল কলেজের সহপাঠী রাইডার লাংবের্গ, সেই আগের মতই ক্ষীণকায় আর ফ্যাকাসে। তখন কলেজে সে ছিল একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—আর এখন—এখন তার চেহারা ময়লা, জীর্ণ আর বার্দ্ধক্যগ্রস্ত।

পীয়ার তার হাতটা চেপে ধরে বল্‌ল, "তোমায় চিনতেই পারছিলাম না।"

"আর তুমি ত এখন লক্ষপতি শুনতে পাই, আর বিশাল জগতে খ্যাতিও হয়েচে !"

"না হে না, অত শোচনীয় নয়। কিন্তু তোমার কি খবর ?"

"আমার ? ওঃ আমার কথা আর বলো না।"

তারপর রাস্তা দিয়ে একসঙ্গে যেতে যেতে লাংবের্গ তার কাহিনী বলতে লাগল, দিনকাল কি ভয়ানক খারাপ চলেছে, আর দেশের অবস্থা কেমন করে মানুষকে একরকম গলা টিপে মারছে তা বল্‌ল। ষ্টেট-রেলওয়ে আপিসে দশবারো বছর আগে সে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান হয়ে ঢুকেছিল আর এখনো সে সেইখানেই রয়েচে—এদিকে পরিবারটি বেড়েই চলেচে—আর, "ভাইহে, এই তো মাইনে, এই তো মাইনে !" বলে চোখ তুলে হতাশভাবে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল।

বাধা দিয়ে পীয়ার বল্‌লে "ছাখো, ক্রিষ্টিয়ানিয়ার সন্ধ্যেবেলাটা ভালোভাবে কাটাবার জায়গা কোথায়, বলতে পার ?

"এই ধর, সেণ্ট হ্যান্স্ হিল্, সেখানে গান-বাজনাও হয়।"

"বেশ, আজ তাহলে রাত্তিরে সেইখানে তোমার আমার সঙ্গে ভোজনের নিমন্ত্রণ, আস্তে পারবে তো? এই ধর আটটা?"

"ধন্যবাদ, পারবো বোধ হয়।"

পীয়ার ঠিক সময়ে এসে, বারান্দায় একটি টেবিল অধিকার করল। একটু পরেই লাংবের্গও দেখা দিল তার যত্নরক্ষিত পরিচ্ছদ পরে,—মলিন একটা ফ্রক-কোট, হাঁটুর কাছটা ফোলা পা-জামা, আর অনেকদিনের পুরাণো হল্‌দে রঙ ধরা একটা ষ্ট্র-হ্যাট।

পীয়ার বলল, "কথা বলবার মতো একজন লোক পাওয়া সুখের বিষয়। প্রায় বছরখানেক থেকে এক রকম একলাই ঘুরে বেড়াচ্চি।"

"এতদিন বুঝি মিশর ছাড়া?"

"হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশিদিন। মিশর ছাড়ার পর থেকে আমি এবিসিনীয়ায় ছিলাম।"

"ও হ্যাঁ, আমার মনে পড়েচে এখন। কাগজে বেরিয়েছিল। রাজা মেনেলিকের জন্য রেলওয়ে তৈরী করছিলে, তুমিই না?"

হ্যাঁ, কিন্তু গত আঠারো মাস কি এমনিধারা হবে আমি আল্‌সের মত সময় কাটাচ্চি। কখনও থিয়েটার, কখনো মিউজিয়ম, এই সব। এথেন্সে সুরু করে লণ্ডনে শেষ করলাম। মনে পড়চে একদিন পার্থেননের সিঁড়িতে বসে য্যাণ্টিগণ আবৃত্তি করছিলাম—কতকাল পরে যেন সেদিন একটি মুহূর্ত্ত এসেছিল যার একটা অর্থ পেয়েছিলাম।'

"কিন্তু ভাই, প্রকাণ্ড নীলনদীর বাঁধের সঙ্গে নিশ্চয়ই এইসব তুচ্ছ জিনিসের তুলনা তুমি করবে না? কয়েক বছর তুমি ও কাজে ছিলে, না? ও সম্বন্ধে কিছু বল না, শুনি! First Cataract এ, না? ওখানে অনেক পাথর পেয়েছিলে, না? এখানে দেশে বসে থেকেও

ছ্যাখো আমি বাইরের সংস্পর্শ একেবারে হারাই নি! কিন্তু তুমি কত কি জিনিসই না দেখেচ! ধর না সেই জায়গাটা দেখতে পাওয়া—কি যেন সেই সহরটার নাম?"

বাগানে তখন আরো অনেকে আসছিলেন। সেই দিকটায় চেয়ে উদাসীনের মত পীয়ার বল্‌ল, "আস্থয়ান।"

"শুনতে পাই ওই বাঁধটা নাকি পিরামিডের মতই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ওখানে কতগুলো স্লুস-গেট, একশো কত যেন?

"ত্রিশ' ষোল।" পীয়ার কথাটা থামিয়ে নিকটেই টেবিলে হাল্‌কা পোষাকপরা যে একদল মেয়ে বসেছিল, তাদের দিকে ইঙ্গিত করে ব'লে উঠলো "ছ্যাখো, ওই যে মেয়েরা ওখানে, ওদের জানো?"

লাংবের্গ মাথা নেড়ে জানাল যে সে জানে না। (কারণ) বাইরে যে-বিশাল জগৎ সে কখনও দেখতে পায় নি তার খবরের জন্য তার মন তখন লুব্ধ হয়ে উঠেচে। "তোমার আসল লাইন ছিল মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কিন্তু রেলওয়ে, জলের বাঁধ, এই সব কাজে তুমি কি করে সকলের ওপরে উঠলে সেই কথা ভেবে আমি অনেক সময় বিস্মিত হয়েচি। অবিশ্যি একটা বছর বেশী তুমি রাস্তা, রেলওয়ে নির্ম্মাণও শিখেছিলে বটে, কিন্তু—"

হায়রে, স্কুলের উজ্জ্বল রত্ন!

পীয়ার বলল "এক গ্লাস শ্যাম্পেন, কি বল? তোমার কেমন লাগে? মিষ্টি চাই না অমনি?"

"কেন তাতে কোনো তফাৎ আছে নাকি? আমি বাস্তবিক জানি না। তবে, লক্ষপতি হলে পরে—"

পীয়ার মৃদু হেসে বল্‌ল "আমি লক্ষপতি নই।" বলে ওয়েটারকে ডাকল!

"ও আমি শুনেচি তুমি হচ্চ—তুমিই তো নতুন মোটর-পাম্প আবিষ্কার করেচ, যা আর সব পাম্পকে বাজার থেকে তাড়িয়েছে? আর তারপর—সেই এবিসিনীয় রেলওয়ে।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলতে লাগল, "ভাল ভাল, কেউ যদি ভাগ্যবান হয় সে ভাল কথা। অন্যের তাতে অনুযোগ করা উচিত নয়। কিন্তু আর দুজনের খবর কি, ক্লাউসব্রক আর ফার্দ্দিনান্দ হল্‌ম্? তারা এখন কি করচে?"

"ক্লাউস এড্‌ফিনায় খেদিভের এষ্টেট্ দেখচে শুনচে। বাষ্পশক্তি দিয়ে কৃষিকর্ম্ম হচ্চে, আর নিজের রেলওয়েতে সেইসব উৎপন্ন দ্রব্য চালান দিচ্চে। হ্যাঁ, ক্লাউস বেশ একটু নিজের জায়গা করে নিয়েচে। তার জমিদারী এই দেন্‌মার্ক রাজ্য থেকে বড়।"

"এ্যাঁ!" বলে লাংবের্গ তার চেয়ার থেকে পড়েই যায় আর কি! "আর ফার্দ্দিনান্দ হল্‌ম্—তার খবর?"

"ও, সে আরো বড় কাজ নিয়ে রয়েচে। লাইবিয়ান মরুপ্রদেশ নিয়ে খুব হৈ চৈ করছিল, তারপর সে বার করেচে যে তার অনেকখানি জায়গায়ই, মাত্র, কয়েক গজ খুঁড়লেই জল পাওয়া যেতে পারে। অবিশ্যি যদি তাই হয়, তাহলে শস্য ফলিয়ে ও দেশটাকে স্বর্গ করে তোলা যেতে পারে—শুধু উপযুক্ত কল চাই।"

"ইস্, কি আবিষ্কার!" লাংবের্গের এতক্ষণে দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

পীয়ার ফিয়োর্ডের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, "গত বছর সে খেদিভকে পটিয়েচে, এখন তারা মিলে কয়েক কোটি মূলধন নিয়ে কোম্পানী খুলেচে, ফার্দ্দিনান্দ তার চীফ ইঞ্জিনিয়ার।"

"তার মাইনে কত? পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন?"

হয়ত সঙ্গীটির মূর্চ্ছা পেতে পারে এমনি আশঙ্কা নিয়ে পীয়ার বলল, "তার মাইনে হচ্চে দু লক্ষ ফ্রাঙ্ক। হ্যাঁ, ফার্দ্দিনান্দ যোগ্য লোক বটে।"

শ্বাস নিতে লাংবের্গের কিছু সময় লাগল। শেষে আড়চোখে চেয়ে সে প্রশ্ন করল, "আর তুমি আর ক্লাউসব্রক বোধ করি তার কোম্পানিতে তোমাদের লাখ লাখ টাকা লাগিয়েচ?"

উদ্যানের দিকে তাকিয়ে থেকে পীয়ার মৃদু হেসে, গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে শুধু বলল, "তোমার স্বাস্থ্য কামনা করি।"

অন্যটি বলতে লাগল, "আমেরিকাতেও গিছ্‌লে? বোধ হয় না?"

"আমেরিকা? হ্যাঁ, কয়েক বছর হল' যখন ব্রাউনব্রাদার্সের ওখানে ছিলাম তারা আমায় একটা কল কিন্‌তে পাঠিয়েছিল। তাতে আর এমন আশ্চর্য্যের কি আছে বল?"

"না না, তা নেই অবশ্যি। আমি শুধু ভাবচি তুমি সেখানে গিয়েছ আর তারা যে সব আশ্চয্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপার করচে, সেই সব আশ্চর্য্য জিনিষ তুমি দেখেচ!"

"ভায়া, তুমি জান না যে আমি ওইসব অদ্ভূত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের ওপর কি রকম বিরক্ত হয়ে উঠেচি! আমি এখন চাই সেই দেশী জলের কল, যাতে এক ঝোলা গম পিষতে ২৪ ঘণ্টা লাগে।"

"কি, কি বলচ তুমি?" ব'লে লাংবের্গ একেবারে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। "হা-হা-হা দেখচি তুমি সেই আগেকার পীয়ারই রয়ে গেছ।"

পীয়ার তার সঙ্গীর দিকে গেলাস তুলে ধরে বল্‌ল, "আমি বাস্তবিক ঠাট্টা করচি না; যাক্ আমাদের আগেকার দিনগুলির স্মরণার্থে এই পান করা যাক্।"

"হ্যাঁ, ধন্যবাদ, সহস্র ধন্যবাদ,—আমাদের পুরানো দিনের উদ্দেশ্যে! আঃ, কি মধুর! আচ্ছা বোধ হয় সেই অসভ্যদের দেশে তুমি প্রেমে পড়েছিলে? পড়নি? হা-হা-হা!"

"মিশরকে অসভ্যের দেশ বলচ ?"

"কেন, ফেল্লারা কি তাদের স্ত্রীদের হালে জোতে না ?"

"ফেল্লা রাতকে রাত ঘরের বাইরে বসে তারার দিকে চেয়ে চেয়ে স্বপ্ন দেখে আর ভিয়েনার বণিক-রাজা থিয়েটারে যাবার পথে মোটরে বসে বসেও কাজের চিঠি লেখান আর থিয়েটারে বসে বসে টেলিগ্রাম ছাড়েন। এমন শুভদিনও আসবে যখন তিনি তাঁর প্রাইভেট বক্সে বসে এক কানে টেলিফোন লাগিয়ে আর এক কানে অপেরা শুনবেন। আশ্চর্য্য, বিজ্ঞানের বিস্ময় তো আমাদের এই উপকার করচে। খুব ভীতিজনক ব্যাপার নয় কি ?"

"যে তুমি নীলনদীকে বেঁধেচ, মরুভূমির মাঝ দিয়ে রেলওয়ে চালিয়েচ সেই তোমার মুখে এই সব কথা ?"

পীয়ার বিরক্তভাবে কাঁধটা নাড়ল—সিগার-কেস থেকে একটা সিগার বার করে লাংবের্গ এর দিকে ধরল। ওয়েটার কফি নিয়ে হাজির হলো।

"মানব জাতিকে দ্রুততর উন্নতির পথে চলতে সাহায্য করা, এ কি কিছুই নয় ?"

"আচ্ছা, বলি এই যে এত তাড়াহুড়ো করে চলেচে মানুষ, জানতে পারি কোথায় তারা চলেচে ?"

"নীলের বাঁধ হওয়ায় মিশরের উৎপন্ন দ্রব্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন সম্ভব করেচে—সেটা কি কিছু নয় ?"

"ভায়া, এই পৃথিবীতে এমনি যথেষ্ট মূর্খ রয়েচে বলে কি তোমার সত্যি মনে হয় না ? আমাদের মাঝে দুঃখ-দুর্দ্দশা অসন্তোষ আর শ্রেণীগত ঘৃণা কি এতই কম রয়েচে যে তাকে দুনো করে তুলতে হবে ?"

"যাকগে ওসব, কিন্তু ভায়া, ইউরোপীয় কালচার? নিশ্চয়ই তুমি যেখানে ছিলে সেখানে নিজেকে সভ্যতার মিশনারী বলে অনুভব করতে?"

"প্রাচ্য জগতে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রচারের সোজা অর্থটা হচ্চে এই যে, লণ্ডন কিম্বা প্যারিসের গোটা ছয় বড় বড় ধনকুবের আফ্রিকা কিম্বা এসিয়ার কোনো ভূমিখণ্ডকে পছন্দ করে বসেন আর তাদের একটি কলের টিপে যত সব মন্ত্রী আর সৈন্যাধ্যক্ষ আর মিশনারী আর ইঞ্জিনীয়ার সেলাম ঠুকে হাজির হয়ে বলে, বলুন কি করতে হবে?"

"কালচার! একটা চাকা দশটা চাকার জন্ম দিলে, বর্‌-র্‌-র্‌! আবার দশটা চাকা থেকে একশোটা বর্‌-র্‌-র্‌ গতি দ্রুততর হলো, প্রতিযোগিতা বাড়লো—কি জন্যে? কালচারের জন্যে? না, বন্ধু টাকার জন্যে। মিশনারী! আমি বলি, যতদিন পশ্চিম ইউরোপ তার আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার, তার খৃষ্টীয়ধর্ম্ম আর তার রাজনৈতিক সংস্কার নিয়েও আজকালকার ওঁচা মানুষের চাইতে ভালো মানুষ তৈরী করতে না পারবে, ততদিন হতভাগা মুখটি বন্ধ করে ঘরে বসে থাকাই উচিত। যাক্—পান করা যাক।" ব'লে পীয়ার গেলাসটি নিঃশেষ করল।

বেচারা লাংবের্গের পক্ষে এ কথাগুলি শোনা প্রীতিকর নয়। কারণ সে তার দৈনন্দিন কর্ম্মের মাঝে এই চিন্তা করেই সান্ত্বনা পেত যে, সেও তার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে থেকে জগৎকে সভ্য করে তোলবার কাজে নিজের যথাসাধ্য সাহায্য ক'রে চলেছে।

শেষে তার সিগারের ধোঁয়াটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে চেয়ারে পিঠটা মেলে দিয়ে বল্‌ল, "কলেজে থাকতে একটি যুবকের কথা মনে

পড়েছে, যে প্রমিথিউসের সম্বন্ধে, মানবজাতিকে পরিত্রাণ করবার বিশাল কর্ম্ম সম্বন্ধে, অলিম্পাস থেকে কেবলি নতুন রকমের আগুন চুরি করে আনবার সম্বন্ধে কত কথাই বলতো।"

পীয়ার হেসে বল্‌লে, "হ্যাঁ, সে আমিই ছিলাম; বাস্তবিক বলতে—আমি শুধু ফার্দ্দিনান্দ হল্‌মের কথার আবৃত্তি করতাম মাত্র।"

"ওসব তুমি এখন আর বিশ্বাস কর না?"

"আমার মনে হয় আগুন আর ইস্পাত দ্রুত মানুষকে পশুতে পরিণত করে চলেচে।"

"কিন্তু কি বলচ ভাই, নিশ্চয়ই মানুষ খৃষ্টান হতে পারে আর যাই—"

"যতখানি ইচ্ছে ততখানি খৃষ্টান হও না! কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে, ক্রুসের ওপরকার একজন সন্ন্যাসীকে পূজো করবার চাইতে মহত্তর কিছুর পূজা করবার সময় এসেচে? নিজেদের চামড়াটুকু বাঁচিয়ে আমরা স্বর্গে ঢুকতে পারব বলেই কি চিরকাল ভগবানের যশ কীর্ত্তন করতে হবে আমাদের! এই কি ধর্ম্ম?"

"না না, বোধ হয় না। কিন্তু আমি জানি না—"

"আমিও জানি না। কিন্তু তাতে-কিছু আসে যায় না; কারণ ধর্ম্মানুভূতি বলে আজকাল আর কিছু নেই। যন্ত্র আমাদের ভূমার আকাঙ্ক্ষাকেও বিনাশ করচে। বড় বড় সহরের লোকদের জিজ্ঞাসা কর। তারা গ্রামোফোনে Dollar Princess বাজিয়ে এখন বড়দিনের সন্ধ্যা কাটায়।"

লাংবের্গ কিছুক্ষণ তার দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল। পীয়ার ধীরে ধীরে সিগার টানতে লাগল, সুরাপানে মুখ তার আরক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু থেকে থেকে চোখ তার মুদে আসছিল, আর তার চিন্তা-গুলো যেন এসব ছেড়ে অন্য কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

শেষে তার সাথী প্রশ্ন করল, "দেশে ফিরে এখন তুমি কি করবে ভাবচ?"

পীয়ার চোখ খুলে চাইলে, বললে "করাকরি? ও আমি জানি না। প্রথমে নিজের চারদিকটা দেখতে হবে। তখন হয়ত কোনো কুটীরবাসীর একটু জমি কোথাও পাবো। সেখানে কোনো একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসবাস করা যাবে।" এই বলে পীয়ার লাংবের্গের সৌভাগ্য কামনা করে সুরাপান করল।

গরমের হাল্‌কা পোষাক-পরা নতুন লোকে তখন বাগান ভরে গেছে; উজ্জ্বল সন্ধ্যাবেলা কেবলি হাসির লহর আর প্রফুল্ল কণ্ঠধ্বনি তাদের কানে আসতে লাগল। পীয়ার উৎসুক দৃষ্টিতে ওই অপরিচিতের দলের দিকে চেয়ে তার সঙ্গীকে কয়েকজনের নাম জিজ্ঞেস করতে লাগল। লাংবের্গ দু-একজন বিখ্যাত লোককে দেখাল—পাশে ছিলেন একজন ক্যাবিনেটের মন্ত্রী, একটু দূরে ছিলেন একজন বিখ্যাত আবিষ্কারক। লাংবের্গ বললে, "কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁদের জানাশোনা নেই; ওদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সামর্থ্য নেই আমার।"

ফিয়োর্ডের ওপরকার হল্‌দে আলোর ঝল্‌মলানির দিকে তাকিয়ে পীয়ার বল্‌লে, "এখানটা কি সুন্দর! দেশে ফিরে আসা কি সুন্দর!"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেশের ভেতর দিকে যাত্রা ক'রে পীয়ার গাড়ীতে বসে আছে আর পাশ দিয়ে যে সব গোলাবাড়ী, মাঠ আর গাছের-সারি-দেওয়া রাস্তা সরে সরে যাচ্চে জান্‌লা থেকে তাই দেখচে। কোথায় চলেচে সে? সে নিজেই জানে না তা। বেপরোয়া যাত্রা কেনই বা মানুষ করবে না,

যেখানে যখন ইচ্ছে হলো নেমে পড়লেই বা কি ? এখন তো সে আধলা-পয়সার হিসেব না করেও দেশের ভেতর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। বিনা ভাবনা-চিন্তায় সে এখন মাথার উপর দিয়ে দিনগুলোকে যেতে দিতে পারে, পথে যা-কিছু সৌন্দর্য্য এসে পড়ে তাকে উপভোগ করবার এখন তার প্রচুর অবসর রয়েচে।

ওই তো মিয়োসেন্, সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ—যার দু-পাশে উর্ব্বরা জমি, আর দীর্ঘ বনময় পার্ব্বত্যভূমি রয়েচে। পীয়ার এর আগে কখনো এখানে আসেনি, তবু তার মনে হতে লাগল যেন তার অন্তর থেকে কে ওই সমস্তকেই পরিচয়-সম্ভাষণ জানাচ্চে। আবার ফলশস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্যকে সে পান করতে লাগল,—বনময় পর্ব্বত, শস্যক্ষেত্র, প্রান্তর এরা সব তার মনের শূন্য-স্থানগুলোকে অধিকার ক'রে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু দিবসের শেষ দিকটায় প্রাকৃতিক দৃশ্যপট সঙ্কুচিত হয়ে এলো, কারণ তারা তখন গুড ব্রাণ্ডস্‌ডালেন-এ এসে পৌঁছেচে; সেখানকার রোদে-পোড়া খামারগুলো নদী আর পাহাড়ের মাঝেকার সবুজ ঢালুর ওপর অবস্থিত। পীয়ারের মাথা বিদেশের কত না দৃশ্য চিত্রে-ভরা—রৌদ্রদগ্ধ খর্জ্জুর বৃক্ষসমন্বিত বালুকাময় মরুভূমি থেকে সুরু করে ভেনিসের খাল পর্য্যন্ত। কিন্তু এখানে—আবার পীয়ারের মাথা তুলে উঠল। যদিও সে আগে কখনো এ জায়গাটা দেখেনি তবু এখানে সে যেন আপন ঘরে রয়েচে। তার নির্ব্বাসনের দীর্ঘ বৎসরগুলো ধরে ঠিক এ-ই যেন তাকে ডেকেচে।

অবশেষে হঠাৎ ব্যাগ-বস্তা গুটিয়ে, ষ্টেশনের নামটুকু মাত্রও না জেনে সে বেরিয়ে পড়ল। হোটেলে ভোজন করে পিঠে বস্তা ফেলে তার পর হেই—ও! ওই তো তার সামনে রাস্তা পাহাড়ের ভেতর গিয়ে ঢুকেচে।

একলা? কি আসে যায়, চারদিক থেকে অনন্ত বস্তুরাশি তাকে স্বাগত সম্ভাষণ করচে। রাস্তাটা খাড়া উঠে গেছে, হাওয়া হাল্‌কা হয়ে আসচে, ঘরবাড়ী ছোট হয়ে যাচ্চে। শেষে কুঁড়ে ঘরগুলো দেশলাইয়ের বাক্সের মত দেখাতে লাগল; নিশ্চয়ই নীচে থেকে মনে হয় এখানকার লোকেরা মেঘের মাঝে বাস করে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা কত না যুবক এই পথ বেয়ে 'সেটার' কুটিরে তাদের "ম্যারী" "কারী"দের সঙ্গে প্রেমালাপ করবার জন্যে এসেচে—এই একই রাস্তা ধ'রে একই বার্ত্তা নিয়ে যুগের পর যুগ। পীয়ারের মনে হলো যেন সেই সব যুবকেরা তার সঙ্গে চলেচে—হ্যাঁ, সে যেন নিজের মাঝে খেয়ালী যৌবনকে আবিষ্কার করল, সে যেন এতকাল পরে মুক্তি পেল।

ওফ্‌! কোট্‌টা ছাড়তে হল, টুপিটাকেও ব্যাগে রাখতে হল। উপত্যকা যতই তার নীচে নেমে যেতে লাগল, মালভূমির ওপর দিয়ে দৃশ্যপরিধি ততই বহুদূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কটা আর নীল রঙের পাহাড়গুলো, ছাই-রঙা, শ্যাওলা-রঙা অসম পার্ব্বত্যভূমি অস্তগামী সূর্য্যালোকে ঢেউ খেলিয়ে চলেচে, তার পরে এক বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র—আকাশের বুকে ফেনিল ঊর্ম্মিময় সাগরের মত। পীয়ারের মনে হতে লাগল, যেন সে নিশ্চয় পূর্ব্বে এসব দেখেচে।

আ-হা! মনে পড়ে গেছে; এ যে সেই লফোটেন সমুদ্র, ওই তো সেই ফেন-চূড়া সাদা সাদা ঢেউ, ওই সেই দীর্ঘ দমভারী সাগরের ফুলে-ফুলে ওঠা; তরঙ্গায়িত সাগর যেন পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়ে রয়েচে। পীয়ার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে লাঠির ওপর ভর দিয়ে ক্ষণকাল দাঁড়াল। তার মর্ম্মের মাঝেও কি সে এমনি উদ্বেলিত সাগরের উত্থান-পতন অনুভব করচে না? এই তরঙ্গরাশিই কি যুগের পর যুগ বংশ-পরম্পরায় মানব-জাতিকে বৃহৎ অভিযানের পথে টেনে নিয়ে গর্জ্জে' চল্‌চে না? দৈনন্দিন

জীবনের মাঝে এই তরঙ্গ তার সনাতন পরিচিত ছন্দে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেচে, হাজারে একজনও মাথা তুলে প্রশ্ন করে না, এই চলা কোথায় আর কেন! এই তো এই নিমেষেই এমনি একটি ছোট্ট ঢেউ তাকে নিয়ে চলেচে—কোথায়, কেন? যাক্ আগামী কাল হয়ত তা প্রকাশ করবে: এখন তো অসীম আকাশের তলে ওই পাষাণ-সমুদ্র তার শাশ্বতচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেচে।

কপালটা মুছে, মুখ ফিরিয়ে পীয়ার তার পথ ধরল।

কিন্তু উত্তর-পূর্ব্বে ওই দূরে ওটা আবার কি? সাদা শাল গায়ে দিয়ে তিনটি বোন আকাশে মাথা তুলে রয়েচে ও নিশ্চয়ই রন্দানী। সান্ধ্যরবি কেমন ওই সাদা চূড়াগুলোকে বেগুণে সোণালি রঙে রঙিয়ে দিল।

ওফ্! আর শুধু একটা পাহাড় বাকি, শেষকালে চূড়ায় এসে পৌঁছানো গেল। ওই সামনে সেই প্রকাণ্ড মালভূমি—জলাভূমি, ঢিবি আর ঝিলিমিলি হ্রদের দেশ। আঃ বাঁচা গেল! এখন যে পদক্ষেপ দ্রুত আর লঘু হয়ে আসবে, তাতে বিচিত্র কি! নিজের অজ্ঞাতসারে পীয়ার অন্তরের উৎফুল্লতায় গান গেয়ে উঠল। হে ভগবান, হয়তো তরুণ হবার সময় এখনো পেরিয়ে যায় নি।

একটা 'সেটার' ;—এক টুকরো সবুজ জমির ওপর কঞ্চির বেড়া দেওয়া একটি ছোট্ট কুঁড়ে, আর যেমন তেমন তক্তা দিয়ে তৈরী একটা লম্বা গোশালা—'সেটার'ই নিশ্চয়। আর শোনো—ওই তো একটি মেয়ে গান গাচ্চে না? পীয়ার ধীরে ধীরে ফাটকের ভেতর গিয়ে ঢুকলো, গোশালার দেয়ালে হেলান দিয়ে সে গান শুনতে লাগল। বাল্তির মাঝে বাঁটের দুধ 'সপ্ সাপ্ সপ্ সাপ্' শব্দ করে চলল। ওই যে দুধ দুয়োচ্চে, সে পরী না হয়ে যায় না। তার পর শোনা গেল:—

Oh Sunday eve Oh Sunday eve

Ever wast thou my dearest eve

আবার বালতির মাঝে সেই স্থপ্‌ সাপ্‌ স্থপ্‌ সাপ্‌ শব্দ—হঠাৎ পীয়ার যোগ দিয়ে গেয়ে ফেলল :—

Oh bright oh gentle Sunday eve—

Will ever be my dearest eve—

দুধ-দুয়ানো বন্ধ হলো, গাভী তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেরাতেই গলার ঘণ্টা বেজে উঠল, একটা হাল্‌কা কটা-চুলো মাথা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল—তার পরই পাতলা গড়ন, লাল গাল, সরস হাস্যময়ী অষ্টাদশী মেয়েটিও বেরিয়ে এল।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে পীয়ার বললে, "শুভ-সন্ধ্যা।"

মেয়েটি তার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য তাকিয়ে নিজের পরিচ্ছদের দিকে চাইলে—কোনো পুরুষকে ভালো লেগে গেলে মেয়েরা যা করে থাকে, আর কি!

জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কে?"

"আমায় মাখনের পরিজ করে দিতে পারো?"

"আগে দুধ দুইয়ে নিতে হবে, তার পর—"

পীয়ার সাহায্য করবার মত কাজ পেল। ব্যাগ নামিয়ে রেখে, হাত ধুয়ে, গোয়ালের মধুর বন্ধ হাওয়ায় একটা টুলের ওপর ব'সে তৎপরতার সঙ্গে সে দুধ-দুয়ানো সুরু করে দিলে। তার পর সে জল নিয়ে এলো, জ্বালানি কাঠ কেটে দিল, মেয়েটি আগাগোড়া তার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগল—এই মাথা-পাগলা লোকটি কে? যখন পরিজ তৈরী ক'রে টেবিলে রাখা হ'ল তখন পীয়ার মেয়েটিকে পাশে বসিয়ে তাকে ভাগ নেবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করল। অন্ন খাওয়া হলো, তার পর অল্প

হাসাহাসি, তারপর গল্পসল্প, আবার খাওয়া—আবার হাসাহাসি। পীয়ার যখন জিজ্ঞেস করল কি দিতে হবে, মেয়েটি বলল 'যা আপনার ইচ্ছে'—পীয়ার তাকে দু'ক্রাউন দিলে, তার পর তার মুখটি পেছন দিকে বেঁকিয়ে ধরে চুমো খেলে। যখন সে বেরিয়ে গেল, তখন পেছন থেকে শুনতে পেল মেয়েটি রুদ্ধশ্বাসে বলচে, "ভালোরে, লোকটার মতলব কি?" বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে যখন সে ফিরে তাকালো, তখনও মেয়েটি চোখের ওপর হাত দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েচে।

এখন কোথায় যাবে সে? তার স্থির বিশ্বাস, রাত হয়ে যাবার আগে সে আর কোনো লোকালয়ে পৌঁছবেই। তার মনে হতে লাগল এটা তার থাকার জায়গা নয়। না, এখানে নয়।

তখন প্রায় দুপুর রাত, তুষার-ঢাকা পাহাড়ের গায়ের নীচে বিশাল পাহাড়ী হ্রদের তীরে গিয়ে সে দাঁড়াল। সেখানে দুটো 'সেটার' ছিল, আর হ্রদের অপর পারে, বনময় দ্বীপে ছিল একটা ছোট্ট বাড়ী, সহুরে লোকের গ্রীষ্মাবাসের মত। হ্রদের ওপর তখনো সন্ধ্যার রক্তরাগ মিলিয়ে যায় নি, তার ওপর দিয়ে সেই দ্বীপের দিকে একখানি নৌকা যাচ্চে দেখা গেল, তাতে দুটি সাদা-পোষাক পরা মেয়ে দাঁড় টানে, আর গায়। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল—এইখানে, এইখানেই সে থাকতে চায়।

'সেটার'-এ একটি বিষম মোটা স্ত্রীলোক কোমরে দড়ি জড়িয়ে, শোবার জন্য তৈরী হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। রাত্তিরটা এইখানে থাকবার জায়গা হবে কি? কেন হবে না? স্ত্রীলোকটি অন্য ঘরে চলে গেল। পীয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি ছোট্ট ঘরে পাহাড়ী মাদুর আর লেপ দেওয়া বিছানাটিতে শুয়ে পড়ল। সদ্য-ধোয়া মেঝেয় ছড়ানো জুনিপারের পাতা থেকে আর ঘরের চার দিকে শেল্‌ফ

দেওয়া দেয়ালে সারি করে রাখা পনীর থেকে একটা বেশ তাজা গন্ধ আসতে লাগল। হ্যাঁ, কত জায়গায়, কত রকমেই সে ঘুমিয়েচে সমুদ্রে লফোটেন নৌকায়; উটের দোল-খাওয়া পিঠের ওপর; চন্দ্রালোকিত মরুবক্ষের তাঁবুতে, আরব্যোপন্যাসের প্রাসাদকক্ষে—যেখানে বামনেরা গরম-বাঁচাবার জন্যে তাদের পাখা দিয়ে তাকে হাওয়া করেছে। আর তাকে 'পাশা' বলে সম্বোধন করেছে কিন্তু শেষে সে একটি স্থান পেয়েছে যেখানে থাকতে তার ভাল লাগছে। চোখ বুজে পীয়ার বাইরে আলোকিত গ্রীষ্ম রাত্রির বুক দিয়ে যে ছোট্ট নদীটি কল-শব্দ করে চলেচে তার কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন একটু দেরীতেই পীয়ার উঠ্‌ল—মোটা স্ত্রীলোকটির কফি নিয়ে প্রবেশ করবার শব্দে। তার পর পাহাড়ী হ্রদের নীল সবুজ জলে ঝাঁপ, একটু সাঁতার, এবং ফিরে এসে লাঞ্চে টাউট মাছ, গরম-গরম রুটি আর ঘন মাখন ভোজন।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বলে, 'হ্যাঁ যে রকম রান্না, তা যদি বরদাস্ত হয়, তা হলে কয়েক দিন থাকতে আপত্তি কিসের, ভাল কথাই; বিছানাটা তো ওখানে খালিই পড়ে রয়েছে।'

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাই পীয়ার থাকে আর মাছ ধরে। মাছ ধরে খুবই কম; কিন্তু এখানে সময়টা মৃদুমন্দ গতিতে কাটে, কটা আর নীল পাহাড়ের গায়ের ওপর আতপ্ত গ্রীষ্মের দিনগুলো বেশ মোলায়েম লাগে। অল্পকালের মধ্যেই সে জানতে পারল যে, দ্বীপের ওপরকার বাড়ীটায় ইউথোগ নামে রিক্সেবীর একজন ব্যবসায়ী তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে বাস করে। কিন্তু তাতে কি হলো?

নৌকোয় শুয়ে শুয়ে পাইপটা টানতে টানতে পীয়ার ধীর-সঞ্চারী স্বপ্নরাশির আসা-যাওয়ার অনুসরণ করে। সন্ধ্যা বেলা অরুণ জলরাশির ওপর দিয়ে একখানি শুভ্র-তরণী ভেসে চলেছে, তার মাঝে একটি তরুণী, একটি দ্বীপে গোপন দেখা…কেউ তা জানবে না…এমনটি কি তার জীবনে ঘটবে?—নাঃ।

সূর্য্য ডোবে, গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি 'সেটারের' দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, 'সেটারের' মেয়েদের সুরকরা চীৎকার আর ডাক, পশুদের হাম্বারব শোনা যায়। দূরে পাহাড়গুলো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের তুষার-কিরীট সোনার রঙে রঙীন হয়ে ওঠে; তটিনী জ্যোতির্ময়ী রাত্রির মাঝ দিয়ে কলধ্বনি করতে করতে মৃদু তরঙ্গ তুলে বয়ে যেতে থাকে।

শেষে সেই সকল দিনের সেরা দিনটি এলো।

কম্পাস দিয়ে পথ ঠিক করে, ফেরবার জন্য পথ-চিহ্ন নির্দ্দেশ করতে করতে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে সে দীর্ঘ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। ফুলে-ফলে-আচ্ছন্ন একটা জলা জমির কাছে এসে পৌছাল সে,—ফলগুলোর স্বাদ তার নিজের ছেলেবেলাকে যেন নিয়ে এল। চলতে চলতে লাল লাল ঝোপে-ঢাকা একটা উঁচু জমির ওপর গিয়ে সে উঠল—সামনে কি যেন দেখা গেল, ধোঁয়া না কি? পীয়ার চলল সে দিকে। হ্যাঁ, ধোঁয়াই বটে। তার সামনে দিয়ে একটা টার্ম্মিগান পাখী তার ছোট্ট একরাশি বাচ্চা নিয়ে ফড়্ ফড়্ করে উঠল—বাবা, কি সব বাচ্চা! পায়ের তলায় চাপা না পড়ে সেজন্য পীয়ার থমকে দাঁড়াল। ধোঁয়া মানে মানুষ রয়েছে নিকটেই—হয়ত একদল ল্যাপ; গিয়ে দেখাই যাক্।

শেষ ঢিবিটার ওপর গিয়ে সে দাঁড়াল, আগুনটা ঠিক তার নীচেই।

দুটি মেয়ে চমকে লাফিয়ে উঠল; আগুনের ওপর একটা ঝকঝকে কফির কেটলি আর পাশেই শ্যাওলা-পড়া মাটিতে কাগজের উপর রুটি মাখন আর স্যাণ্ডউইচ।

পীয়ার বিস্মিতভাবে থমকে দাঁড়াল, তরুণী দুটি মুহূর্তের জন্য তার দিকে চাইল, পীয়ারও তাদের দিকে চাইল, তিনজনের মুখেই একটা দ্বিধাজড়িত হাসির খেলা।

শেষে অগত্যা পীয়ার টুপি তুলে অভিবাদন ক'রে রুষ্টা 'সেটার' কোথায় জিজ্ঞাসা করে। বুঝিয়ে বলতে তাদের কিছু সময় লাগে, তার পর তারা আবার তাকে সময় কত জিজ্ঞেস করে, সে তাদের মিনিট ধরে' সময় বাতলে দিয়ে, তারা নিজেরাই যাতে দেখে নিতে পারে সেজন্যে তার ওয়াচটা দেখায়। এই সব করতে গিয়ে আরো সময় কাটে। ইতিমধ্যে তারা পরস্পরকে ভালো ক'রে দেখে, আরো দেখে যে তখনি ছাড়াছাড়ি হবার বিশেষ কোনো কারণ নেই। একটি মেয়ে পাতলা, ছিপছিপে দেখতে, মুখখানি বেশ টুকটুকে গোলগাল, চুলগুলো ঘন কটা রঙের। মোটা ভুরু নাকের ওপরটায় এসে মিলেচে, দেখতে সুন্দর। পরণে ছিল নীল রঙের সার্জ্জের পোষাক, পায়ের গোড়ালি দেখা যায় এমনি ধরণে পরা। অন্যটি লম্বায় একটু খাটো; রঙ কটা-পানা, মুখখানি হাসি লেগে থাকা সত্ত্বেও বিষাদ-মাখা। সে হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা আপনার কাছে পকেট-ছুরি হবে কি?"

"হ্যাঁ, আছে বই কি!"—পীয়ার রওনা দিয়েছিল, কিন্তু আর একটু থাকবার এই সুযোগটাকে সে আনন্দে গ্রহণ করল।

কালো মেয়েটি বললে, "আমাদের সঙ্গে এক টিন 'সার্ডিন' রয়েচে, অথচ খোলার কিছুই নেই।"

পীয়ার বললে, 'দেখি তো খুলতে পারি কি না!' দৈবকে আর

ঠেকানো যায় কি ক'রে! পীয়ারের হাতটা সামান্য কেটে গেল; মেয়ে দুটি কাটা জায়গাটা বাঁধার জন্য এ ওর ওপর পড়ে আর কি! শেষটায় এই হলো, পীয়ার তাদের কফি-পার্টিতে নিমন্ত্রণ পেল।

কালো অভিবাদন ক'রে বললে, "আমার নাম মার্লে ইউথোগ।"

"আচ্ছা, হ্রদের মাঝের দ্বীপের ওপরকার বাড়ীখানা তা হলে আপনার বাবার?"

"আমার নাম শুধু মোর্ক—থীয়া মোর্ক।" কটা বললে, "আমার বাবা আইন-ব্যবসায়ী; হ্রদের আরো ওদিকে আমাদের একখানি ছোট্ট কুটীর আছে।"

পীয়ার নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছে, এমনি সময় কালো বাধা দিয়ে বললে, "ও আপনাকে আমরা জানি; প্রায়ই তো আপনাকে হ্রদে নৌকা নিয়ে বেড়াতে দেখি। তাই আপনার সন্ধান একটু নিতে হয়েচে আমাদের। আমার একটা ভালো দূরবীণ আছে......"

সঙ্গিনীটি তাড়া দিয়ে বললে, "এ-ই মার্লে!"

কালো বলতে লাগল..."তারপর কাল আমাদের একটি ঝিকে সমস্ত সন্ধান করে ঠিক খবর দেবার জন্য পাঠিয়েছিলাম।"

"মার্লে! এ সব কি বলচিস্?"

বেশ আনন্দের একখানি ছোট খাট ভোজ হয়ে গেল। কি তরুণ ওই মেয়ে দুটি, তাদের মাঝে রঙ্গ রহস্য নিয়ে খুব হাসাহাসি চলল আর তিন জনে মিলে একরাশি রুটি মাখন আর কফিরও সদ্ব্যয় করল। মার্লে মাঝে মাঝে আড় চোখে তাদের সাথীর পানে চায়, থীয়া তার সঙ্গিনীর নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচ কথা শুনে হেসে উঠেই তাকে ধমকাতে থাকে আর উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পীয়ারের দিকে তাকায়!

তারপর বহুদূর পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে এসে সূর্য্য ঠেকল, সন্ধ্যা হয়ে এল। তাদের জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদা হলো, পীয়ারের পিঠে এক বোঝা বেরি-ফল চাপানো হলো আর তার হাতে একটা টিনের বাল্‌তি দেওয়া হলো। মার্লে বললে, "আরো কিছু দে না রে, পরিশ্রম করলে এঁর বেশ উপকার হবে।"

"মার্লে, তুই সত্যি ভয়ানক খারাপ হচ্চিস্‌!"

"এই যে নিন্‌" বলে মার্লে পীয়ারের আরেক হাতে বাস্কেটের হাতলটা ধরিয়ে দিলে।

তারপর পাহাড় তারা থেকে নামা সুরু করল। চলতে চলতে মার্লে খুব উঁচু পর্দ্দায় গান গাইতে লাগল; তখন পীয়ারও গাইলে, তারপর তিন জনে মিলে গান ধরলে। সামনে ঘাসের স্তূপ, জলের ডোবা পড়ল; কে আর ঘুরে যায়; এক লাফে সেটা পার, তারপর লাফানোর আমোদে মেতে আরেক লাফ!

'সেটার' পার হয়ে তারা জলের ধারে নেমে গেল, পীয়ার তাদের নৌকা বেয়ে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব জানালে; তারা নৌকায় পার হতে লাগল। সারাক্ষণ কত কথা আর কত হাসি; যেন তাদের মাঝে কত বছরের এই জানাজানি!

বাড়ীর ঠিক নীচেই নৌকা লাগল গিয়ে; সাদা দাড়ি আর চওড়া গড়ন একটি লোক ট্র-হ্যাট মাথায় দিয়ে তাদের দিকে নেমে এলেন। 'বাবা, ফিরে এসেচ' বলে মার্লে তাঁরে লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরল; কানে কানে কি কথা হলো। পিতা পীয়ারের দিকে তাকালেন। হ্যাট নামিয়ে তিনি পীয়ারের দিকে এসে নম্রস্বরে বললেন, "মেয়েদের নিয়ে এসে বড়ই অনুগৃহীত করলেন।" মার্লে বললে, "ইনি হচ্চেন হের হল্‌ম্‌ মিসরবাসী ইঞ্জিনীয়ার আর ইনি আমার বাবা।"

ইউথোগ্ বললেন, "শুনেচি আমরা প্রতিবেশী। আমাদের এখুনি চা হচ্চে, আর কোনো কাজ না থাকে তো আপনি বোধ করি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।"

কুটীরের বাইরে চশমা চোখে একটি শুভ্রকেশ পাণ্ডুর মুখ মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। মোটা উলের শাল জড়ানো সত্বেও বোধ করি তাঁর শীত করছিল। তিনি 'আসুন আসুন' বলে অভ্যর্থনা করলেন; পীয়ারের মনে হলো যেন তাঁর স্বর কেঁপে উঠচে।

দুখানি ছোট নীচু ঘর; একঘরে একটা খোলা অগ্নিকুণ্ড, সেখানে টেবিল পাতাই ছিল। কিন্তু বাড়ীতে ঢুকেই মার্লে সমস্ত ভার নিজের হাতে নিয়ে বা'র-ভিতর করতে লাগল। রান্নাঘর থেকে মাছ-রাঁধার শব্দ আসতে লাগল, একটু পরে একটা প্লেটভরা লেটুস নিয়ে এসে বললে, "ইজীপ্শীয়ান্ মশায়, আপনি আরবী স্যালাড্ তৈরী করতে পারবেন কি আমাদের জন্য?

পীয়ার আমোদ অনুভব করে বলল, "বোধ হয় পারবো।"

"নুন, লঙ্কা ভিনিগার আর তেল ওই টেবিলের ওপর পাবেন, মশলার মধ্যে ওই আমাদের সম্বল। কিন্তু তা ব'লে খাঁটি আরবী স্যালাড্ হওয়া চাই কিন্তু" এই বলেই সে বেরিয়ে গেল, পীয়ার স্যালড তৈরী করায় মন দিলে।

ফ্রু ইউথোগ্ তাঁর পাংশু মুখ পীয়ারের দিকে ফিরিয়ে চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বল্‌লেন, "আশা করি আমার মেয়েটিকে ক্ষমা করবেন, বাস্তবিক ও অত চঞ্চল নয়।"

ইউথোগ্ নিজে ঘরে পাইচারি দিতে দিতে পীয়ারের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন, মিশরের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মাহ্‌দী, জেনারেল গর্ডন, খার্টুম, খিদিভ্ আর সুলতানের মনোমালিন্য

সম্বন্ধে তিনি কিছু জানতেন। তিনি যে একজন উৎসাহী সংবাদপত্র পাঠক তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। পীয়ার বুঝতে পারল যে ইনি একজন উদারপন্থী আর এঁর দলে ইনি একজন ওজনভারীলোক। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁর রাঙা চোখের পাতার নীচে একটা মস্ত আগুন ধিকি ধিকি জ্বলচে। পীয়ার ভাবলে "এঁর সঙ্গে বিরোধ করা সুবিধের কাজ নয়।"

তারা খেতে বসল। পীয়ার দেখলে যে মেয়ের হাসিঠাট্টা আর গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রু উইথোগের পাংশু আর উদ্বিগ্ন ভাবটা কমে আসছে। শেষে ম্লানগণ্ডে একটু রক্তিম আভাও যেন ফিরে এলো। চশমার আড়ালে চোখ যেন মেয়ের চোখের আলো নিয়ে উজ্জল হয়ে উঠল। তাঁর স্বামী কিন্তু এসব কিছুই লক্ষ্য করচেন মনে হলো না, তিনি সারাক্ষণ মাহ্‌দী, খিদিভ্‌ আর সুলতানের সম্বন্ধেই কথা বলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বহু বৎসর পরে নরওয়েজীয় পরিবারে পীয়ারের এই প্রথম খেতে বসা—কি ভালই লাগল! বিস্ময়ের সঙ্গে এই কথাটিই তার মনে হতে লাগল, এমন কি একখানি ঘর তার নিজের হবে কখনো?

খাওয়ার শেষে একটা ম্যাণ্ডোলিন বেরিয়ে এলো, তারা সবাই মস্ত অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে ঘিরে বসল, কিছুক্ষণ বাজনা চলল। শেষে মার্লে উঠে বললে, "মা, তোমার শোবার সময় হলো।" নম্রকণ্ঠে উত্তর এলো, "হ্যাঁ মণি—" ফ্রু ইউথোগ্‌ বিদায় সম্ভাষণ করলেন, মার্লে তাঁকে শয্যাগৃহে নিয়ে চলে গেল।

পীয়ার যখন বিদায় নেবে বলে উঠচে মার্লে আবার এসে প্রবেশ করল, বলল—"থীয়াকে নৌকোয় করে বাড়ী না পৌছে আপনি যাচ্ছেন না নিশ্চয়?"

সঙ্গিনী বাধা দিয়ে বলল, "আঃ মার্লে, ছাখ,—"

কিন্তু যখন তারা তুজন যথাস্থানে বসে নৌকা ছাড়চে, মার্লে দৌড়ে এসে বললে যে সেও যেতে পারে।

তরুণী মেয়েটিকে তীরে বাবার ওখানে নির্ব্বিঘ্নে পৌছে দিয়ে আধ ঘণ্টা পরে, আলোয় সোনালী আর ছায়ায় ঘননীল সেই সরোবরের মাঝ দিয়ে সেই নিস্তব্ধ রাত্রিবেলা মার্লে আর পীয়ার ফিরে আসতে লাগল। হালে হেলান দিয়ে, মার্লে নীরবে একটা ছোট ডাল দিয়ে পিছনের জলে রেখা টেনে আসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দাঁড় বন্ধ করে নৌকাটাকে ছেড়ে দিয়ে পীয়ার বললে, "কি সুন্দর!" তরুণী মাথা তুলে চারদিকে দেখে বললে, "হ্যাঁ!।" পীয়ার মার্লের কণ্ঠে যেন একটা নূতন সুর শুনচে মনে হলো।

মধ্য রাত্রি পার হয়ে গেছে তখন। ছড়িয়ে-পড়া কোমল অরুণালোকে পাহাড় জঙ্গল, 'সেটার' সব নির্জ্জীবের মত পড়ে রয়েচে, হ্রদের মাছেরা আর উঠছে না, ঝোপের মাঝখানে মাঝে মাঝে টার্ম্মিগ্যানের কিচিমিচি শোনা যায় শুধু।

তরুণী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "ছুটি কাটাতে ঠিক এইখানেই কেন এলেন ভেবে আমার আশ্চর্য্য লাগচে।"

"ক্রোকেন ইউথোগ, আমি দৈবের হাতেই সব ছেড়ে দিই। এমনি হয়ে গেল আর কি। এইখানটায় যেখানেই যাই কেমন নিজের বাড়ীর মত লাগে। নরওয়েতে, নিজের দেশে ফিরে এসে কি আশ্চর্য্যই লাগচে।"

"কিন্তু দেশে এসে কি আপনার নিজের লোকদের—আপনার পিতা-মাতার সঙ্গে দেখা করেন নি?"

"আমি—! আমার বাপ-মা আছে বলে কি আপনার মনে হয়?"

"কিন্তু নিকট আত্মীয়—? নিশ্চয়ই জগতে কোথাও আপনার ভাই কিম্বা বোন্ আছেন!"

"আহা যদি থাকতো! কিন্তু না থাকলেও চলে যায় একরকম।"

মার্লে তার সন্ধানী দৃষ্টি প্রেরণ ক'রে, তার কথাগুলো আন্তরিক কি না বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। পরে বলল, "আপনি জানেন না বোধ হয় যে আপনি আসার আগেই মা আপনাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন?"

"আমাকে—?" পীয়ারের চোখ বিস্ফারিত হলো—"আমার সম্বন্ধে দেখেছিলেন তিনি?"

মেয়েটির মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল, মাথা নেড়ে বললে, "এখানে বসে বসে আপনাকে কি এসব বাজে কথা বলছি আমি! এই জন্মেই কিন্তু আপনি এলে আমরা আপনার বিষয় এত জানতে চেয়েছিলাম। আমার কেমন মনে হয় যেন আমরা পরস্পরকে বহুদিন থেকে জানি।"

"ফ্রোকেন ইউথোগ, আপনি সব সময় বেশ আনন্দে থাকেন।"

"আমি? কেন, আপনার এমন মনে হবার—ও, হ্যাঁ বুঝেচি। দেখুন যখন অত্যন্ত দরকার হয় তখন মানুষের পক্ষে অনেক জিনিষই সম্ভব হয়।"

"খুব আনন্দে থাকাও?"

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তীরের দিকে তাকাল। "কোনো দিন হয়ত—আমরা যদি পরস্পরের বন্ধু হতে পারি—আমি আপনাকে এ বিষয়ে আরো বলব।"

পীয়ার দাঁড়ের ওপর ঝুঁকে নৌকা বাইতে লাগল। রাত্রির নিস্তব্ধতা তাদের পরস্পরকে নিকটে, আরো নিকটতর করে আনে আর তারা নীরব হয়ে যায়। শুধু মাঝে মাঝে পরস্পরের পানে চেয়ে তারা মৃদু মৃদু হাসে।

'এ কি অদ্ভুত জীবের সঙ্গে আমার দেখা হলো'—পীয়ার ভাবে।

মেয়েটির বয়স প্রায় একুশ বাইশ হবে। মেয়েটি মাথা নীচু করে সেখানে বসে রইল, ওই মৃদু আলোকে মেয়েটির মুখের ওপর এক আশ্চর্য্য স্বপ্নময় জ্যোতিঃ ফুটে উঠল। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটির দৃষ্টি ফিরে পীয়ারের ওপর এসে নিবদ্ধ হলো, তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পীয়ার দেখতে পেল মেয়েটির মুখটি বড়, ঠোঁট দুটি বেশ পরিপুষ্ট আর লাল।

মেয়েটি বললে, "আপনার মত আমারও সমস্ত দুনিয়াটা দেখতে ইচ্ছা যায়।"

পীয়ার প্রশ্ন করে, "ফ্রোকেন ইউথোগ, আপনি কি কখন বাইরে যাননি ?"

"একবার শীতকালটা বার্লিনে কাটিয়েছিলাম, আর কয়েক মাস দক্ষিণ জার্ম্মাণীতে। একটু বেহালা বাজাতে শিখছিলাম কি না; ভেবেছিলাম বিদেশে গিয়ে ওইটা ভালো করে শিখবো আর ওই নিয়েই যা-হোক কিছু করবো, কিন্তু—"

"বেশ তো, কর্চ্চেন না কেন ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে, "আমার মনে হয় একদিন আপনি নিশ্চয়ই জানবেন, সুতরাং এখনি তা আপনাকে বলে ফেলা ভাল। মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"মাই ডিয়ার ফ্রোকেন—"

"মা যখন বাড়ীতে থাকেন তখন তাঁকে কতকটা আত্মস্থ রাখবার জন্য আমার খুব স্ফূর্ত্তিতে থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।"

পীয়ারের ইচ্ছা হলো উঠে মেয়েটির কাছে যায়, তার মাথাটি দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বিষণ্ণ হাসি হেসে মেয়েটি চোখ চাইলে, বহুক্ষণ তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে, মেয়েটি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে ভুলে গেল।

শেষে সে বলল, "আমাকে এখুনি তীরে যেতে হবে।"

"এত শিগগীর! আমরা তো এই মাত্র কথা কইতে সুরু করেচি।"

সে আবার বললে, "আমায় এখুনি তীরে যেতে হবে।" সে কণ্ঠস্বর তখনো নম্র হলেও তার বিরুদ্ধাচরণ চলে না।

অবশেষে পীয়ার একলা তার 'সেটারে' নৌকা বেয়ে চললো। নৌকো বেয়ে যেতে যেতে সে দেখতে লাগল মেয়েটি ধীরে ধীরে কুটীরের দিকে উঠে যাচ্চে। দোরের কাছে পৌঁছে তবে সে প্রথম মুখ ফিরিয়ে পীয়ারের দিকে চেয়ে হাত নাড়তে লাগল। তার পর মুহূর্ত্তকাল তার দিকে চেয়ে থেকে, দোর খুলে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। পীয়ার আরো কিছুক্ষণ দোরের পানে চেয়ে রইল, আবার দোর খুলবে এই যেন তার আশা, কিন্তু আর কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখা গেল না।

পূব দিকের সেই দূরের পর্ব্বত-শ্রেণীর ওপর দিয়ে সূর্য্যের রেখা দেখা দিল, উত্তর আর পশ্চিমের শুভ্র চূড়াগুলো প্রভাত আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পীয়ার আবার দাঁড় টানা বন্ধ করে, হাঁটুতে কনুই রেখে, মাথাটাকে দুহাতের মাঝে ধরে চুপ করে রইল। আজ এই যে-সব হলো, এ কি?

সে এখানে এমন একা আর শান্তিহীন, তবু চারিদিকের পর্ব্বত-চূড়াগুলো কেমন করে এত আলগা নিঃসম্পর্ক আর উদাসীন হয়ে আছে?

কানের ভেতর দিয়ে এ কি অভিনব প্রবাহ হয়ে যায়? ধমনীতে এ কি নূতন ছন্দ? হাত-বালিশ করে সে নৌকার মাঝে শেষে শুয়ে পড়ল, নৌকা ভেসে যেতে লাগল,—সব ভেসে যেতে লাগল।

উদীয়মান সূর্য্যের তির্য্যক রশ্মি এসে নৌকার মাঝে যখন তার মুখের উপর ঝলমলিয়ে পড়ল, তখন পীয়ার শুধু একটু মাথা ফিরিয়ে নিলে, তার সর্ব্বাঙ্গে এসে সূর্য্যালোক পড়ল।

এখন মার্লে ওই ওখানে ঘুমিয়ে আছে, প্রভাতের অরুণালোক তার বাতায়ন দিয়ে এসে পড়েচে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার স্বপ্ন দেখচে সে?

অমন ভুরু এর পূর্ব্বে আর কখনো কি সে দেখেচে? ওই ভুরুর পরে ঠোঁটের পরশ—ওই মাথাটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরা……ওগো তরুণী, তা হলে তুমি তোমার মাকে রক্ষা করবার জন্য তোমার নিজের স্বপ্ন-সাধ বিসর্জ্জন দিয়েচ, ওই যে তোমার মাঝে আনন্দ-শিখাটিকে জ্বালিয়ে রেখেচ সে শুধু তাঁর শীতক্লিষ্ট অন্তরকে তাপ দেবার জন্য? এই কি তোমার স্বরূপ?

মার্লে—এমন ধারা নাম কি কারু হয়? তোমার নাম মার্লে?

আকাশের ওপর দিবস বিস্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে; রাতের ছোট-বড় সব মেঘগুলো সোনায়-লালে রঙিয়ে যায়। আর পীয়ার এখানে শুয়ে শুয়ে দোলে আর দোলে হ্রদের বুকে নয়, উচ্ছ্বসিত সাগরের দোলায়িত অরুণ-বক্ষে।

ও-হো, এত দিন তোমার মন যন্ত্র-বিজ্ঞানের নীরস আঁক-জোকের হিসাব দিয়ে ভরা ছিল, শুধু ইস্পাত আর আগুন দিয়ে! সেখানে ছিল কেবলি আরো বেশী জ্ঞানলাভের কামনা, সব জানবার, বোঝবার, সব আপনার শক্তির আয়ত্ত করবার এক দুরন্ত প্রয়াস! ওদিকে কিন্তু প্রার্থনার সুরটি তোমার অন্তরে বিলীন হয়ে গেল, শুধু সর্ব্ববস্তুকে অতিক্রম করে যা রয়েচে তার ক্ষুধা উগ্র হতে উগ্রতর হয়ে চলল। তুমি ভেবেছিলে তোমার অন্তরে নরওয়ের প্রয়োজন জাগ্রত হয়েচে; এই তো এসেচ এখানে। ক্ষুধা মিটে গেল কি?

মার্লে—তোমার নাম মার্লে, না?

এমন কিছুই নেই, ভালবাসার প্রথম দিনের সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে। তোমার সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত ভ্রমণ, সমস্ত কর্ম্ম আর স্বপ্নকে

বোঝাই করা জ্বালানি কাঠের মত এতকাল টেনে নিয়ে বেড়িয়েচ শুধু। আজ এসেচে সেই অগ্নিশিখা যার স্পর্শে সব জ্বলে উঠল—স্বর্গ-মর্ত্ত্যে তার অরুণদ্যুতিকে বিস্তার করে দিয়ে। তাই হিমার্ত্ত হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে তাদের তপ্ত করতে করতে আনন্দে কাঁপচ আর মনে হচ্চে পৃথিবীতে এক অভিনব আনন্দের আবির্ভাব হলো।

এতদিন যা-কিছু তুমি বুঝতে পারছিলে না—তোমার অন্তরাত্মার অমর জ্যোতিঃশিখা, উর্দ্ধে সেই মহাশক্তি আর এই অসীম আকাশের সম্বন্ধ আজ অকস্মাৎ এত স্পষ্ট হয়ে উঠেচে যে, সেই অনন্ত রহস্যের একেবারে তলদেশ পর্য্যন্ত দেখতে পেয়ে তুমি আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠচ।

শুধু তার হাতটি হাতে নিয়ে দাঁড়ানো আর জীবন-মৃত্যু শক্তিপুঞ্জকে বলা 'এই তো আমরা দুজন—এই সে আর এই আমি—আমরা যুগল'—অমনি তোমার স্তব-সঙ্গীত ছোট্ট লুইসের বেহালার সুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে উর্দ্ধে উধাও হয়ে যাবে—কোনো গির্জ্জার ছাদের পানে নয়, একেবারে অসীম আকাশের মাঝে। হে মহাশক্তিমান্, এতদিনে আমি তোমায় বুঝতে পারচি। তুমি উর্দ্ধে বসে পাপ আর কৃপা নিয়ে খেলা করচ এমন ধারণা তোমার সম্বন্ধে আমি কি করে করতে পেরেছিলাম! কিন্তু এখন আমি তোমায় দেখতে পাচ্চি, তুমি তো রক্তপিপাসু জিহোভা নও, তুমি তরুণ, সোনালি তোমার অলকগুচ্ছ, জ্যোতির্ম্ময় তোমার স্বরূপ! আমরা দুজন তোমায় পূজা করি, প্রার্থনার আর্ত্তধ্বনি দিয়ে নয়, এক মহান্ স্তব-সঙ্গীত দিয়ে, যার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব মিলিত হয়েচে। আমাদের সব শক্তি, সব জ্ঞান, সব স্বপ্ন, তার মধ্যে সম্বৃত হয়েচে; প্রত্যেকে নিজ নিজ যন্ত্রে এই বিশাল বাহিনী-সঙ্গীতে নিজের সুরটি মিলিত করেচে। ওই যে আকাশের ওপর অরুণায়মান ঊষা সে

আমাদের সঙ্গিনী ; ওই যে উত্তরের পাহাড়ের গায়ে ছাগলটা তৃণাহার করচে আর পূবের পানে মুখ ফেরাতেই ওই যে সোনালী রৌদ্রে উজ্জল হয়ে উঠচে, ও-ও আমাদের সঙ্গী। জাগ্রত বিহঙ্গেরা আমাদের সঙ্গী। ওই যে ব্যাঙটা জলের মাঝ থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এসে প্রভাতের পানে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রয়েচে, সেও আমাদের সাথী। ওই ছোট্ট পোকাটাও, যার ডানায় হীরক জ্বলচে আর ওই ঘাসের শীর্ষটা যার ওপর মুক্তার মত শিশির বিন্দুটি ওই আকাশকে আপনার মধ্যে যতখানি সম্ভব প্রতিবিম্বিত করবার চেষ্টা করচে—এরা সব সেখানে এসেচে, ওই মহাসঙ্গীতে যোগ দিয়েচে! প্রেমের প্রথম দিবসের কোলে আমরা সবাই অবস্থান করচি। ওখানে কৃপা সংশয়, বিশ্বাস কিম্বা সহায়তা এসব কোনো কথাই উঠতে পারে না আর; আছে শুধু এক প্রবল সঙ্গীত-ধ্বনির প্রবাহ যা আমাদের সকলের হৃদয়ের সুবর্ণনদী থেকে আকাশের পানে উধাও হয়ে চলেচে।

"সেটার"গুলো সব জেগে উঠতে লাগল, গলার ঘণ্টা দুলিয়ে আর হাম্বাধ্বনি করতে করতে পশুপালেরা "সেটারের" মেয়েদের তাড়া খেয়ে উত্তরের পাহাড়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে, আর সেই মধুর ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিত হয়ে আসতে লাগল। পীয়ার তবু সেইখানেই শুয়ে রইল, কিন্তু ঠিক তখন "সেটারের" গয়লানী সরোবরে ভাসমান শূন্য নৌকা দেখতে পেয়ে কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল।

পীয়ার তবু স্পন্দহীন হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল মার্লে, তোমার নাম কি মার্লে?

ততক্ষণে গয়লানী জলের ধারে নেমে এসে নৌকার দিকে লক্ষ্য করে ডাকাডাকি সুরু করেচে। শেষটায় সে দেখতে পেল, একটা লোক উঠে বসে চোখ রগড়াচ্চে।

তবু যাহোক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি এখানে রয়েছেন। সারাটা রাত আপনার দেখা নেই!

একটা ছাগলের পা গিয়েছিল ভেঙে, স্পি্লণ্ট দিয়ে পা-টা বেঁধে পায়ের হাড়টা ঠিক জায়গায় না বসা পর্য্যন্ত তাকে খোঁয়াড়ের আশে পাশে বাড়ির ভেতরে বাইরে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হয়েছিল। পীয়ার ওকে কিছুক্ষণের জন্য কোলে তুলে নিয়ে বেড়াতে লাগল, আর ও-ও তার দাড়ি নিয়ে তৎক্ষণাৎ চিবোন সুরু করল। যখন সে প্রাতরাশের জন্য বসে পড়ল তখন মাখন রুটি আর কফির পানে চেয়ে তাদের পরে এমনি করুণার্দ্র হয়ে উঠল যে তার মনে হতে লাগল এমন সব বস্তুকে গলাধঃকরতে হলে হৃদয়টাকে প্রস্তর-কঠিন করা দরকার। তারপর যখন বৃদ্ধা মেয়েলোকটি তাকে বললে যে বাস্তবিক পক্ষে পীয়ারের কিছু খাওয়া দরকার তখন পীয়ার লাফিয়ে উঠে দুহাত দিয়ে যতদূর সম্ভব তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে বসল। আপনাকে মুক্ত করবার জন্য সংগ্রাম করতে করতে সে বলতে লাগল 'বেশ ব্যবহার যা হোক!' কিন্তু পীয়ার যখন শেষটায় মেয়ে লোকটির কপালে একটি সশব্দ চুম্বন বসিয়ে দিলে তখন সে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল 'নচ্ছার মিনসে, কাল রাত্তিরে মাথাটি খুইয়ে এসেচে!'

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটা প্রকাণ্ড হ্রদের তীরে রিঙ্গেবি; যে সব সহরে প্রথম ঝরণার পাশে একটা করাতের মিল আর আটার কল মাত্র ছিল এবং গত পঞ্চাশ বছর তা থেকে ব্যস্ততাময় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, এ-ও তাদের একটি,—এখন নদীর ধারে ধারে বেশ এক রাশি নব্য ফ্যাক্টরী ছড়িয়ে গেছে, এখন এর লোক-সংখ্যা প্রায় চার হাজার: গির্জাঘর রয়েচে,

প্রকাণ্ড একটা স্কুল-বাড়ী হয়েচে, আর সব দিকেই এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রয়েচে শ্রমিকদের অজস্র হলদে হলদে বাড়ী। এ-সব ছেড়ে দিলে রিজেবি প্রায় যে-কোনো ছোট সহরেরই মত। দুজন আইন-ব্যবসায়ী আছেন—যাঁরা আইন-সংক্রান্ত কাজের টুক্‌রো নিয়ে দ্বন্দ্ব-মত্ত; স্থানীয় কাগজের দুজন সম্পাদক আছেন—যাঁরা নিয়তই সালিসী আদালতের সামনে হাজির। আর আছে একটি মদ্যপান-নিবারিণী সভা, একটি শ্রমিক সমিতি, একটি গির্জ্জা এবং একটি পিক্‌চার প্যালেস্। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে রিজেবির ভালো মানুষ নাগরিকেরা তাদের সহধর্ম্মিণীদের হাত ধরে ফিয়র্ডের ধারে বেড়াতে যায়। তখন বেশীর ভাগ পুরুষেরা ফ্রককোট আর ধূসর বর্ণের ফেল্ট্ হ্যাট পরে; ট্যানার এনেবাক্ কিন্তু কুঁজো হবার দরুণ লম্বা সিল্ক হ্যাটই বেশি পছন্দ করে থাকে, কারণ তাতে তাকে একটু লম্বা দেখাতে পারে।

শনিবার অপরাহ্নে যখন গোধূলি নেমে আসে, যুবকেরা নানারকমের সাপ্তাহিক খবরাখবর নিয়ে আলোচনা করবার জন্য হামেরের দোকানের বাইরের কোণটায় এসে মিলিত হয়।

ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার লোভ্‌লি তার দিকে সমাগত টেলিগ্রাফিষ্ট বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে, 'তাজা খবর শুনেচ?'

'খবর? এই হতভাগা জায়গায় আবার কখনো কোনো খবর থাকে, বলতে চাও?'

'মার্লে উথোগ পাহাড় থেকে বিয়ে ঠিক করে ফিরে এসেচে।'

'বাহাদুর মেয়ে! বুড়ো কি বলচে?'

'ও, নতুন টিম্বার মিলটাকে মুঠোর মাঝে আনতে হলে বুড়োর তো এক জন ইঞ্জিনীয়ার দরকার হবেই।'

"ও লোকটা বুঝি ইঞ্জিনীয়ার?"

"ইজিপ্ট থেকে এসেচে। নিশ্চয়ই মুসলমান হবে। রঙটি কফি-বেরির মতো কটা আর টাকার কুমীর।

"ক্রোকেন বুল, শুনচেন কথাটা? এক মিনিট, আপনার জন্যে সংবাদ আছে।"

উদ্দিষ্ট মেয়েটি ফিরে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, বলে—'ওঃ আবার বোধ হয় সেই একই কথা যা সারা সহরে চলচে! যাক্ আপনাদের বলতে পারি, লোকটি ভয়ানক চমৎকার।'

টেলিগ্রাফিষ্ট ফিস্‌ফিসায়, 'শ্-শ'। ঠিক তখুনি পীয়ার হল্‌ম্ ধূসর পোষাক প'রে কালো কোট বাহুতে ঝুলিয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে। কোণের এই মণ্ডলীটির পাশ দিয়ে লঘুপদে যেতে যেতে সবে-ধরানো সিগারটা টানবার চেষ্টা করে। রাস্তাটায় একটু এগিয়েই মার্লে'র দেখা হয়, তাকে সঙ্গে করে দুজন তারা এগিয়েই যায়, আর কোণের তরুণ মণ্ডলীটি তাদের পানে তাকিয়ে থাকে।

"কবে হবে?"—টেলিগ্রাফিষ্ট প্রশ্ন করে।

ক্রোকেন বুল বলে, 'আমার বিশ্বাস লোকটি এখুনি বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমার মনে হয়, গির্জ্জা থেকে নোটিশ না হওয়া পর্য্যন্ত আর আর লোকের মতো তাদেরও অপেক্ষা করতে হবে।"

লোরেঞ্জ ডি উথোগের লম্বা হলদে কাঠের বাড়ীখানা বাজারের চকের ঠিক সমুখে। বড় লোহার কারবারীর দোকানটা আর আপিস নীচের তলায়, আর ওপরতলাগুলোতে থাকার জায়গা। লোকেরা বলাবলি করে 'এইখানে তিনি থাকেন।' সেই বিশাল কাঁচা-পাকা দাড়ি লোকটি যখন রাস্তা দিয়ে যান, তারা বলে, 'ওই তিনি যাচ্চেন।' সত্যি কি তিনি এতই বড় লোক? যদিচ তাঁর একটা করাতের মিল্ল একটা মেশিনের দোকান, একটা আটার কল এবং সহরের থেকে কিছু

দূরে একটা বাগান-বাড়ী আছে তবু তাঁকে বাস্তবিক ধনী বলা চলে না। তবু এই সর্দ্দার গোছের মানুষটির মধ্যে যেন কেমন একটা ঐশ্বর্য্য রয়েচে। পাদ্রী পুরোহিতদের ইনি ঘৃণা করেন। ইনি গভীর দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করেন, পরিবারের সকলকে গির্জ্জায় যেতে নিষেধ করেন। বিয়র্ণসন স্বয়ং এঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। যার দিকে ইনি থাকেন তার পক্ষে যেমন কল্যাণ তেমনি আবার ইনি যার বিপক্ষে যান, তার পক্ষে ভীষণ; তার এই সহর থেকে একেবারে সরে পড়াই উচিত। যা-কিছু হবে সব-তাতেই এঁর হাত থাকবে, সমস্ত সহরের মালিক বললেও চলে এঁকে। শোনা যায় যে, একবার ইনি রাস্তায় একটি যুবককে—যার সঙ্গে কথনো পূর্ব্বে ইনি কথা পর্য্যন্ত বলেন নি, আদেশ করে বলেছিলেন, "বুঝেছ হে ছোক্‌রা, তুমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করবে।" রিঙ্গেবির এত সত্ত্বেও কিন্তু লোরেঞ্জ উত্যোগ পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে নেই। লোকদের চেয়ে ইনি অনেক ওপরে সত্য, কিন্তু ইনি চান এর শতগুণ বৃহৎ জায়গার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হতে।

এখন এই জামাতাটিকে পেয়ে, বৃহৎ জগৎ থেকে আসা এই অপরিচিত লোকটিকে ইনি কেবলি নিঃশব্দে ঘুরে-ফিরে চারদিক থেকে দেখচেন আর মনে মনে প্রশ্ন করচেন, "আসলে তুমি কে হে? কি দেখেচ তুমি? কি পড়েচ? উন্নতি-বাদী তুমি, না সংরক্ষণশীল? এখানে আমি যা-কিছু করেচি তাকে তুমি ঠিক মর্য্যাদা দিচ্ছ কি, না মুখ লুকিয়ে কেবলি হাসচ আর আমায় 'বাঘ নাই বনে শেয়াল রাজা', মনে করচ?"

প্রতি প্রভাতে হোটেলের ঘরে পীয়ারের যখন ঘুম ভাঙে সে চোখ রগড়ায়। শয্যাপার্শ্বে টেবিলের ওপর একটি তরুণীর ফটোগ্রাফ। এঁ্যা, পীয়ার, সত্যি কি তুমি শেষকালে একজনকে পেলে যে তোমার

সাথী হবে। এই দুনিয়ায় এমন একজন যে তোমার জন্য ভাববে। তোমার সর্দ্দি লাগলে লোকেরা এখন তোমায় দেখতে আসবে, উদ্বিগ্ন হয়ে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করবে। তোমার ভাগ্যে এও ছিল তা হলে!

রোজই সে উথোগের ওখানে খায়, তবে থালাটির পাশে সব সময়ই ফুল থাকে, প্রায়ই আবার ছোট ছোট বিস্ময়—হয়তো একটা রূপার চামচ, কিম্বা কাঁটা, কিম্বা তার নাম-লেখা ন্যাপকিন—এ যেন নতুন বাসা তৈরীর প্রথম খড়-কুটা সংগ্রহ। চশমা-পরা ফ্যাকাশে মহিলাটি সদয় দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে থাকেন, মনে হয় যেন বলচেন, 'তুমি তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্চ, কিন্তু আমি ক্ষমা করচি তোমায়।"

একদিন হোটেলে বসে যখন সে পড়চে মার্লে এসে উপস্থিত।

"একটু বেড়াতে যাবে?"—মার্লে জিজ্ঞাসা করে।

"বেশ কথা। আজ কোথায় যাই বলতো?"

"ক্রসেথে পিসীমার সঙ্গে তো এখনো আমাদের দেখা করতে যাওয়া হয়নি, বাস্তবিক আমাদের যাওয়া উচিত কিন্তু, বুঝলে? আজ তোমায় সেখানে নিয়ে যাব।"

এই সব নূতন আত্মীয়দের সঙ্গে এই সব প্রথাগত দেখা-সাক্ষাৎ পীয়ারের ভারি মজার লাগে; সে যেন মাসী-পিসীদের সংগ্রহ করে বেড়াচ্চে। আজ আর একটি নতুন পিসী জুটবে। বেশ তো, আপত্তি কি?

"কিন্তু মণি—তুমি কি কেঁদেচ?" অকস্মাৎ পীয়ার মার্লের মাথাটি দুহাতে ধরে জিজ্ঞাসা করে।

'ওঃ, এ কিছু নয়। চল যাই এখন'—এই বলে চুম্বনোদ্যত পীয়ারকে ধীরে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চেয়ারে বসে পড়ে আর আধ বোজা চোখে চিন্তিত ভাবে তার দিকে চেয়ে থেকে, খুব ধীরে ধীরে

মাথা নাড়ে। সে যেন আপন-মনে প্রশ্ন করে, "কে এই মানুষটি? এ কি দায়িত্ব আমি আমার ওপর তুলে নিচ্ছি। পনেরো দিন আগে সে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত—"

কপালের ওপর হাতটা বুলিয়ে সে বললে—"মার জন্যে—বুঝেচ?"

"আজ কি বিশেষ কিছু খারাপ হয়েচে?"

"এক নিমেষে তুমি আমার বাইরের জগতে নিয়ে চলে যাবে, তাই মার বড় ভয়!"

"কিন্তু আমি তো তাঁকে বলেচি, যে আপাততঃ আমি এখানেই থাকব।"

প্রায় চোক বুজেই মুখের একটা দিকে হাসি ফুটিয়ে মার্লে বলল—"আমার কি হবে তা হলে! এই দীর্ঘকাল এখানে থাকতে থাকতে জগতে বেরিয়ে পড়বার জন্যে আমি যে পাগল হয়ে উঠেচি!"

পীয়ার হেসে বলে উঠল—"আর আমি যে বাড়ীতে থাকবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেচি! এতকাল পরে গৃহসংসারের মাঝখানে নিরিবিলি শান্তিতে থাকতে পাবো, বড় সুন্দর হবে!"

"কিন্তু আমার কি হবে, তা হ'লে?"

"তুমিও সেখানে থাকবে। তোমায় আমি আমার কাছেই থাকতে দেবো।"

"ওঃ, কি যে বোকার মত কথা বলচো আজ তুমি! তুমি এর মানেটাও বুঝতে পারচ না, এই গর্ত্তের মাঝখানে যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছর ক'টাকে খোয়ানো! আর তা ছাড়া—গান শিখতে পারলে আমি তাতে কিছু করতেও পারতাম—"

হাসবার মতোই কপালটাকে কুঁচকে পীয়ার বললে, "তা, তাহলে বেশ তো চল বেরিয়ে পড়া যাক্।"

"দূর! তুমি জান মাকে ছেড়ে এখন যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছিলে। কারণ, আমি ঠিক তখন কেবলি মনে মনে কামনা করছিলাম কেউ আসুক, আমায় এসে নিয়ে যাক্।"

"আ—হা—আমি তা হলে তোমার ভ্রমণ-যাত্রার একরকম টিকিট হয়েচি বল!" পীয়ার এগিয়ে এসে নাকে চিমটি কাটে।

"সাবধান বলচি! আমি এখনো কিন্তু বাস্তবিক তোমায় কথা দিই নি বুঝেচ?

"কথা দাও নি? সত্যি বলতে গেলে তুমিই তো প্রস্তাব করেছিলে?"

হাতে হাত চাপড়ে মার্লে ব'লে উঠল, "কি নির্লজ্জ আস্পর্দ্ধা! দিনের পর দিন 'না', 'না' বলার পর এই কথা? কতবার বলি নি, আমি করবো না, করবো না, করবো না? আর তুমি বলেছিলে, তাতে কিছু যায় আসে না, আমি করবো; তুমি অত্যন্ত অন্যায় ভাবে আমাকে ফাঁদে ফেলেছিলে, কিন্তু এখন তুমি তোমার পথ দেখ।"

ব'লে পরমুহূর্ত্তেই মার্লে পীয়ারের গলা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু পীয়ার তাকে চুম্বন করতে উদ্যত হলে, তাকে আবার সে সরিয়ে দিয়ে, বল্‌ল, "ভেবো না আমি ওজন্যে এই করলাম!"

তার পর তারা বাহুতে বাহু বেঁধে গ্রাম্য পথ ধরে ক্রসেথে মারিট পিসীর ওখানে পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। সেপ্টেম্বর মাস, বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতটা হল্‌দে রঙ ধরেচে, শস্যক্ষেত্র সোনার রঙে রঙিয়ে গেছে, আর বেরীফল রক্ত-লাল হয়ে উঠেচে। বাতাসে তবু কিন্তু গ্রীষ্মের আভাস পাওয়া যায়।

মার্লে হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে চীৎকার করে উঠল, আঃ—কি যে তাড়াতাড়ি তুমি চল!

একটা ফটকের পাশে এসে পথ-পার্শ্বে ঘাসের উপর তারা বসে পড়ল। তাদের নীচে তখন ক্ষেত আর গোলাবাড়ীর বিস্তীর্ণতার মাঝখানে ফ্রেমে-বাঁধা ছবির মতো হ্রদটা ঝিক্‌মিক্ করছিল, আর তারই পাশে সহরটা তার বাড়ীর ছাদ আর চিমনি সহ দেখা যাচ্ছিল।

"মার এই যে অবস্থা, এ কি করে হয়েচে জান?" হঠাৎ মার্লে জিজ্ঞাসা করল।

"না, আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই নি।"

মার্লে ঠোঁট দিয়ে একটা ঘাস চেপে ধরল।

"মার বাবা একজন পাদ্রী ছিলেন। তার পর যখন—যখন বাবা মাকে গির্জ্জায় যেতে মানা করলেন, মা তাঁর কথা শুনলেন। কিন্তু তার পর থেকে মার আর ঘুম হলো না, তাঁর মনে হতে লাগল যেন তিনি তাঁর আত্মাকে বেচে ফেলেচেন।"

"তোমার বাবা তাতে কি বলবেন?"

"বললেন ও হিষ্টিরিয়া। কিন্তু হিষ্টিরিয়া হোক আর নাই হোক মার ঘুম আর এলো না! শেষে মাকে পাগলা গারদে রাখতে হলো।"

মার্লের হাতটি হাতে নিয়ে পীয়ার বললে, "আহা—বেচারী"।

"তার পর যখন মা ফিরে এলেন সেখান থেকে, তাঁর এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল যে চেনাই মুস্কিল। বাবা একটু নরম হলেন, তাঁর পক্ষে আশাতিরিক্ত রকমই, বললেন 'তা, তা বেশ, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো নিশ্চয়ই তুমি গির্জ্জায় যাবে, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে না গেলে কিছু মনে করো না।' তখন একদিন রবিবারে তিনি আমার হাত ধরলেন, আমরা দু'জন একসঙ্গে চললাম। কিন্তু যখন গির্জ্জা-দ্বারে পৌঁছে ভিতরে অর্গ্যান বাজচে শুনলাম, মা ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন,

'না, আর সময় নেই, মার্লে, বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে।' তার পর আর কখনো মা সেখানে যান নি!"

"তার পর থেকে বুঝি সব সময়ই তিনি—ওই রকম?"

মার্লে'র দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। "এর সব চাইতে খারাপ হচ্চে এই যে মা সব সময়ই দেখেন যেন নানা রকমের অমঙ্গল তাঁকে ঘিরে রয়েচে। তিনি বলেন, একমাত্র উপায় হচ্চে এদের হেসে তাড়ানো। কিন্তু তিনি নিজে হাসতে পারেন না। তাই আমাকে হাসতে হয়। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে চলে যাব, ওঃ—তখন আর আমি এর কথা ভাবতেও পারি না।"

মার্লে পীয়ারের কাঁধে মাথা লুকায়। পীয়ার তার চুলে হাত বুলায়।

এক-পেশে হাসি হেসে মার্লে পীয়ারের দিকে চেয়ে বলে, "আচ্ছা পীয়ার বলতো, কে ঠিক, মা, না, বাবা?"

"ওই সমস্যা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ বুঝি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এ যে একেবারে দুরাশা। কোনো রকম নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে একেবারেই অসম্ভব; তুমি কি ভাব? পীয়ার, বল তো তোমার কি মনে হয়?"

সোনালি হেমন্ত দিনে তারা নিভৃতে একা বসে আছে, মার্লে'র মাথাটি পীয়ারের কাঁধের ওপর ন্যস্ত। এখানে অস্পষ্ট কথা ব'লে মার্লেকে ঠকিয়ে শ্রেষ্ঠতার ভাণ করবার কি প্রয়োজন?

"প্রিয় মার্লে, বাস্তবিক আমি তোমার চাইতে বেশী কিছু জানি নে। এক সময় ছিল, যখন আমি মনে করতাম, ভগবান্ এক হাতে দণ্ড আর এক হাতে চিনির কেক্ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নিত্যকালের জন্য সমুচিত পুরস্কার আর দণ্ড বিধান করচেন। তার পর সেই ভগবানকে আমি

দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েচি, কারণ আমার মনে হলো তিনি অত্যন্ত অন্যায়কারী—তার পর শেষে তিনি উর্দ্ধে সৌরমণ্ডলের মধ্যে আর নিম্নে ধরণীর অণুতম সৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। এই সবের সামনে আমার জীবন কি, আমার স্বপ্ন কি? আমার সুখ-দুঃখের কোন্ মূল্য? কোথায় আমি চলেচি? নিত্য নিয়ত কে যেন আমার মধ্যে বলতে লাগ্‌ল, তিনি আছেন! কিন্তু কোথায়? যা-কিছু আমরা জানি সেই-সবকে ছাড়িয়ে সেই সবের অন্তরালে কোথাও—সেইখানে তিনি আছেন। সেই জন্য সঙ্কল্প করলাম, আমি জ্ঞান অর্জ্জন করবো, আরো জানবো, আরো জানবো, আরো—আরো—তাতে ক'রে বেশি জ্ঞানী হতে পারলাম কই? ধর ষ্টীম-হাতুড়িতে আমার মাথা একদিন গুঁড়িয়ে গেল—এই যে আমি বিজ্ঞান আর সভ্যতা আর উন্নতির জন্য আমার শক্তিটুকু নিয়োগ করলাম, তার কি হলো? আমি কি একটা পিঁপড়ে আর মাছির মতই আকস্মিক ঘটনা মাত্র! আমার কি এর চাইতে বেশি কোনো অর্থ ই নেই! ওই পিঁপড়ে আর মাছির মতই কি আমিও চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত না রেখে মিলিয়ে যাই! মার্লে-মণি, আমায় তার উত্তর দাও দেখি, তুমি কি ভাব?"

মৃদু নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে, মুদিত নয়নে মেয়েটি নিশ্চল হয়ে বসে রইল। তার পর তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল—সুপুষ্ট অরুণ অধর দুটি তার শেষে একটি চুম্বনে রূপান্তরিত হলো।

ক্রসেথ হচ্চে সহরের অনেকটা ওপরে একটা প্রকাণ্ড খামার-বাড়ী। সাদা বাসভবনের চারদিকে লম্বা বারান্দা, ছায়া-ঢাকা পথ আর বাগান। সেখান থেকে হ্রদের ওপর দিয়ে চারদিকে দূরবিস্তৃত গ্রাম্য-দৃশ্য কি সুন্দর দেখায়। তারা দু'জন মুহূর্ত্তের জন্য ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে রইল।

মার্লে'র পিসীমা একটি বিধবা, সম্পত্তিশালিনী এবং পরিচালিকা হিসেবে বেশ দক্ষ—যদিচ কতকটা খামখেয়ালী মেজাজের,—একদিন যেমন খুব দাতা হয়ে উঠতে পারেন, আরেক দিন তেমনি কৃপণ। তাঁর জীবনের দুঃখ এই যে, তাঁর কোনো সন্তান নেই, আজো তিনি ঠিক করে উঠতে পারেন নি যে কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে।

যেখানে তরুণ যুগল অপেক্ষা করছিল সেই ঘরে পাল উড়িয়ে তো তিনি এসে ঢুকলেন; পীয়ার তাকিয়ে দেখল দীর্ঘাকৃতি পীনবক্ষা একটি মহিলা, চুলগুলো পাকা আর রঙটি টকটকে লাল। পীয়ার ভাবলে, ওহো, পিসী তো নয়, পিসীর বাবা পেয়েচ এবার! নীল ওড়নাটা ফেলে দিতেই দেখা গেল পরণে তাঁর কালো পশমী গাউন, গলায় সোনার চেন আর লম্বা লম্বা সোনার ইয়ারিং।

তিনি বল্লেন, "যাক্ শেষটায় আসাই স্থির করেচ। কি মার্লে, বাস্তবিক আমি যে আছি সেটা তাহলে সত্যি মনে পড়েচে?" তার পর পীয়ারের দিকে ফিরে কোমরে হাত দিয়ে পরখ করতে করতে বল্লেন,"তা হলে তুমিই হচ্চ পীয়ার? তুমিই মার্লেকে শেষে ধরলে? যাক, জ্যাখো, আমি তোমায় পীয়ার বলেই সোজাসুজি ডাকচি, কোথাকার সেই আরব দেশ না কোথা থেকে এসেচ বলে আর কি করি! বসো, বসো।"

সুরা আনা হলো। ক্রুসেথের মারিট পিসী যুগলের পানে গ্লাস তুলে ধরে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনোদ্দেশে এই মন্তব্যটি প্রকাশ করলেন।

"তোমাদের মাঝে ঝগড়া-কোন্দল অবশ্যি হবেই, কিন্তু ও নিয়ে বাড়াবাড়ি না করলেই হলো। পীয়ার হল্‌ম্, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন, যদি তুমি ওকে ভাল করে না রাখ, তা হলে কোনো শুভদিনে গিয়ে কানটি মলে দিয়ে আসবো। তোমাদের স্বাস্থ্য কামনা করচি, বাছারা!"

বাহুবদ্ধ যুগল বাড়ীর পথে চললো পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে আনন্দে গান গেয়ে নাচতে নাচতে, কিন্তু হঠাৎ তখনো সহর থেকে তারা কিছু দূরে, মার্লে থেমে ইঙ্গিত করে কানে কানে বলল, "ওই—ওই মা!"

একটি নিঃসঙ্গ রমণী একটা বিস্তৃত ফসল-কাটা ক্ষেতের ওপর দিয়ে, চারিদিকে চাইতে চাইতে সন্ধ্যালোকে ধীরে ধীরে চলেচেন। এখানে যেন কিসের, যেন অনেক বিষয়ের অর্থটিকে সন্ধান করে বার করবার উদ্দেশ্যে ইনি প্রতীক্ষা করচেন। থেকে থেকে আকাশের দিকে তাকাচ্চেন, কখনো নীচে সহরের দিকে, কখনো পথ দিয়ে যে-সব লোক যায় তাদের দিকে—তার পর মাথা নাড়চেন। যেন অনন্ত দূরে রয়েচেন ইনি, মানুষের কোলাহলময় কর্ম্মজগতের সঙ্গে এঁর যেন একটুকু পরিচয় নেই। কি ইনি দেখচেন? কি ভাবচেন?

মার্লে পীয়ারকে কাছে টেনে চুপি চুপি বললে, "চলো আমরা যাই।" তরুণী মেয়েটি হঠাৎ যেন উৎসাহে উদ্বেলিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে গান গাইতে সুরু করল। পীয়ার অনুমানে বুঝতে পারল এ হচ্চে তার মার জন্যে, বোধ হয় ওই নিঃসঙ্গ রমণীটি ওই সন্ধ্যালোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করচেন।

একদিন রবিবার সকাল বেলা মার্লে একটা মস্ত কটা রঙের ঘোড়ার হাল্কা গাড়ীতে চড়ে হোটেলে এসে হাজির। পীয়ার বেরিয়ে এসে মার্লের হাতেই ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে গাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসল, ফিয়র্ডের ধার দিয়ে তারা মার্লের বাবার প্রকাণ্ড এষ্টেট দেখতে চলল; প্রাচীন কালে এই এষ্টেট কাউন্টি গভর্ণরের সরকারী বাসভবন ছিল।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। রোদটা তখনো বেশ মিঠে লাগে, কিন্তু

হ্রদের জল সাদা আর ক্ষেতের ফসল সব কাটা হয়ে গেছে। এখানে ওখানে দু-এক খণ্ড জমিতে তখনো হলদে-হয়ে-আসা আলু গাছগুলো উপড়ানো হয় নি। ওপরে পাহাড়ের গায়ে ঘাস খাবার জন্যে খুঁটি-বাঁধা ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়চে, তারাও যেন বুঝতে পারচে যে এটা হচ্চে রবিবার। বিস্তীর্ণ দৃশ্য-পটের ওপর বিগত রাত্রির শিশির তখনো একখানি হাল্‌কা কুয়াসার পর্দ্দা ছড়িয়ে রেখেছে।

একটা বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে তার অপর পাশে তারা য়্যাশ গাছের সারি দেওয়া একটি রাস্তায় এসে পড়ল। এই সরু পথটি সড়ক থেকে পাশ মোড়া দিয়ে পাহাড়ের ওপর একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দিকে চলেচে; বাড়ীর ওপরে পতাকা উড়চে। প্রকাণ্ড শুভ্র বাসভবনটি উচ্চশির করে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে—যেন জগৎটাকে সে নিরীক্ষণ করচে। বিশাল অঙ্গনটিকে ঘিরে তিন দিকে লাল লাল খামার বাড়ী আর নীচের দিকে বাগান আর বিস্তীর্ণ মাঠ ঢালু হয়ে হ্রদের দিকে নেমে গেছে। এষ্টেটের মত বটে!

সেদিকে তাকিয়ে পীয়ার উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "ও জায়গাটার নাম কি?"

"লোরেঙ্‌।"

"জায়গাটা কার?"

হুইপের শব্দ করে মেয়েটি বল্‌লে, "জানি না।" পরমুহূর্ত্তেই ঘোড়াটা সরু রাস্তাটা ধরলো, পীয়ার অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাশ টেনে ধরে বললে—"হেই ব্রাউনি, কোথা যাচ্ছিস্?"

"চল না, গিয়ে দেখাই যাক্ না।"

"কিন্তু আমরা যে তোমার বাবার সেই জায়গাটা দেখতে যাচ্চি।"

"হ্যাঁ ওটাই বাবার।"

পীয়ার অবাক্ বিস্ময়ে মার্লের দিকে চেয়ে রাশটা ছেড়ে দিয়ে বললে, "কি? কি? ওই সবটা তোমার বাবার, সত্যি?"

কয়েক মিনিট পরে তারা বড় বড় নীচু-ছাত ঘরগুলোর মাঝ দিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। সারা বাড়ীটা তখন খালি ছিল, কারণ সেখানকার ম্যানেজার চাকরদের কোয়ার্টারে ছিল। পীয়ারের উৎসাহ বেড়ে উঠতে লাগল।

প্রাচীন গভর্ণরদের কালে এই সব বড় বড় ঘরে কত আনন্দ মিলনের উৎসব হয়ে গেছে; ইউনিফর্ম্ম প'রে, সুন্দর সাজসজ্জা করে কত অভিজাত পুরুষ, সিল্কের পোষাক-পরা মহিলাদের করচুম্বন করেচে এখানে। পুরানো মেহগনির আসবাব-পত্র, গন্ধদ্রব্যের সুগন্ধ, প্রমোদ সঙ্গীত, হাস্য-কৌতুক—মনশ্চক্ষে এ সব ভেসে উঠতে লাগল আর বার বার মার্লেকে জড়িয়ে ধ'রে আলিঙ্গন ক'রে সে তার হৃদয়াবেগটাকে প্রকাশ করতে লাগল।

"ও মার্লে, এ দিকটায় চেয়ে দ্যাখো, দেখচ, এ যেন একটা রূপকথা।"

পুরানো উপেক্ষিত উদ্যান, পথগুলি তৃণাচ্ছন্ন, মাছের কূপগুলো জলে ভরা আর প্রাসাদের খানিকটা ভগ্ন জীর্ণ অংশ; পীয়ারেরা সেইখানে বেরিয়ে পড়ল। পীয়ার চারিদিকে ছুটোছুটি সুরু করল। এখানেও উৎসব হয়েছিল, বিচিত্রবর্ণ আলোকমালা জ্বলেছিল, আর প্রেমিক-যুগলেরা ছায়ায় ছায়ায় কানাকানি করেছিল।

"মার্লে, তোমার বাবা এ সব সরকারের কাছে বিক্রী করে ফেলবেন বলছিলে, না?"

"হ্যাঁ, আমার বোধ হচ্ছে তাই হবে, বাবা বলেন যে, উনি এখানে

থেকে এ-সব দেখতে শুনতে না পারলে এ থেকে কোনো লাভ হবে না।" মার্লে উত্তর দেয়।

"কিন্তু সরকারই বা কোন্ কাজে লাগাবে একে?"

"বোধহয় অক্ষম-পঙ্গুদের আশ্রম হবে।"

"হা ভগবান্, তা অনুমানেও বলা যেত। নিশ্চয় বোকাদের গারদ হবে"—পীয়ার দুম্ দুম্ করে হাঁটে, উত্তেজনায় লাফায় বল্লেও চলে, বলে, "মার্লে, শোনো, আচ্ছা তুমি এখানে এসে থাকবে?"

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে মার্লে তার পানে তাকায়।

"মার্লে তোমায় জিজ্ঞেস করচি, এখানে এসে থাকবে তুমি?"

"একেবারে এইখানেই এই মুহূর্ত্তে আমায় তার জবাব দিতে হবে নাকি?"

"হ্যাঁ, তার কারণ আমি এই বাড়ীটা এখুনি এইখানেই কিনে ফেলতে চাই।"

"আচ্ছা, তা হলে তুমি কি—?"

"ভাখো মার্লে, শুধু একটিবার চেয়ে ভাখো। ওখানকার ওই বারান্দাটা, ওই ডোরিক স্তম্ভগুলো—ওর মাঝে এতটুকু ফাঁকি নেই, একেবারে আসল জিনিষ। ও যে একটা সাম্রাজ্য! ও-সম্বন্ধে আমি কিছু জানি।"

"কিন্তু পীয়ার, এর দাম যে অনেক"—মার্লের কথার সুরে একটা অনিচ্ছা ফুটে ওঠে। সে কি তার বেহালার কথা ভাবে? কোথাও স্থায়ীভাবে শিকড় বসাতে কি তার প্রাণ চায় না?

"অনেক?" পীয়ার বলে, "তোমার বাবা এর জন্য কত দিয়েছিলেন?"

"জায়গাটা নীলামে বিক্রী হয়, তাই বাবা সস্তায় পেয়েছিলেন। আমার বোধ হচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন দিতে হয়েছিল।"

পীয়ার আবার বাড়ীটার দিকে এগিয়ে যায়, বলে, "কিন্‌বো, বাড়ী করবার মত ঠিক জায়গা—ঘোড়া গরু ভেড়া ছাগল, চাকর-বাকর—আঃ চমৎকার হবে।"

মার্লে ধীরে ধীরে তার অনুগমন করে, বলে, "কিন্তু পীয়ার, মনে থাকে যেন, তুমি এইমাত্র সহরে বাবার মেশিনের দোকানটা নিয়েচে।"

পীয়ার তাচ্ছিল্যভরে বলে, "ছোঃ, তুমি ভাবচ ওই সামান্য গ্রাম্য একটা কারখানা আমি এখানে থেকে চালাতে পারব না? এসো মার্লে এসো", ব'লে তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে পীয়ার আবার বাড়ীর ভেতর ঢোকে।

প্রতিরোধ করা তখন অসম্ভব। পীয়ার মার্লেকে এঘর থেকে ওঘর টেনে নিয়ে চলে আর আপন-মনে ঘর সাজিয়ে যেতে থাকে। বলে, "এইটে হবে খাবার ঘর, আর—এইটে বড় বৈঠকখানা; এইটে পড়াশোনার ঘর, এইটে তোমার বিরামকুঞ্জ—এসো, কাল ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় গিয়ে আসবাবপত্র কিনে ফেলা যাবে।"

মার্লের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। পীয়ার ততক্ষণে মনে মনে সব সাজানো গুছোনো শেষ ক'রে ওখানে পাকা-বসতি করে নিয়েচে। গভর্ণেস্ আনা হয়ে গেছে, 'পার্টি' দেওয়া পর্য্যন্ত সুরু হয়ে গেছে।

এইটে নাচঘর। মার্লের কটি-বেষ্টন করে, পীয়ার মার্লেকে নিয়ে ঘরময় এমনি নাচ সুরু করলে যে, সেই উৎসাহের উল্লাসে মার্লের সব বাধা কোথায় ভেসে গেল, মার্লের মুখ ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিতে লাল হয়ে উঠল। বাইরেকার জগতে একদিন যা-কিছু পাবার স্বপ্ন দেখছিল সে, হঠাৎ সেই সমস্ত যেন এই শূন্য ঘরগুলোর মাঝে তার চারিদিকে আত্মপ্রকাশ করল। এই কি তা হলে সত্যি তার ঘর হবে? শ্বাস নেবার জন্যে মার্লে থামে আর চারিদিকে তাকায়।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা অনেকক্ষণ অবধি হোটেলে নোটবুক নিয়ে ব'সে পীয়ার সমস্ত হিসাব-পত্র শেষ করে ফেলে। সে লোরেঙ কিনেচে; তার শ্বশুর সুবিবেচকের মতই বাড়ী, জমিজমা, বন—সব যে স্বাস্থ্যকর মূল্যে ক্রয় করেছিলেন সেই মূল্যেই ছেড়ে দিয়েচেন। এষ্টেটের ওপর ত্রিশ হাজার ক্রাউনের বন্ধকী ছিল, সেটা তেমনি রইল, কারণ পীয়ারের বেশির ভাগ টাকাই ফার্দ্দিনান্দ হোল্মের কোম্পানীতে বাঁধা রয়েচে।

কয়েকদিন পরে লোরেঙ-এ ছুতোর-মিস্ত্রী আর চিত্রকরদের হাড়ভাঙা কাজে লাগিয়ে মার্লেকে নিয়ে পীয়ার রাজধানীতে গেল।

ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় হোটেলে একদিন সে একলা বসে রয়েচে, মার্লে কেনাকাটি করতে গেছে, তখন তার দোরে বেশ সতর্ক করাঘাত হলো।

পীয়ার বললে, 'আসুন।' বড় প্যাটার্নের ভেষ্ট আর কালো-ফ্রক্-কোট-পরা একটি ত্রিশ কিম্বা কিছু বেশি হবে এমনি বয়সের মাঝারি আকারের লোক ঢুকল। মাঝখানে চাঁদির ওপরকার টাকটি কালো চুল দিয়ে সযত্নে ঢাকা; আমুদে লাল-পানা মুখটি, চোখ দুটি উজ্জ্বল নীল—সবটা মানুষ যেন খুস্-মেজাজের উজ্জ্বল জীবন্ত মূর্ত্তি।

অভিবাদন ক'রে হেসে নবাগত লোকটি বল্লে, "আমি উথোগ জুনিয়র" (উথোগ-পুত্র)।

"বাঃ, বেশ চমৎকার হল।"

"এইমাত্র ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে আসচি, বিশ্রী এই জলযাত্রা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,—বসবার জন্য ভাববেন না।" ব'লে সে বসে পড়ল আর ডুরে-কাটা ট্রাউজার-পরা একটা পা আর একটার ওপর তুলে দিল।

পীয়ার সুরা আনালে; ঘণ্টাখানেকের মাঝেই দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব

জমে উঠল। উথোগ জুনিয়রের সমগ্র জীবনের ইতিহাস বলতে বেশি সময় লাগল না।

অভিনয়ে যোগ দেওয়াতে পিতার মত না থাকায় সে পালিয়ে যায়। তার পর নিজের অভিজ্ঞতায় সে দেখতে পায় যে, আজকাল থিয়েটার খুব বেশি নেই। তখন সে নিজেই ব্যবসায়ে ঢোকে। এখন সে ইংলিশ টুইড্ বিক্রীর জেনারেল এজেন্সী নিয়েচে। তার মত হচ্চে স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা—বাপ কিম্বা আর কারু আদেশ আর অনুমতির পানে চেয়ে না থেকেও যথেষ্ট নড়বার চড়বার জায়গা আছে দুনিয়ায়—“আপনার স্বাস্থ্য-পান করচি মশায়!”

এক সপ্তাহ পরে রিক্সেবিতে লোরেঞ্জ ডি উথোগের বাড়ীর রাস্তা জনে জনাকীর্ণ—সকলেরই দৃষ্টি দীর্ঘ আলোকিত বাতায়নশ্রেণীর পানে নিবদ্ধ। ওই মস্ত বড় লোকটির বাড়ীতে আজ রাত্তিরে ভোজ। প্রায় দুপুর রাতে একখানি গাড়ী এসে বাড়ীর দ্বারে থামল। একজন পার্শ্ববর্ত্তী লোক ফিস্-ফিসিয়ে বললে, ‘ওই বরের গাড়ী, ঘোড়াগুলো উনি ডেনমার্ক থেকে আনিয়েচেন।’

রাস্তার ’পরের দরজা খুলল, ঘন আবরণে ঢাকা একটি শুভ্র মূর্ত্তি বেরিয়ে এলো, জনতা ফিস্ফিস্ করে বলতে লাগল “মেয়ে!” তারপর কালো ওভার-কোট আর সিল্ক-হ্যাট-পরা একটি ছিপছিপে লোক। “বর!” দম্পতিযুগল বেরিয়ে গেল, ইংলিশ টুইডের জেনারেল এজেন্টের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো হিপ্ হিপ্ হিপ্—তার পর বহু কণ্ঠে সহর্ষে ধ্বনিত হলো ‘হুর্—রে’।

গাড়ী চললো, পীয়ার বধূকে বাহুবেষ্টনে ধরে ঘোড়াগুলোকে দ্রুত দুলকি চালে ফিয়র্ডের ধার দিয়ে চালিয়ে দিল—চললো সে তার ঘরে, তার প্রাসাদে—অভিনব এবং অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের পানে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লোরেঞ্জ-এ কাঠ-কাটার চালাটার নীচে একটি ছোট এলোমেলো চুল, পাকা-দাড়ি বুড়ো দাঁড়িয়ে কাঠ কাটা-চেরা করছিল। এইখানে সে যে কবে থেকে রয়েচে কেউ বলতে পারে না। এক মালিক যায়—অন্য মালিক সেখানে আসে, এই ছোট্ট মানুষটির তাতে আর কি আসে যায়? একজনের যেমন জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন ছিল, আরেক জনেরও তেমনি আছে। সন্ধ্যা হ'লে ভৃত্যদের থাকার দিকটায় সে ওপরে তার কুঠরীতে গিয়ে ঢোকে, খাবার সময় ভোজন টেবিলের শেষ আসনটায় সে বসে, তার মনে হয় খেতে পাওয়া যাবেই, সব সময়। বর্ত্তমান প্রভুর নাম হল্‌ম্—একজন ইঞ্জিনীয়ার; ছোট মানুষটি মিট্‌মিট্‌ ক'রে তার পানে চায়, চালার নীচে কাঠ কাটতে থাকে। তারা যদি এসে বলে, বাপু হে তোমাকে দিয়ে দরকার নেই, তোমায় এখান থেকে চলে যেতে হবে—তাতে তার কি!—সে বদ্ধকালা শুনতে পায় না, এ কথা তো সবাই জানে। ঠুক্‌ঠাক্, চালার নীচে তার কুড়ুল চলতে থাকে। ওখানকার লোকেরা এতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তারা সেদিকে দেয়ালের ঘড়ির টিক্-টিকের চাইতে এতটুকুও বেশি মন দেয় না।

এই প্রকাণ্ড বাড়ীর রান্নাঘরে দুটি মেয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারছিল আর হি-হি করে হাসছিল।

"ওই রে আবার এসেছে" লরা বলে, "শ্—শ্, অত জোরে হাসিস্‌নি, ওই দেখ, আবার দাঁড়ালো।"

"পাখীকে শীস্ দিয়ে ডাকচে", ওলিয়ানা বলে, "আর তা না হলে

বোধ হয় আপনার মনে কথা বলচে। মাথা বোধ হয় ঠিক নেই, না রে ?"

"শ্ শ্, গিন্নী শুনতে পাবে।"

যাঁর গতিবিধি তাদের কাছে এত হাস্যকর ঠেকছিল তিনি লোরেঙের মালিক স্বয়ং।

পীয়ার প্রকাণ্ড উপেক্ষিত উদ্যানটায় নিকার-বোকারের পকেটে হাত দিয়ে টুপিটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনো এখানে দাঁড়ায়, কখনো ওখানে ; আবার কখনো খেয়ালখুসী-মত ঘোরা-ফেরা করে। কখনো গানের একটা কলি গুন্ গুন্ ক'রে গায়, আবার শীষ দিতে সুরু করে ; কখনো ছোট্ট একটা ডাল ভেঙে তাই দেখে, কখনো হয়ত একটা পাখী কিম্বা একটা পুরাণো আপেল গাছের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। অক্টোবরের সূর্য্যালোকে এই যে বন, এই যে জমি-জমা, এই সবই হচ্চে তার একেবারে নিজের,—এই কথাটাই হচ্চে সেরা কথা। একে কি কিছুই-না ব'লে চলে ? ওই যে হ্রদের পরপারে কালো জলের আয়নায় পাহাড়টা কত বিচিত্র বর্ণে ভূষিত হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে,—কোথাও হল্‌দে পাতায়, কোথাও সবুজ পাতায়, কোথাও ঈষৎ লাল, কোথাও ঘন লাল, কোথাও সোণালি আর কোথাও খুনে-লাল রঙে,—ওই যে মাঝে মাঝে ঘন-সবুজ দেওদার বন, এই সব রয়েচে তার দৃষ্টিকে বিশ্রাম দেবার জন্যে। এইখানে কি সত্যি সে জীবন যাপন করচে ? তার চার দিকে কি প্রাচুর্য্যের বিকাশ ! কি বিশাল সোণালি আকাশখানি, যেন সুরে ভরে উঠেছে ! আলুর গাছগুলো ক্ষেতের মাঝে উপড়ে ছড়িয়ে রাখা হয়েচে। শস্য নির্ব্বিঘ্নে গোলায় তোলা হয়েচে। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন সে তার চারিদিকে যা-কিছু দেখচে, তার মাঝে থেকে অন্তরের রস সংগ্রহ করচে

আর দারুণ আগ্রহে তা পান করচে। অন্তরের শূন্যতা ভরে উঠচে তার; কোমল প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ দৃশ্যপট যেন তার অন্তরকেও বিকাশের প্রাচুর্য্যের আর বিশাল বিরামের অনুভূতি দিয়ে রাঙিয়ে তুলচে।

এখন—তার পর?

"তার পর?" আপনার মনেই বলতে থাকে আর উদ্যান-পথে পাইচারি দিতে আরম্ভ করে। তার পর? তার পর? আচ্ছা এখন কিছুক্ষণ একটু বিশ্রাম কি সে নিতে পারে না? প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টির সামনে একটা কোনো লক্ষ্য থাকা চাই তো? এটা, ওটা কিছু একটার দিকে তার চেষ্টাকে চালনা করা চাই তো। এখন তার লক্ষ্যটা কি? এ কিসের জন্য সে এত পরিশ্রম করেচে, সেই আস্তাবলের ওপরকার ঘরে কঠোর দিনগুলি যাপন থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত? সে কোন্ লক্ষ্য? কতবারই তার মনে হয়েচে যেন সবই বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আপনি আপনি চলেচে, যেন একদিন নিশ্চয়ই সে এক বিরাট আনন্দময় বিশ্বব্যাপ্ত সমন্বয়ের মাঝখানে আপনার স্থানটিকে আবিষ্কার করবে। সে কি এখনো তা করতে পারে নি? আর কি তার চাই? না, নিশ্চয়ই সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু এই কি তা হলে সব? ওই অন্তরালে, ওই সুদূরে তা হলে কি রয়েচে? চুপ কর, আর কোন প্রশ্ন নয়! চার দিকে সৌন্দর্য্যের পানে চাও,—এই তো শান্তি, শান্তি আর বিরাম।

তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে সে যায়, বাড়ীর ভেতরে যায়, প্রিয়াকে বুকে নিলে হয় তো কিছু হতে পারে। তাকে নিয়ে একটু বাইরে এসেই না হয় দেখা যাক্।

মার্লে তখন ভাঁড়ারে এপ্রন জড়িয়ে শেল্‌ফে জ্যাম্‌এর ভাঁড়গুলো সাজাচ্ছিল।

মার্লেকে জড়িয়ে ধ'রে পীয়ার বলে, "ওগো আমার ছোট্ট প্রিয়তমা, বাইরে একটু ছুট্ দিয়ে এলে কেমন হয় ?"

"এখন ? বাড়ীর গিন্নীর বুঝি কুঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই ? উঃ, চুল, চুল ! চুলগুলো খুলে যাবে যে !"

পীয়ার তার বাহু ধারণ করে' তাকে বাতায়ন-পার্শ্বে নিয়ে গিয়ে হ্রদের পানে তাকিয়ে বলে, "ওগো প্রিয়তমা, এটা খুব সুন্দর, না ?"

"আসার পর দিনে বিশবার করে' ও-কথাটা আমায় জিজ্ঞেস করেচ, পীয়ার !"

"হ্যাঁ, আর তুমি কোনই উত্তর দাও নি'। তুমি একবারও দৌড়ে গিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল নি তো যে তুমি খুব সুখী হয়েচ, এ পর্য্যন্ত একটিবারও তো তুমি নিজে থেকে আমায় একটি চুমো দাও নি।"

"না বোধ হয়, যে রকম রাশি রাশি চুরি করে' আদায় করা হচ্চে !"

পীয়ারকে সরিয়ে হাতের ফাঁক দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে মার্লে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে, "আজ আমার মাকে দেখতে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ, তা বটে।" পীয়ার ঘরে পায়চারি দেয়, কেবলি অস্থির অধীর হয়ে উঠতে থাকে। "মার কাছে মার কাছে! সব সময়, অবিরাম কেবলি মা আর মা—আর কিছুই না! ধ্যেৎ!" পীয়ার শীষ দিতে সুরু করে।

মার্লে দরজায় এসে উঁকি মারে, বলে, "পীয়ার, তোমার হাতে বুঝি বাড়তি-সময়ের আর অবধি নেই ?"

"তা, হ্যাঁ, না। সবখানেই কি যেন খুঁজে বেড়াচ্চি খুব ব্যস্ত ভাবেই ; কিন্তু পাচ্চি না, আর জানিও না ঠিক কি যে সেই বস্তুটা। ও হ্যাঁ, তা বাড়তি সময় আমার যথেষ্টই আছে।"

"কিন্তু খামারের কি করচ ?"

"কেন, গয়লানী গোয়াল-বাড়ীতে রয়েচে, আস্তাবলে সহিস রয়েচে, নায়েব রয়েচে প্রজা আর মজুরদের জ্বালাতন করতে। আমি আর কি করবো, উন্নতির জন্য খোঁচাখুচি ?"

"মেশিন-শপএর কি হচ্চে ?"

"কি হচ্চে না হচ্চে তা দেখতে সাইকেল করে দিনে দুবার করে যাচ্চি না ? আর ওই চমৎকার খাঁটি ইঞ্জিনিয়ার রোড ম্যানেজার থাকতে—"

"তা তাকে তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পার কোন না কোন ভাবে ?"

"সে যে ভাবে কাজ করে' অভ্যস্ত, সেই ভাবেই তাকে কাজ করতে হবে, তা ছাড়া আর কিছু হবার যো নেই, মণি ! আর বছরে খাঁটি মুনাফা চার-পাঁচ হাজর ক্রাউন, এতো খাসা !"

"ও কাজটা বাড়াতে পার না ?"

পীয়ারের ভুরু ওপরের দিকে উঠে আসে, মুখখানি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, বলে, "বাড়ানো—তুমি বাড়ানোর কথা বলচ ? একটা পুতুলের বাড়ীকে বাড়ানো ?"

"তা পীয়ার, তোমার ও নিয়ে অমন হাসি-ঠাট্টা করা উচিত নয়, বাবা এটাকে স্থরু করতে কি পরিশ্রম করেচেন।"

"তা মার্লে, তোমারও অমন গম্ভীরভাবে আমাকে উত্যক্ত করতে আসা উচিত নয়। বাস্তবিকই বল্‌চি উচিত নয়। হয় তো এরই মাঝে একদিন আমি আবিষ্কার করেচি দেখবে এই জগতে সুখী হবার একমাত্র উপায় হচ্চে লাঙল টেনে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে চলা, আর এই বিশ্ব-জগতে আর কিছু যে আছে তা ভুলে যাওয়া। একদিন হয়তো

এই হবে—কিন্তু এখন আমায় একটুখানি নিশ্বাস ফেলতে দাও, যদি আমায় ভালবাস। আচ্ছা, কিছুক্ষণের জন্যে বিদায়!"

মার্লে ভাঁড়ারের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে, জানালা দিয়ে তাকিয়ে পীয়ারকে আস্তাবলে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে দেখে। প্রথম প্রথম যখন পীয়ার এই ভাবে তার সমস্ত স্বত্ব-সম্পত্তিকে স্পর্শ করে আপনার ব'লে অনুভব করবার জন্য ঘুরে বেড়াত মার্লেও যেতো। হয় তো পীয়ার পশু-শালায়ই যায়, পশুগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে, থাব্ড়ে নিজেকে লোমাচ্ছন্ন ক'রে হয় তো ছেলেমানুষের মত আনন্দে কেবলি বক্‌তে থাকে। "ত্যাখো, মার্লে, এই গাইটা আমার! ওর নাম ডাগ্রোস্—ওটা আমার। আমাদের চল্লিশটে গাই—সবগুলো আমার! আর ওই ঘোড়াটা কেমন দেখাচ্চে, ত্যাখো। আমাদের আটটা ঘোড়া, ওরাও আমার, অবিশ্যি তোমারও। তুমি কিন্তু ওদের জন্যে একটুও যত্ন নাও না। ওদের একটাকেও তুমি জড়িয়ে ধরে আদর কর নি। কিন্তু আমার মত গরীব যখন একদিন জেগে উঠে, হঠাৎ দেখতে পায় যে, তার এত সব রয়েচে—না, মার্লে, থামো এক মিনিট, এসো, বুড়ো ব্রাউনীকে চুমো খেয়ে যাও তো।" মার্লে পীয়ারের এই ক্রিয়াকাণ্ড বুঝে নিয়েচে। পীয়ার বার বার ওই সব ব্যাপারই করে আর প্রত্যেক বারে তার সেই একই আনন্দময় বিস্ময়! মার্লের কাছে এই সব কেমন একটু হাস্যকর লাগতে সুরু হয়েছে—একি মার্লের পক্ষে লজ্জার কথা? প্রায়ই যখন মার্লে পীয়ারের জন্য গভীরতম ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, পীয়ারও তখন তার আদরের জন্য প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে আসে, কিন্তু তখনই মার্লে যে অকস্মাৎ একেবারে উদাসীন হয়ে তাকে সরিয়ে দেয় তার কারণ কি? কি হয়েচে? কেন মার্লে এমন ব্যবহার করে?

বোধ হয় তার কারণ পীয়ার অত্যন্ত প্রবল, সে তার প্রভাব দিয়ে মার্লেকে এমনি অভিভূত ক'রে ফেলতে চায় যে নিজের সত্তা হারিয়ে সে পাছে ভেসে যায় এই ভয়েই আপনাকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখে। এই মুহূর্ত্তে হয় তো তারা দীপালোকে সহজ ভাবে বসে বার্ত্তালাপ করচে, মনে ও হৃদয়ে একেবারে কাছাকাছি হয়ে গেছে, পর মুহূর্ত্তেই কিন্তু সব শেষ হয়ে যায়। পীয়ার হঠাৎ চমকে উঠে ঘরে পাইচারী দিতে সুরু করে, বক্তৃতা দেয়। আচ্ছা মার্লে, গাছ-লতার মাঝে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ পরমাশ্চর্য্য নয়? তারপর উত্তরে দক্ষিণে নানা রকমের অদ্ভুত বৃক্ষ-জীবনের কথা নিয়ে আলোচনার বন্যা নেমে আসে—মার্লে যে-সব গাছের নাম পর্য্যন্ত শোনে নি' সেই সব গাছের জীবন-সংগ্রাম, তাদের ভালবাসা ও তৃষ্ণা, রোগে তাদের বীরত্বের কথা, তাদের মৃত্যুর পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা। তাদের নব নব উদ্ভাবনা, তাদের প্রজ্ঞা, হ্যাঁ, তাদের ধর্ম্মবোধ, এসব কি অদ্ভুত নয় মার্লে? এই সব কথা থেকে খুব সহজেই আলোচনা ভূস্তরে, প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্ জন্তু এবং স্ফটিকের (crystal) দিকে নেমে আসে—আরেক নতুন বক্তৃতা আর কি! সর্ব্ব শেষে পীয়ার আদিম আণবিক জীবন থেকে সুরু করে গ্রহতারার গতিকে যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শাসন করচে সেই পর্য্যন্ত একই বিকাশের মহান্ সামঞ্জস্য দেখিয়ে সমস্ত আলোচনা সমাপ্ত করে। এ কি পরমাশ্চর্য্য নয়? সমগ্র বিশ্বজগৎব্যাপ্ত একই ছন্দ-ধ্বনি, লোকে-লোকান্তরে এক বিপুল সুর-সমন্বয়! তার পর একটি চুমো!

কিন্তু মার্লে শুধু একটু পিছিয়ে যায়, পীয়ারকে ধীরে সরিয়ে দেয়। সে যেন তার সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞান নিয়ে—গাছ আর fossil, crystal আর তারার জ্ঞান নিয়ে আসে সমস্ত একটি আদরে নিঃশেষে ঢেলে দিতে। মার্লের অন্তর যেন অসহায়ের মত, বিপন্নের মত কেঁদে উঠতে

চায়। বিশ্বজগতের অপার বিস্ময়ের মাঝ দিয়ে দ্রুতগতিতে নিয়ে যেতে যেতে পীয়ার হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে, ইন্দ্রিয়ের উন্মাদ আবেগোচ্ছ্বাসের ঘূর্ণায় তাকে কোথায় নিয়ে চলে যায়, শেষে সে জেগে উঠে যেন কোন্ দ্বীপে ফেলে-যাওয়া একলা প্রাণীর মত—কোথায় সে রয়েচে, কেই বা সে তাও যেন সে জানে না। মার্লে হাসে কিন্তু বুকের ভিতর যেন কোন্ কান্না উথ্লায়। এ কি ভালবাসা? এই বলিষ্ঠ মানুষটি—যার জীবন এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন আর কর্ম্মের মাঝে কেটেচে, তার অবরুদ্ধ অনুভবরাশি প্রকাশের পথ পেয়ে আজ একেবারে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু তাতে মার্লে এমন উদাসীন হয়ে ওঠে কেন?

পীয়ার যখন আস্তাবল থেকে কি গুন্ গুন্ করতে করতে এলো, মার্লে তখন কালো পশমী পোষাক প'রে গলায় একটা লাল ফিতে জড়িয়ে ড্রয়িংরুমে ব'সে।

পীয়ার থেমে গিয়ে বলে, "বাঃ বাঃ, কি চমৎকার মানিয়েচে তোমায় মার্লে?"

মুহূর্ত্তকাল পীয়ারের দিকে তাকিয়ে থেকে মার্লে এগিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে।

"আজ একা একাই তোমায় আস্তাবলে যেতে হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, ছোট ঘোড়ার বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলছিলাম।"

"পীয়ার, আমি তোমার ওপর নির্দ্দয় ব্যবহার করি, না?"

"তুমি? তুমি!"

"মাকে দেখবার জন্যে তোমায় যদি নিয়ে যেতে বলি, তা হলেও না?"

"বা রে, তাই তো চাই। ক্যাপ্টেন মীহরের কাছ থেকে কাল যে ঘোড়াটা কিনেচি সেইটের তো এখুনি আসার কথা—তারি প্রতীক্ষা করচি।"

"চড়বার জন্যে একটা নতুন ঘোড়া ?"

"হ্যাঁ—আমার ঘোড়া চড়া চাই! কয়েক বছর আরব ঘোড়া নিয়ে কারবার করেচি, কিন্তু আজ প্রথম এটাকে গাড়ীতে জুতে দেখ্‌ব।"

মার্লে তখনো পীয়ারের গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবার তার সুন্দর তপ্ত অধর পীয়ারের অধরকে স্পর্শ করল নিবিড় হতে নিবিড়তর ক'রে। এমনি ধারা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পীয়ার যখন অপ্রত্যাশিত আনন্দে অভিভূত হ'য়ে কাঁপতে থাকে, তখন মার্লে তাকে ভালবাসে। মার্লেও কাঁপছিল—দেহে আর অন্তরাত্মায় এক আনন্দময় স্পন্দন! এই প্রথম—এতকাল পরে—মার্লে নিজে দান করল।

আবেগে সাদা হয়ে গিয়ে, শ্বাস মোচন ক'রে শেষে পীয়ার বলল, "আঃ—এমনি ধারা মরতে পারলে আনন্দ।"

একটু পরে তারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন সামনের উঠোনের দিকে চেয়ে ছিল, খামারের একজন দাড়িওলা লোক একটা মস্ত বাদামী ঘোড়াকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে হাজির হ'ল। উঠোনের মাঝখানে ঘোড়াটা এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে, ঘাড় উঁচু ক'রে ডেকে উঠলো, আস্তাবল থেকে ঘোড়ারা তার উত্তর দিলে।

মার্লে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল, "বাঃ কি সুন্দর!"

আস্তাবল থেকে যে-ছোকরা ঘোড়াটাকে নিতে এসেছিল পীয়ার তাকে বলল, "ওকে গাড়ীতে জোতো।"

বুড়ো লোকটি টুপি স্পর্শ ক'রে বললে, "হুজুর, আমাকে বলতে বলেছেন যে একে কখনো গাড়ীতে জুতে হাঁকানো হয় নি।"

পীয়ার বললে, "তা সব কাজই আরম্ভ না করলে হয় না।"

মার্লে পীয়ারের পানে চাইলে, কিন্তু বাদামী ঘোড়া গাড়ী নিয়ে নাচতে নাচতে যখন দোরের সামনে এসে দাঁড়ালো তখন তারা দুজনেই

যেরুবার জন্য সাজ-সজ্জা ক'রে তৈরী হয়েচে। সাদা সাদা খুরগুলো অধীরভাবে মাটিতে ঘা মারতে লাগ্‌ল, ঘাড় উঁচু হয়ে উঠলো, চোক আগুনের মত জলতে লাগল। এর আগে তার পাঁজরে গাড়ীর চাপ সে কখনো অনুভব করে নি, তার ঠিক পেছনে চাকার ঘড়ঘড়ানি শোনেনি। পীয়ার সিগার ধরালো।

মার্লে থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "তুমিও কি যাবে নাকি?"

পীয়ার বললে, "ওকে শুধু বোঝাতে চাই যে আমি উত্তেজিত হই নি।"

যেই তারা গাড়ীতে উঠলো অমনি ঘোড়া ফুঁসিয়ে উঠে পিছু হটতে লাগ্‌ল। কিন্তু তখনি ঘাড়ের ওপর লম্বা বেত সপাসপ্‌ পড়লো। মিনিট খানিক পরে তারা ধূলিজালের মাঝ দিয়ে দ্রুতবেগে সহরের পানে এগিয়ে গেল।

শীত এলো—সত্যিকারের শীত যাকে বলে। পীয়ার এক বাতায়ন থেকে অন্য বাতায়নে যায় আর কেবলি মার্লেকে ডাকে, এসো এসো, হ্মাখো, হ্মাখো। কতকাল সে এদেশে ছিল না—পূর্ব্ব-নরওয়ের শীতটা তার কাছে একেবারে নতুন লাগে। হ্মাখো, হ্মাখো! একটা শুভ্র জগৎ—জমাট শুভ্র নিঃশব্দতা—বনানী, প্রান্তর, হ্রদ সব শুভ্র—সূর্য্যালোকে এ যেন একখানি পরীর গল্প, রাত্রিতে বিস্তৃত চন্দ্রালোকে এ যেন এক স্বপ্নলোক।

হ্রদের ওপর, তুষার-চূর্ণে আচ্ছন্ন বনে স্লের (sleigh) ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যায়; ঘোড়াগুলোর কেশর বরফে ঢেকে গেছে, মানুষগুলোর দাড়ির পরে বরফের কণা ঝুলচে। মধ্যরাত্রে হ্রদের ওপর থেকে বরফ-ফাটার উচ্চধ্বনি কানে আসে, শুনে ঘুমন্ত মানুষ বিছানায় চমকে উঠে বসে।

এমনি সময়েই তো ঘোড়া হাঁকিয়ে মজা—চল, মার্লে। গুডব্রাণ্ডসডাল থেকে সে নতুন ঘোড়া আনা হয়েচে তাকে শেখানো দরকার, ওকেই নেওয়া যাক্। ব্যস্ আর কি, তারা তখন লোমের তৈরী পোষাক পরে' সাঁ সাঁ ক'রে বরফ-জমাট হ্রদের ওপর দিয়ে চলে, ঘূর্ণাবেগে একেবারে পাতলা কাঁচের মত স্বচ্ছ বরফের ওপর গিয়ে পড়ে, গাড়ী পিছলে গিয়ে ওল্টায় আর কি! মার্লে চীৎকার ক'রে ওঠে—কিন্তু তারা আবার যেখানে নরম তুষার পড়েচে সেখানে পৌছায়, যেখানে ঘোড়ার খুর মাটি আঁকড়ে ধরতে পারে। আরে লাফাস নি, এখন তুল্‌কি চালে চল্, তুলকি! পীয়ার বেত শাসায়। কালো দীর্ঘকেশর গুডব্রাণ্ডসডাল-বাসীটি ঘাড় উঁচু ক'রে তুলকি চালে এগিয়ে যায়। সন্ধ্যা আসে, বিস্তীর্ণ নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে তারা লোরেঙের দিকে দ্রুত চলতে থাকে। লোরেঙের উজ্জ্বল দীপাবলীর দীর্ঘশ্রেণী তাদের আলো দেখায় ঘরের দিকে। ওগো প্রিয়া, কি চমৎকার দিনই কাটল আজ!

কিম্বা হয়তো, জঙ্গলে যারা কুটীরে থাকে, 'শী' চড়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, তারা তাদের ওখানে যায়, বড় চিমনীর তলায় প্রচণ্ড আগুন জেলে তারা উষ্ণ কফি পান করে। তার পর ম্লান শীত-সন্ধ্যায় বেগুনী গোধূলী-আলো যখন বনের ওপর, ক্ষেতের ওপর, হ্রদের ওপর, সাদা নীল তুষাররাশির ওপর ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা ঘরের পানে ফেরে। পশ্চিমে অনেক দূরে, কটা রঙের পাহাড়-গায় একটি খামার বাড়ী দেখা যায়, সোনালী মেঘের দীপ্তিতে তার বাতায়ন-শ্রেণী জল্ জল্ করে। ওইখানে তারা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসে, তাদের চলার হাওয়ায় দেওদার গাছের তুষার ঝরে ঝরে পড়তে থাকে; আরো আরো আগে কাঠুরেদের গভীর দাগ-কাটা পথের ওপর দিয়ে, কাঁটা-গাছের গুঁড়ি আর পাথরের ওপর দিয়ে, আছাড় খেয়ে, গায়ের চামড়া ছ'ড়ে গিয়ে, তুষারস্তূপের মধ্যে

মাথা ড়ুবিয়ে আবার কোনো রকমে নিজেদের টেনে তুলে নিয়ে, পরস্পরের পানে চেয়ে হেসে, আবার দ্রুতগতিতে তারা এগিয়ে আসতে থাকে। তার পর ঘেমে নেয়ে, লাল হয়ে তারা বাড়ী পৌঁছোয়, দেয়ালে 'স্কী' রেখে তাতে হেলান দিয়ে মাটিতে পা ঠুকে বুট থেকে তুষার ফেলতে থাকে।

পীয়ার দাড়ি থেকে বরফ সরাতে সরাতে বলে, "মার্লে, আজ রাতে খাবার সময় এক বোতল Burgundy চাই।"

"হ্যাঁ—আর ফোন করে দিই কাউকে আসতে?"

"বাইরে থেকে—আর কাউকে? আমাদের দুজনেই একটু স্ফূর্তি করা যাক্ না?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চাও তো তাই হোক্।"

ঝরণা-ধারায় স্নান—তার পর বেশ পরিবর্ত্তন—কি সুন্দরই লাগে! তার পর আবার আর একটা মতলব জোটে মাথায়! একটু মজা করবার জন্যে ডিনারের সময় সে সান্ধ্য-পোষাক প'রে দেখা দেবে, কিন্তু ঘরে ঢুকেই পীয়ার একেবারে থ' হয়ে যায়, মার্লেও সান্ধ্য-পোষাক প'রে দাঁড়িয়ে আছে,—ঘন লাল মখমলের পোষাক, গলায় পীয়ারের লকেট, আর লম্বা চুলের গুচ্ছগুলোকে ঘাড়ের নীচে ঢিলে খোঁপা করে বাঁধা। টেবিলের ওপর ফুল, তপ্ত করবার জন্যে সুরা—সেরা গেলাস, সেরা রূপার পাত্র,—কি চমৎকার! তারা আরক্ত সুরায় গেলাস ভ'রে ঊর্দ্ধে তুলে ধ'রে পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করে।

শীতের বরফাচ্ছন্ন ভূ-দৃশ্য তাদের চিন্তাকে তখনো ছেয়ে থাকে, কিন্তু সূর্য্য তাদের অন্তরাত্মাকে আতপ্ত করে তোলে। হাসি ঠাট্টা চলে অনেকক্ষণ, পরস্পরের হাত ধরে কাটে, দীর্ঘ নীরবতার মধ্যে ব'সে ব'সে পরস্পরের পানে তারা চায় আর হাসে।

"মার্লে, আজ একটা মহিমাময় দিন! কাল আমাদের মৃত্যু।"

"কি বলচ! কাল!"

"না হয়, পঞ্চাশ বছর পরেই—একই কথা।" ব'লে মার্লের হাত চেপে ধরে পীয়ারের চোক বুজে আসে।

"কিন্তু এই সন্ধ্যাটি তো আমরা এক সঙ্গে রয়েচি—এর চাইতে বেশি কি চাই?"

তখন পীয়ার তার মিশরের অভিজ্ঞতার কথা বলতে আরম্ভ করে। একবার এক মাসের ছুটিতে সে স্বয়ং মাস্পেরোর সঙ্গে, বিখ্যাত মাস্পেরোর সঙ্গে ধ্বংসাবশেষ নগরীগুলো দেখবার জন্য লাক্সোরে, স্ফিংক্সদের সেই বড় বড় avenueওলা কার্ণাকে, এল্ আর্মানায় আর শুব্রায় গিয়েছিল। তারা সেই সব প্রচীন মন্দিরের সহর আর রাজাদের সমাধি-মন্দির দেখেছিল—যেখানে হাজার হাজার বছর আগেকার মরা মানুষ চোখ খুলে যেন চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে, যেন তারা যে কোনো মুহূর্ত্তে উঠে ডাক দিয়ে বলবে, "ওরে ভৃত্য, স্নানের জল ঠিক হয়েচে?" সেইখানে একটা শস্য ক্ষেত্রের মাঝে একটা স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞসা করবে এটা কি? এটি কোনো রাজধানীর একমাত্র অবশেষ! সেখানেও একশো হাজার বছর আগে হয় তো তরুণ-যুগলেরা একসঙ্গে বসেচে, সুরা নিয়ে পরস্পরের স্বাস্থ্য-পান করেচে, ভালবাসার সব রকম আনন্দ ভোগ করেচে—এখন তারা সব কোথায়? বলতে পারো, তারা কোথায়?

"যখন ভ্রমণ-যাত্রা শেষ হলো, মার্লে, আমার মনে হতে লাগল যে নীল নদীর পলিই শুধু ক্ষেত-গুলোকে উর্ব্বরা করে নি, যারা মরেচে তাদের মৃৎ-চূর্ণ দেহে তারা উর্ব্বরা হয়েচে। আমি যে ধূলির ওপর দিয়ে ঘোড়া চড়ে এসেচি, তা মানুষের আঙুল ছিল, অধর ছিল হয়

তো যারা এক সময় পরস্পরকে চুম্বনে জড়িয়ে ধরতো। লক্ষ লক্ষ মানব-মানবী ওই সব নদীতীরে এক সময় বাস করতো, এখন তাদের কি হয়েচে?—ভূতত্ত্ব। আমার মনে হতে লাগ্‌ল সেই সব লক্ষ লক্ষ সকরুণ প্রার্থনার কথা যা সূর্য্য-তারার পানে, মন্দিরের প্রস্তরমূর্ত্তির উদ্দেশে, কুমীর আর সাপের উদ্দেশে—এমন কি ওই পবিত্র নদীর উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছিল। আর মার্লে, বায়ুমণ্ডল সেই সব প্রার্থনাকে গ্রহণ ক'রে এক মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বনিত হয়েছিল—বাস্ এই মাত্র। এমনি ধারা আজ পর্য্যন্ত আমাদের প্রার্থনাও ঊর্দ্ধে উধাও হয়ে যাচ্চে, আমরা আমাদের উষ্ণ অধর হিম-অসাড় পাথরে চেপে ধরচি আর ভাবচি তার চিহ্ন রেখে যাচ্চি।"

মার্লে কিন্তু গেলাস স্পর্শ করে না, হল্‌দে দীপাবরণের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। বিশ্বজগতে বেরিয়ে প'ড়ে সঙ্গীত দিয়ে তাকে জয় করবার স্বপ্ন এখনো সে নিঃশেষে ত্যাগ করে নি, আর পীয়ার ওখানে ব'সে ব'সে তার কাছে অনন্ত কালের ইতিহাসখানি খুলে ধরে, যার মাঝে পীয়ার, সে, তার বাবা মা, সমস্ত হাওয়ায় ধানের খোসার মত উড়ে মিলিয়ে যাচ্চে।

"কি, আমার সঙ্গে পান করবে না? বেশ, তা হ'লে আমিই তোমার স্বাস্থ্য পান করচি—!"

তার ভ্রাম্যমান জীবনের গল্প একবার সুরু হয়েচে আর সে থামে না, চলতে থাকে। কিন্তু এবার কতকটা উৎফুল্ল সুরে, তাই মার্লে একটু একটু হাসতে পারে। এবার সেই মস্ত জলাভূমির কথা, তার সেই অসংখ্য পক্ষী—আর সারসদের কথা—লম্বা ঠোঁট, বাঁকা বুক আর লম্বা পা-ওয়ালাদের জগতের কথা, তাদের চীৎকার আর পক্ষধ্বনির কথা আরম্ভ হয়। যখন এই সব যাযাবর পাখীরা হাজারে হাজারে বসন্তকালে

উত্তর দিকে যাত্রা করে তখন তাদের পেছনে প'ড়ে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখাই সব চেয়ে সুন্দর ব্যাপার। পীয়ার তাদের যেতে দেখে বলতো, 'নরওয়ে, আমার ভালবাসা তোমায় প্রেরণ করলাম!' আবার হেমন্তে তাদের—সাদা হাঁস, আর অন্য সব পাখীদের—ফিরে আসা! পীয়ার তখন ভাবতো, 'স্বদেশে এখন তারা কি করচে না জানি!' তার পর প্রতিবৎসর সে আপন মনে সঙ্কল্প করতো, বলতো, 'আস্চে-বার আমি তোদের সঙ্গে যাবো।

"এতকাল পরে শেষে এই এলাম!"

মার্লে হেসে গেলাস তুলে বলে, "স্বাগত স্বদেশে!"

পীয়ার ঘণ্টা বাজায়, মার্লে চোখ তুলে বলে, "কি চাই তোমার?"

পরিচারিকার পানে চেয়ে পীয়ার বলে, "শ্যাম্পেন।"

ব'লতেই পরিচারিকা চলে যায়।

"তুমি কি পাগল হয়েচ পীয়ার?"

আরক্ত মুখে পীয়ার হেলান দিয়ে উৎফুল্ল ভাবে সিগারেট জ্বালিয়ে বিদেশে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ের কথা বলে। আরব্ধ কাজ তখন শেষ হয়েচে। আলেকজান্দ্রিয়াতে ওই ইংরাজ কোম্পানীরই এক শাখার সঙ্গে সে কাজ করচে তখন। একদিন প্রভাতে চীফ্ এসে উপস্থিত, বল্লেন, "ভদ্রমহোদয়েরা, কীর্ত্তি অর্জ্জন করবার মত শক্তি যাঁর মাঝে আছে তাঁর একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েচে—কেউ তৈরী আছেন?" দশজনের কণ্ঠে উত্তর হলো—"আমি।" "বেশ, আবিসিনীয়ার রাজার হঠাৎ হালফ্যাসানের দিকে দৃষ্টি পড়েচে, সুতরাং তাঁর রেলওয়ে চাই—দুশো মাইল—কি বলেন আপনারা?" সমবেত কণ্ঠে আমরা বললাম, "খুব চমৎকার।" "বেশ, আমাদের কিন্তু জার্ম্মান, সুইস আর আমেরিকানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তবে জিততে হবে।" "নিশ্চয় হবে"

—আরো উচ্চস্বরে সমবেত কণ্ঠের উত্তর যায়। "এখন আমি দুজন লোক নেবো, আর তাঁদের হাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবো। তাঁরা সেখানে গিয়ে সার্ভে করে লাইন বসাবেন আর টেকনিক্যাল এবং আর্থিক দিক থেকে খুব ভালো করে বিচার করে সম্পূর্ণ প্ল্যান তৈরী করবেন—প্ল্যানটি বিরোধী দলের প্ল্যানগুলোর চাইতে ভালো হওয়া চাই, সস্তা হওয়া চাই। উপযুক্ত লোকের পক্ষে আটমাসের কাজ, কিন্তু আমার চার মাসের মাঝে হওয়া চাই। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট (সহায়ক কর্ম্মচারী), আসবাব-পত্র, যা কিছু আপনাদের দরকার পাবেন। কাজটা যাতে আমাদের হাতে আসে এমনি ক'রে যিনি এ কাজ করতে পারবেন তাঁকে এক হাজার পাউণ্ড প্রিমিয়াম দেওয়া হবে।"

উত্তেজনায় প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে মার্লে বলে, "পীয়ার—তোমায় পাঠিয়েছিল?"

"আমি—আর একজন।"

"তিনি কে?"

"তার নাম ফার্দ্দিনান্দ হল্‌ম্।"

মার্লে তার এক পেশে মৃদু হাসি হাসে, আর লম্বা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে তার পানে তাকায়। সে জানে, পীয়ারের জীবনব্যাপী স্বপ্ন ছিল এই বৈমাত্রেয় ভাইকে ন্যায়যুদ্ধে পরাস্ত করবার। এতদিনে!

আলোটার পানে যেন ঔৎসুক্যহীনভাবে তাকিয়ে মার্লে জিজ্ঞাসা করে, "তার পর কি হলো?"

পীয়ার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে। প্রথম তো নীল নদীতে উজান যাত্রা, তার পর পশু-পৃষ্ঠে যাত্রা, উট, খচ্চর, সহায়ক কর্ম্মচারী, খাদ্য, যন্ত্রপাতি, তাঁবু আর কুইনাইন—বিস্তর পরিমাণে কুইনাইন। ও-রকম একটা কাজের মানে কি তা তুমি বুঝতে পারচ কি না জানি না। বন

আর সুড়ঙ্গের মাঝ দিয়ে জলা-ভূমি, প্রখর স্রোত আর খাতের ওপর দিয়ে এই লাইন তৈরী করতে হবে, আর এ সমস্তের প্ল্যান আর এর এষ্টিমেট—জিনিষ-পত্র, মজুর, সময়, অর্থ ইত্যাদি যা-কিছু—সমস্তের এষ্টিমেট একেবারে যতদূর তাড়াতাড়ি হতে পারে করতে হবে। সেতু তৈরী করবার জন্যে ঠিকমত আয়োজন আর গার্ডারের বন্দোবস্ত করা, তার পর কাজ যাতে ভালো হয় সব রকমে তার এষ্টিমেট করা যেতে পারে, কিন্তু তা হলেও এসব কোনো কাজেরই হবে না, যদি জার্মানেরা এসে সেই সঙ্গে বলতে পারে যে তাদের সেতুটি আমাদের চাইতে সুন্দর হবে। তারপর বেশ ভালো লোকের হাতেই ও কাজটি আট মাস সময় নিত। আর আমাকে তা করতে হবে চার মাসে। দিনের মাঝে বারো ঘণ্টা মাত্র সত্যি, কিন্তু রাত্তির বেলা আরো বারো ঘণ্টা রয়েচে। জ্বর? হ্যাঁ, তাও আছে। রোদ লেগে মৃত্যু, হ্যাঁ। মানুষ পশু দুইই তাতে সাবাড় হতে লাগল। ম্যাপগুলো বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেল। আমার শ্রেষ্ঠ সহায়কটি সর্পাঘাতে মারা গেল। কিন্তু এসব তো বাধা বলেই গণ্য হতে পারে না। এদের জন্যে কাজের দেরী তো চলতে পারে না। একজন লোক হারানোর সোজা মানে ওই একজনের কাজ আমাকে বেশি করতে হবে। দুটি মাস ধরে আমার মাথার পেছনটায় যেন অবিরাম লোহার হাতুড়ি পিটতে লাগল, রাত্তিরে দুটি ঘণ্টা চোখ বুজতাম, তখনও মাথার ভেতর আগুনের মত সাপ কিলিবিলি করতে লাগল। শ্রান্তির কথা বলচ? আয়নায় মুখ দেখতাম, মনে হতো যেন আমার মাথায় দুটো রক্ত গোলক বসানো রয়েচে। কিন্তু চার মাস যখন হলো তখন আমি চীফ-এর আফিসে ফিরে এলাম।”

“আর—আর ফার্দিনান্দ হল্ম্?”

“তার আগের দিন এসেছিল সে।”

মার্লে আসনে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। "তাহলে, সেই জিতল ?"

পীয়ার আরেকটা সিগারেট জালে, সিগারেট দিয়ে ধোঁয়া যেন বেরোয় না,—সে বলে, "না, আমি জিতলাম। সেই থেকেই আবিসিনীয়াতে আমি রেলওয়ে তৈরী করতে আরম্ভ করলাম।"

"এই নাও শ্যাম্পেন"—মার্লে বলে। গেলাসে সুরা যখন ফেনায়িত হয়ে ওঠে মার্লে উঠে' পীয়ারের উদ্দেশে তা পান করে। মার্লে বলে না কিছুই, শুধু আধখোলা চোখে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। কিন্তু পীয়ারের পা থেকে মাথা অবধি যেন আগুনের ঢেউ খেলে যায়।

"আজ আমার বাজাতে ইচ্ছে করচে"—মার্লে বলে।

প্রায়ই পীয়ার তাকে বাজাতে বলত। কিন্তু মার্লে কদাচিৎ বাজাত। বিয়ে হবার পর থেকে মার্লে বেহালা স্পর্শ করতেই চাইত না। হয়ত মনে তার শঙ্কা ছিল যে, তাতে তার পুরানো আশাগুলো জেগে উঠে তার শান্তি নষ্ট করবে।

পীয়ার সোফায় ব'সে সামনের দিকে ঝুঁকে দুহাতে মাথাটা চেপে ধ'রে শুনতে থাকে। লাল পরিচ্ছদে মার্লে music stand-এর সামনে, হলদে আলোয় আরক্ত মুখে দীপ্তি মেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজাতে থাকে।

হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে, মার্লে টেলিফোনের কাছে যায়। "মা, মাগো—আছ কি ? ওঃ কি সুন্দর দিন আজ আমাদের গেছে।" মার্লে আরো কত কি বলতে থাকে ; এই আনন্দময় দিনটি তার অন্তরে যে আনন্দ নিয়ে এসেচে, তার কয়েকটি রশ্মি প্রেরণ ক'রে সে তার মায়ের অন্তরটিকে আলোকিত ক'রে তুলতে চায়।

একটু পরে পীয়ার বিছানায় শোয়, মার্লে তখনো প্রসাধনের জন্য ঘরের মাঝে ঘুরে বেড়ায়। লম্বা সাদা গাউন প'রে মার্লে তার সামনে সবুজ আবরণ দেওয়া ছোট আলো বসানো প্রসাধন-আধারের সামনে দাঁড়িয়ে

রাত্তিরের জন্ম চুলের একটি দীর্ঘ বিনুনী বাঁধে,—পীয়ারের দৃষ্টি মার্লেকে অনুসরণ করে। কেউই কথা বলে না। পীয়ার আয়নায় মার্লের মুখ দেখতে পায়, দেখে মার্লের রহস্তময় দৃষ্টি তার পানেই মেলে রয়েচে, তার কেশ-সুগন্ধিতে হাওয়ার মাঝে যৌবন জাগে যেন।

মার্লে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসে। পীয়ার চুপ ক'রে থাকে, উজ্জ্বল তার চোখ দুটি ইঙ্গিতে তাকে ডাকে। সারা সন্ধ্যা যা কিছু ঘটেচে —তাদের বেড়ানো, বেগুনী সন্ধ্যায় ফিরে আসা, তাদের ছোট্ট ভোজ, পীয়ারের গল্প, সুরা—সমস্ত কখন যেন তাদের অন্তরে ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সেই ভালবাসা এখন তাদের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ওই যে যুগের পর যুগ অনন্ত অন্ধকারের দিকে প্রয়াণ করচে, ওই যে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুলোকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্চে, তাদের স্মৃতি, অনন্ত-কালের কঠোর শীতল নিশ্বাস স্পর্শ হয় তো তখনো তাদের মন থেকে মুছে যায় নি, তবু তা সত্ত্বেও আসন্ন মুহূর্ত্তগুলির মধ্যে, তাদের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে যে পরিপূর্ণ আনন্দ-জগৎখানি বিধৃত, তা সমস্তকে ছাড়িয়ে গেল; এই বেঁচে থাকা যে কি পরমাশ্চর্য্য তাই মনে করে বিশ্বের পানে একটি স্তুতি-সঙ্গীত প্রেরণ করবার জন্যে পীয়ার আকুল হয়ে উঠল।

মার্লে কেন যে এত দেরী করচে, পীয়ার বুঝতে পারে। মার্লে তাকে বিস্মিত করতে চায়, তার হৃদয়ে যে করুণা রয়েচে তাই বোঝা-বার এ একটি ইঙ্গিত। মার্লের লঘুনিশ্বাস ঘরের বায়ুমণ্ডলকে প্রেমে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে লাগল।

রাতের বেলা বাইরে হ্রদের বরফে নতুন নতুন ফাটল ধরার উচ্চ শব্দ শোনা যেতে লাগল। যে ছাতের নীচে তারা শুয়ে ছিল তার ওপরে শীতের আকাশ তারায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এর পর বছর-কয়েক পীয়ার কোনোটার পেছনেই বেশি সময় খরচ না করে এষ্টেট আর কারখানা চালালো। নায়েব ছিল, ম্যানেজার ছিল, কাজ তার অভ্যস্ত পথে এক রকম ভালোই চলতে লাগল। এই সময়টা পীয়ার নিজে বাস্তবিক কি ক'রে কাটাল একথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তা হলে তার উত্তর দেওয়া পীয়ারের পক্ষে শক্ত হবে। সে যেন অস্পষ্ট কি একটা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়িয়েচে। কি যেন নাই, কি যেন হারিয়েচে—যার পরিপূর্তি এখন করা চাই। এবার জ্ঞান নয়—জীবন—তার স্বদেশের জীবন, তার যৌবনের জীবনকে ধরবার জন্য সে হাত বাড়ায়। প্রথম বয়সে তার মাঝে যে যৌবন স্বচ্ছন্দ প্রকাশের সুযোগ পায় নি, সেই যৌবন এখনো তার মাঝে অবরুদ্ধ থেকে প্রকাশ খোঁজে।

লোরেঙে আনন্দ-উৎসব জমে। শীত-সন্ধ্যায় দীর্ঘ শ্লে-শ্রেণী সহর থেকে উঠে আসে—আবার ফিরে যায়। গেলাসে আর ফুলে টেবিলগুলো সাজানো হয়, ঘরগুলো আলোকে উজ্জল হয়ে ওঠে, সুরাও চমৎকার। কখনো কখনো ছোট সহরের পথে জ্যোৎস্নালোকিত দীর্ঘ রজনী-বেলা উল্লাসের কলকোলাহলে ভদ্র নাগরিকেরা জেগে ওঠেন, রাতের পোষাকেই বাতায়নের পাশে গিয়ে দেখেন শ্লে-গুলো ঘণ্টার শব্দ করতে করতে লাফিয়ে নীচের দিকে আসচে,—নৃত্য-ভোজের পর তরুণের দল অনেক ওপরে পাহাড় থেকে বনভোজন সেরে হাসির ঢেউ তুলে গান গাইতে গাইতে আসচে। কতকটা ভাঁড় হিসেবে পরিচিত, নব বিবাহিত একজন যুবক উকীল আর-কার স্ত্রীর কোলে ব'সে কন্‌-সার্টিনা বাজায় আর উচ্চ-

কণ্ঠে গান গায়। লোকেরা বলে, "সেই লোরেণ্ডের লোকটির কাণ্ড আর কি! ও লোকটি আসার পর থেকে এ জায়গা যেন আর সেই জায়গাই নেই।" এই ব'লে মাথা নাড়তে নাড়তে, কালে কালে এসব কি হ'তে চলল ভেবে বিস্ময়-প্রকাশ করতে করতে তারা আবার শুতে যায়।

পীয়ারও মাঝে মাঝে আশে-পাশের বড় বড় বাগান বাড়ীতে পার্টি হ'লে যায়, সারা রাত তাস খেলা চলে; যাঁরা নিমন্ত্রণ করেন তাঁরা সব ফ্যাসান দুরস্ত লোক, ভোরের বেলা ঘরে ঘরে শ্যাম্পেন পাঠিয়ে দেন, এখন গণিত কিম্বা ধর্ম্ম নিয়ে আর নয়—পীয়ার চায় এখন তার স্বদেশের গ্রাম্যজীবনের কতকটা একেবারে নিজস্ব ক'রে নিতে। নিজের দেশে পরদেশীর মত হয়ে সে থাকবে না। সে চায় শক্ত ক'রে মাটি আঁকড়ে ধরতে, যাতে সে আর আর লোকের মত মনে করতে পারে যে, এই জগতে একটি জায়গা তার একেবারে আপনার।

সূর্য্যালোকিত কোনো এক জুন দিবসে পীয়ার মার্লের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায়, মার্লে তার একপেশে হাসিটি ঈষৎ হেসে সদ্যোজাত মেয়েটিকে বাহুর উপরে রেখে শুয়ে থাকে।

"পীয়ার, এর নাম কি হবে?"

"কেন, সে তো অনেক আগেই আমরা ঠিক করেছি, তোমার মায়ের নামে ওর নাম হবে।"

ছোট্ট লাল মুখখানিকে নিজের বুকের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মার্লে বলে, "ওর নাম হবে লুইসে।"

এই ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মত। মার্লে হয় ত কয় সপ্তাহ ধরেই মনে মনে এই সঙ্কল্প করছিল, এখন স্বতোচ্ছ্বসিত আদরের মত অকস্মাৎ পীয়ারকে সে আচ্ছন্ন করল, এবারকার এই আদর কিন্তু তার অন্তরতম আত্মাকে স্পর্শ করল।

পীয়ার পরিহাস করবার ক্ষীণ চেষ্টা ক'রে বলে, "তা আর কি করবো, আমার বাড়ীতে তো আর আমার মত চললো না কোন দিনই। কর যা তোমার ইচ্ছে—" ব'লে মার্লের কপালে হাত বুলায়। মার্লে বুঝতে পারে, পীয়ারের অন্তরে কি রকম আলোড়ন চলচে, বুঝে মার্লে তার পানে চেয়ে উজ্জ্বলতম হাসি হাসে।

ঘাস-কাটার প্রথম দিকটায় একদিন ঘাসের স্তূপের ওপর মাথা রেখে সূর্য্যালোকিত পাহাড়ের পাশে শুয়ে শুয়ে পীয়ার তার লোকদের কাজ করা দেখছিল। হ্রদের পাশে ঘাসকাটা যন্ত্রের গুঞ্জন হচ্ছিল, সুমুখে ঘোড়ার টানাটানি আর পেছনে মানুষের বসে বসে হাঁকাহাঁকি চলছিল। তার চার দিকের সমস্তটা ভূদৃশ্য তখন গ্রীষ্মকালের আর প্রাচুর্য্যের ইঙ্গিতে ভরা। পীয়ার বিশ্রাম-শান্তিতে মগ্ন হয়ে শুয়েছিল।

একটা ছেলে-গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে ক্ষেতের রাস্তা দিয়ে হাল্কা পোষাক পরা হলদে স্ট্র-হ্যাট পরা একটি নারী আসে। এ হচ্চে মার্লে; মার্লে গুন্ গুন্ ক'রে গান গায়, আর চার দিকে তাকায়। শিশুটি হবার পর থেকে মার্লের মন শান্ত হয়ে গেছে; সঙ্গীত দিয়ে জগৎ জয় করবার স্বপ্ন যে আর সে দেখে না, তাতে কোনো সংশয় নেই—ছোট্ট গাড়ীতে ছোট্ট প্রাণীটি এখন তার সব স্বপ্ন আত্মসাৎ করেচে। এর আগে মার্লের দেহটি এমন মসৃণোজ্জল, হাসিটি এমন আরক্ত ছিল না; তার যৌবন যেন এই সর্ব্বপ্রথম তার পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেচে, তার চোখ দুটি যেন মধুর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে পীয়ার নেমে এসে নিজেই ঘাসকাটা যন্ত্রটিকে চালায়। তার স্ত্রী-পুত্রের জন্য কোনো না কোনো রকম কাজ করতে তার বড় ইচ্ছা করে।

হঠাৎ পীয়ার থামে, মেশিন থেকে নেমে তার চার দিকে ঘুরে ঘুরে

খুব ভাল করে দেখে। মুখখানি তার মনোযোগে ভরে ওঠে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণভেদী হয়ে ওঠে। মেশিনের কাঁচিগুলোর কল-কব্জার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবে।

এর মানে? পীয়ারের মনে একটা আইডিয়া (পরিকল্পনা) কাজ করতে আরম্ভ করল। এখনো অস্পষ্ট সে চিন্তা—তাকে ঠেলে ফেলবার সময় আছে এখনো—ফেলবে কি?

উষ্ণ-কোমল দিন আর জ্যোতির্ময়ী রাত্রি আসে। জেগে থেকে সূর্য্যের আবির্ভাব দেখতে কি সুন্দর, ভেবে কোনো কোনো দিন ঘুম আর আসতে চায় না।

এমনি এক রাত্রে সে জেগে ওঠে, উঠে কাপড় পরে। কয়েক মিনিট পরে আস্তাবলে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হয়, তারপর পীয়ার বাদামী ঘোড়াটাকে নিয়ে বাইরে আসে। পীয়ার ঘোড়ায় চড়ে বসে। তার পর ড্রিল স্যুট আর কর্ক-হেল্‌মেট্‌-পরা একটি শুভ্র মূর্ত্তি পথ দিয়ে দুলকি চালে এগিয়ে যায়।

কোথায় চললো সে? কোথাও নয়। একটা নতুন কিছু করার মতলব—অনভ্যস্ত মুহূর্ত্তে উঠে, জুলাই প্রভাতের আবির্ভাব দেখতে চায় সে।

ঘোড়া-চড়ার আনন্দ উপভোগ করতে করতে পীয়ার স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলতে থাকে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ঘর বাড়ী তখনো নিদ্রামগ্ন। আকাশ তখন মুক্তার মত সাদা, এখানে ওখানে কয়েকটি সোণালী মেঘ নীচে হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হচ্চে। প্রশস্ত প্রান্তরে তখনো নানা বর্ণের ফুলের কার্পেটখানি ছড়ানো, হাওয়ায় দেওদার, মাঠের ঘাস আর পাতার সুগন্ধ। পীয়ার ভারি নিশ্বাস নেয় টেনে টেনে, আর জোরে গান গাইতে ইচ্ছা করে তার।

যে রাস্তাটি পাহাড়ের ওপর-উঠে গেছে পীয়ার সেই পথ ধরে, মাঝে মাঝে ফটক খোলবার জন্যে নামেও। কত খামার, কত কুটীর পেরিয়ে উর্দ্ধে—আরো উর্দ্ধে উঠতে থাকে, শেষে সবচেয়ে উঁচু জায়গায় এসে একটা খোলা জায়গায় থামে। বাদামী ঘোড়াটা ঘাড় উঁচু ক'রে হাওয়াটাকে শোঁকে। যে-সব গাছ থেকে শিশির প'ড়ে ঘোড়া আর আরোহী ভিজে গেল, সেই গাছগুলি আসন্ন সূর্য্যের প্রথম রশ্মিপাতে আরক্তিম হয়ে ওঠে! বহুনিম্নে হ্রদের বুকে নিদ্রিত আকাশ পর্ব্বত ঘর বাড়ীর প্রতিবিম্ব পড়ে। পূর্ব্বাকাশে রক্ত শিখা ওই দেখা দেয়—তার পর সূর্য্য—তার পর, দিন।

ঘোড়া এগুতে চায়, খুর দিয়ে মাটিতে লাথি মারে অধীর ভাবে, কিন্তু পীয়ার তাকে রোকে। ব'সে ব'সে হেল্‌মেটের আড়াল থেকে সূর্য্যোদয়ের পানে তাকিয়ে থাকে, তার মনের মাঝে একটা অদ্ভুত অনুভূতির তরঙ্গ জাগে।

জীবনে এর চেয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের উচ্চগ্রামে সে কখনো পৌঁছুবে এটা অসম্ভব ব'লে মনে হয়। এখনো সে সবল, তরুণ; তার দেহের সব ইন্দ্রিয়গুলি একটি সুন্দর সামঞ্জস্যে মিলিত হয়ে কাজ করে চলেচে, মনের ওপর কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো পিষে ফেলবার মত দায়িত্ব নেই; তার অসম্ভব স্বপ্নের কবল থেকে মুক্ত ভবিষ্যৎ দিবালোকে সুস্পষ্ট এবং শান্ত। জ্ঞানের ক্ষুধা তার মিটেচে; তার মনে হয়, যা-কিছু সে শিখেচে, দেখেচে, সংগ্রহ করেচে সেই সব তার মনে এখন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করেচে।

কিন্তু তার পর—তার পর কি?

যে প্রকাণ্ড মানবাদর্শ তোমার স্বপ্নে জেগেছিল, তাকে তোমার মধ্যে জীবন্ত করতে পেরেচ কি?

মানবজাতির উন্নতি সম্বন্ধে যে সব মামুলি কথা—তার উচ্চতর রূপে বিকশিত হবার সংগ্রাম, বহু বিচিত্র পথে অনন্তের পানে, যাকে ভগবান বলে, তার পানে, অন্ধ-হাতড়ানোর কথা—তুমি জান।

উদ্ভিদ্ জীবন সম্বন্ধে কিছু তুমি জান; পাখীর বাসা যে একটি রহস্য, তাকে তুমি পূজার অর্ঘ্য দিতে পার। শিলাস্তূপের দিকে চেয়ে তুমি হাজার হাজার বছর আগেকার তুষার পর্ব্বতের ঘর্ষণ চিহ্ন দেখতে পাও, সৌরমণ্ডলের কর্ম্মকলাপের আভাষ পাও। হেমন্ত সন্ধ্যায় নক্ষত্র রাশির পানে চাও, তোমার ওপরে ওই যে আলোক, ওই যে মৃত্যু, ওই যে আকাশের অপরিমেয় দূরত্ব, তোমার অন্তরাত্মার মধ্যে সুগম্ভীর শিহরণ জাগায়।

এই সমস্ত তোমার সঙ্গে মিশে গেছে। এই বিশ্ব জগতের যত দূর তোমার দৃষ্টি যায়—ততখানির ধারণা করতে পারলে, ততখানি দিয়ে তোমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং চিন্তাকে পরিপূর্ণ করতে পারলেই তবে তুমি জীবনের যা আনন্দ তাকে পেতে পার।

কিন্তু তার পর? এতেই কি হলো? এই টুকুতেই তোমার বিশ্রাম বিরতি সম্ভব?

তুমি কি এমন একটি নূতন সোপান গড়েচ, যার পরে দাঁড়িয়ে অন্য মানুষেরা বলতে পারবে—এখন আমরা আগের চাইতে বেশি দেখতে পাচ্চি!

তোমার অন্তরতম সত্তার মূল্য কি—যদি তা কর্ম্মে না প্রতিফলিত হলো?

ধর, এই জগতে এক দিন অতি-মানব ছাড়া আর কেউ রইল না—কিন্তু তাতে লাভ কি হলো, তারাও তো মরবে?

তোমার ধর্ম্ম কি? বিশ্বাস কি?

হায়রে, নির্ব্বাসনের অনুভূতি! অন্তরাত্মার গৃহহীনতা! কতবার তুমি আর মার্লে হাতে হাত রেখে একসঙ্গে তোমাদের চিন্তাকে এই ভূলোকের ওপর দিয়ে, তারকারাশির মাঝ দিয়ে প্রেরণ করেচ, কোনো একটি সত্তার সন্ধানে—যার কাছে তোমরা তোমাদের প্রার্থনা নিবেদন করতে পার—কৃপা আর অনুগ্রহের ভিখারী কান্নার দাসত্ব চাওনি, চেয়েচ এই পরম দান—জীবনের জন্য সানন্দ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে।

কিন্তু কোথায় তিনি ?

নাই তিনি। তবু—তিনি আছেন।

কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ ওই সন্ন্যাসী হচ্চেন রুগ্ন এবং বৃদ্ধের ভগবান। আমাদের ভগবান কোথায়? নব্য মানব সবল, বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় দীক্ষিত মানব তার অন্তরাত্মার শাশ্বত স্তবগীতি, পবিত্র ধর্ম্মসঙ্গীত গাইবে, সেই মন্দির কোথায়?

দূরে পর্ব্বত চূড়ার পেছন থেকে সূর্য্য ওঠে; দেওদার বনের লক্ষ লক্ষ শীর্ষে সোনা ছড়ায়। জামার হাতায় আর হাতে শিশির-বিন্দুগুলো ঝিকমিক করতে থাকে, পীয়ার স্বমুখের দিকে ঝুঁকে অধীর অশ্বের ঘাড় চাপড়ায়।

তখন রাত্রি দুটো বাজে। মেঘে আর জলে সর্ব্বত্র প্রভাতের অরুণ-শিখা জ্বলে, প্রান্তরে শিশির আর প্রজাপতির পাখার মুক্তারাশি চিক্‌মিক্ করতে থাকে।

"এখন বিজু—চল্ বাড়ী চল্।"

বাদামী ঘোড়াটা ফোঁস ফোঁস করে, আর লাফিয়ে চলে। পীয়ার তৃণাচ্ছন্ন বন্য পথ ধ'রে দ্রুত নেমে যায়।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

"হেই, মার্লে, আমাদের এখানে বড় বড় লোকেরা আসচেন—আরে কোথায় গেলে তুমি?" খোলা একখানা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে পীয়ার এঘর-ওঘর করতে করতে শেষে নার্সারীতে তার স্ত্রীকে দেখতে পায়, বলে, "তুমি এইখানে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যে রকম চেঁচাচ্ছ, সমানে আমি শুনতে পেয়েচি। কারা আসচেন?"

"ফার্দিনান্দ হল্‌ম্‌ আর ক্লাউস ব্রক। যা হোক্‌ নামকরণ উপলক্ষে তারা আসচে তা হলে, কি বল মার্লে?"

মার্লেকে ফ্যাকাশে দেখায়, গাল একটু বসা। আরো দু-বছর গেছে, মার্লের কোলের পরে তাদের দ্বিতীয় সন্তানটি—বিস্ময়ে-ভরা বড় বড় চোক, ছোট ছেলেটি!

মার্লে ছেলের জামাটা খুলতে খুলতে বলে, "তোমার খুব ভালো লাগচে, পীয়ার!"

"হ্যাঁ, আমি নিমন্ত্রণ করেচি বলে, সেখান থেকে এই এতটা পথ আসা তাদের পক্ষে একটা খুবই চমৎকার কাজ নয়? ওহো! তাড়াতাড়ি করা দরকার, ঘরবাড়ী একটু পরিষ্কার করতে হবে যে!"

সবটা জায়গা অল্প সময়ের মধ্যেই ওলোট-পালোট হয়ে যায়, বাগানের রাস্তা আর অঙ্গনের জন্য গাড়ী গাড়ী বালু আসে, চিত্রকরেরা বাড়ীঘর আবার রাঙাতে থাকে প্রাণপণে। আর বেচারী মার্লে ভালো করেই জানে যে অন্দরে যদি অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় তাহলে ভয়ানক কাণ্ডই হবে।

অবশেষে আগষ্টের সেই আতপ্ত দিনটি আসে. প্রত্যাশিত অতিথিদের সম্মানার্থে পতাকা ওড়ানো হয়। আবার পাহাড়ের ঢালু থেকে ঘাসকাটা কলের আর জমিতে সেই মই-দেবার কলের গুঞ্জন কানে আসে ; নিস্তব্ধ বাতাসে সহরের চিমনিগুলো থেকে ধূমস্তম্ভ সোজা উপরে উঠতে থাকে। পীয়ার ভোরে ওঠে, শেষবার সব আগা-গোড়া ভালো ক'রে দেখে—মার্লে যে গ্রীষ্ম-পোষাক পরবে তা থেকে সুরু করে আস্তাবলের ঘোড়া পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে না ; ঘোড়ার চামড়া আবার যত্নের চোটে ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে। মার্লে বোঝে। ভালো পোষাক-পরা ডাক্তার-নন্দনের পাশে সে ছিল জেলের ছেলে আর বিখ্যাত হল্‌ম্ পরিবারের সম্পর্কে তার মর্য্যাদা আরো কম। পীয়ার এখনো ভেতরে এমনি ছেলে মানুষ যে সে নিজের শক্তি সামর্থ্যকে এখন পুরোপুরি জাহির করতে চায় তাদের কাছে।

ষ্টীমবোট জেটিতে যখন নৌকাখানি এসে নামবার জায়গাটার পাশে থামে তখন সেখানে একদল অলস কৌতূহলী লোকের ভিড় বাঁধে। লোরেঞ্জের গাড়ীর অশ্বযুগল মাছিগুলোর তাড়নায় মাথা দোলায়, এদিক ওদিক গায়ের চামড়া কোঁচকায় আর খুর দিয়ে মাটিতে লাথি মারে। কিন্তু অবশেষে তারা তাদের যাত্রীদের পায় ; তখন তাদের চলতে দেওয়া হয়। যে সব লোক খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, কয়েকটা বিকট লাফ মেরে তাদের সরিয়ে দিয়ে তারা যাত্রা করে, লোকেরা কিন্তু গাড়ীতে ইঞ্জিনীয়ারকে আর দুজন অপরিচিত লোককে দেখতে পায় ; তারা তিনজনেই হাসে আর অঙ্গভঙ্গী ক'রে এক সঙ্গে কথা বলতে থাকে। তারপর ফিয়র্ডের শান্ত জলরাশির পাশ দিয়ে ধূলিপুঞ্জ ওড়াতে ওড়াতে নিমেষের মধ্যেই ঘূর্ণাবেগে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

লোরেঞ্জের আস্তাবলের একটা চাকর তাদের পেছনে একটা

মালগাড়ী হাঁকিয়ে চলতে থাকে, গাড়ীতে অনেকগুলো পেতলমোড়া চামড়ার ট্রাঙ্ক, আর বোধ করি কাঠের একটা মস্ত সিন্দুক,—ভেতরে নিশ্চয়ই ভয়ানক ভারী কিছু হবে।

মার্লের প্রসাধন শেষ হয়, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে, হাল্কা গ্রীষ্ম-পোষাক সুন্দর বলেই তার মনে হয়, ঘাড় আর কোমরের লাল ফিতে তার মনের মতই লাগে। তখন বাইরে চাকার শব্দ হয়, মার্লে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে যায়।

পীয়ার লাফিয়ে নামে, বলে, "এই তো তাঁরা; ইনি ফার্দিনান্দ পাশা, নতুন সাহারা রাজ্যের গভর্ণর জেনারেল—আর ইনি হিজ হাইনেস্ দি খিদিবের পার্শ্ব-রক্ষী খোজা আর হুঁকো পরিষ্কারক।"

সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া একটি দীর্ঘাকৃতি লোক মার্লের দিকে এগিয়ে আসে। চুলগুলি সাদা, শুকিয়ে যাওয়া মুখখানি পরিষ্কার করে কামানো, ইনি ফার্দিনান্দ হল্‌ম্। মার্লের দিকে শুকনো অস্থিসার হাতখানি এগিয়ে দিয়ে সে বলে, "কেমন আছেন মহাশয়া?" তারপর চারদিকে তাকিয়ে পাঁসনেটা লাগিয়ে বলে, "বাঃ, এতো একেবারে ব্যারনের বাড়ীর মতো।"

ফার্দিনান্দের সঙ্গীটি একটি গোলগাল মোটা-সোটা ধরণের ভদ্রলোক, ছোট্টো কালো ছাগল-দাড়ি, কালো কালো চোখ দুটি সব সময়ে মিট-মিট করছে। কিন্তু হাসিটি একেবারে প্রফুল্লতায় ভরা, আর হাত-ধরাটি যেন আন্তরিকতাপূর্ণ মনে হয়। এটি হচ্ছে ক্লাউস ব্রক।

পীয়ার বন্ধু-যুগলকে ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ভিন্ন ভিন্ন বাতায়ন থেকে দৃশ্য দেখায়। ক্লাউস শেষে হেসে উঠে মার্লের দিকে তাকিয়ে বলে, "ও সেই আগের মতই আছে দেখছি, অবিশ্যি

একটু হৃষ্টপুষ্ট হয়েচে, বৌ-ঠাকুরুণ দেখচি ওর বেশ যত্ন করচেন"—বলে অভিবাদন ক'রে মার্লের কর চুম্বন করে।

'হক আর সেলজার' (পানীয়) তাদের জন্য তৈরী করা ছিল, গরমের দিনের উপযোগী ব'লে মার্লের এই ব্যবস্থা। অতিথি-যুগল প্রত্যেকেই দু-গ্লাস ক'রে পান ক'রে বললে, "আঃ কি মিষ্টি!" পীয়ার মার্লের পেছনে এসে, তার হাতে হাত চাপড়ে ধীরে ধীরে বললে, "ধন্যবাদ মার্লে, চমৎকার ব্যবস্থা করেচ তুমি!"

ফার্দ্দিনান্দ অকস্মাৎ ব'লে ওঠে, "ভালো কথা, একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। একটু টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?"

ক্লাউস হেসে ব'লে ওঠে, "ব্যস্, চললো, আর কি থাকতে পারে ও! ইওরোপের সারা পথ তো টেলিগ্রাম চলেচে। কিন্তু এখানে আবার আরম্ভ করবার আগে ভেতরে একটু বসতে দাও হে!"

পীয়ার বলে, "এসো এই টেলিফোন্।"

তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ক্লাউস হেসে মার্লের দিকে ফিরে বলে, "যাক্, তা হলে সত্যি সত্যি আমি পীয়ারের স্ত্রীর সামনে—তার স্ত্রীকে একেবারে রক্তে-মাংসে দেখচি! পীয়ার-গৃহিনীকে তা হলে দেখতে এই এমনটি! যত সৌভাগ্য চিরকালই ওর!" আবার মার্লের হাতখানি নিয়ে ক্লাউস চুমো খায়। মার্লে হাত সরিয়ে নিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

"মিষ্টার ব্রক, আপনি তা হলে বে' করেন নি?"

"আমি? তা হ্যাঁ—নাও। একবার একটি গ্রীক মেয়েকে বে' করেছিলাম। কিন্তু সে চম্পট দিলে। আমার কপাল!" এই ব'লে চোখ মিটমিটিয়ে এমনি অদ্ভুত মুখভঙ্গী করলে যে, মার্লে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

"আর আপনার বন্ধু, ফার্দিনান্দ হল্‌ম্‌?

"সে? তা প্রিয় মহাশয়া, আপনার সামনে বলচি ব'লে কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয়, তার প্রাসাদের সঙ্গে লাগাই ছোটো-খাটো একটি বাছাই করা 'হারেম' আছে।"

মার্লে বাতায়নের দিকে ফিরে মাথা নাড়ে আর হাসে।

ঘণ্টাখানেক পরে পরিষ্কার হয়ে কাপড় চোপড় বদ্‌লে অতিথিরা নীচে নেমে এলো; সামান্য জলখাবারের পর পীয়ার তাদের জায়গাটা দেখাবার জন্যে নিয়ে গেল। পীয়ার আরো কয়েকটা নতুন বাড়ী জুড়েচে আর নতুন জমির আবাদ করেচে। যখন সে এসেছিল তখন খামারে গাই ছিল চল্লিশটি, এখন ষাটের চাইতে বেশি হয়েচে। "অবিশ্যি তোমার ফসল তো রেল-গাড়ী বোঝাই হয়ে আসে, তার কাছে এ-সব কিছুই নয়।"

পীয়ার বলে, "কিন্তু ভাখো, এটা হচ্চে আমার বাড়ী।" ব'লে হাত দিয়ে চারদিকের বাড়ী আর খামারের দিকে ইসারা করে।

পরে তারা হাল্কা দু-চাকার গাড়ীতে ক'রে ওয়ার্কশপ দেখতে যায়, এখানে পীয়ার ছোট ব'লে কোনো অজুহাত দেখাবার চেষ্টা করে না। এমনিভাবে সে তার ছোট্ট কারখানাটিকে দেখায়, যেন এটা কোনো একটা জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্প-কেন্দ্র, তার এই গম্ভীরভাব দেখে সঙ্গীরা আড় চোখে তার দিকে চেয়ে অতি কষ্টে হাসি চেপে রাখে।

মজুরেরা সম্মানার্থে তাদের টুপিতে হাত দেয়, আগন্তুকদের পানে কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে চায়।

শেষে ফার্দিনান্দ হল্‌ম্‌ না ব'লে আর পারলে না।

"নরওয়ের মাপ-কাঠিতে এই সব ব্যাপার দেখে বেশ আমোদ পাওয়া গেল।"

পীয়ার সত্যি সত্যি খুশী হ'য়ে উঠে বলে, "হ্যাঁ, চমৎকার নয় কি! মালিক যদি অন্তরে শান্তি নিয়ে ভালোভাবে সময় কাটাতে চায়, তা হলে তার কারখানা ঠিক এই আকারের হওয়া উচিত।"

ফার্দ্দিনান্দ হলুম্ আর ব্রক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই পীয়ার তাদের নিয়ে পাশের ঘরে ঢোকে, সেখানকার যন্ত্রপাতির সঙ্গে কারখানার কোনই সম্পর্ক নেই।

ক্লাউস বলে, "ত্যাখো হে, এ হচ্চে মণি-কুঠরী, পীয়ার নিশ্চয় এখানে একটা নতুন কোনো ব্যাপার নিয়ে আছে। তা না হয় তো কি বলেচি!"

পীয়ার এক জোড়া তেরপল্ সরিয়ে একটা মামুলি ঘাস-কাটা কল দেখায়, আর তারি পাশে তার উদ্ভাবিত একটি নতুন রকমের মডেল দেখায়।

"এখনো এটা শেষ হয়নি?"

পীয়ার বলে, "কিন্তু আসল সমস্যাটার মীমাংসা ক'রে ফেলেচি। সেকেলে সেই একটা ব্লেড বিশ্রী ছিল, টেনে চলতো, জানই, কিন্তু দুটো ব্লেড দিলে—এক রকম কাঁচি আর কি—ঢের শিগ্‌গির কাজ হবে।" তারপর কলকজাগুলো আগের চাইতে কতখানি সোজাসুজি হয়েচে আর কতখানি হাল্কা হ'য়েছে, তাই নিয়ে একটি ছোটো বক্তৃতা।

ক্লাউস বলে, "তবে আর কি! কলম্বসের ডিমের পুনরাবৃত্তি!" ফার্দ্দিনান্দ জানালা দিয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে, "এই পেটেণ্টের দাম দশ লাখ হওয়া উচিত।"

পীয়ার ফার্দ্দিনান্দের দিকে চতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "অবিশ্যি আসল কথা হচ্চে চাষাদের জন্যে কাজটাকে সহজ করা আর যন্ত্রটাকে সুলভ করা।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একটি ভোজ উৎসব হল। যখন সুরা পরিবেশন হতে লাগল, ক্লাউস উল্লসিত হয়ে তার সম্বর্দ্ধনা করতে লাগল। "সত্যি তা' হ'লে একজন পুরানো বন্ধুকে পাওয়া গেল। রিয়াল লিস হোল্‌মের যে। বেশ বেশ, তা' হলে তুমি এখনো এই বেঁচে-থাকাদের জগতে আছ, বন্ধু? যখন আমরা ছোটবেলা সাথী ছিলাম, সেই সব দিন তোমার মনে পড়ে?" ছোটো গ্লাসটি উঠিয়ে, ক্লাউস তার মধ্যে আলোর খেলা দেখে, তারপর ছাত্রাবস্থায় সুরা-পার্টিতে যেমন করতো ঠিক তেমনি করে, যথাবিহিত কায়দা-মত তিন বন্ধু এক সঙ্গে সুরা পান ক'রে তাদের "প্রথম ভরা-গেলাসের" আর "দ্বিতীয়-ছোট্ট-চুমুকের" গান গায়।

কথা-বার্ত্তা বেশ সহর্ষেই চলতে থাকে, এক গল্পের পর আরেক গল্প, মার্লে কিন্তু লক্ষ্য না ক'রে পারে না যে ঠিক হাসার সময়ও ফার্দ্দিনান্দের চোখ ইস্পাতের মত জ্বলে।

মিসরের নতুন কাজ-কর্ম্মের কথা ওঠে, পীয়ার যতই শোনে, মার্লের মনে হয় যেন তার মুখ-চোকের ভাব আরেক রকম হ'তে থাকে, তার চোকেও যেন ইস্পাতের সেই চমক ফুটে ওঠে, সে কেমন একরকম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। পীয়ার কি ভাবচে যে মোটের ওপর স্ত্রী-পুত্র পুরুষের ওপর বোঝা মাত্র? পীয়ার যেন পুরোনো যুদ্ধের ঘোড়া— হঠাৎ তুরী-ধ্বনি শুনে যেন সে জেগে উঠল।

ফার্দ্দিনান্দ হল্‌ম্‌ পীয়ারের গ্লাস তুলে ধ'রে বলে, "ভালো কথা, সেখানে তোমার জন্তে একটা বেশ ছোট্টো কাজ রয়েচে।"

"তোমার অপার অনুগ্রহ! তোমার অধীনে সাব-ডিরেক্টরের কাজ নাকি?"

"কারো অধীনে তোমার কাজ অসম্ভব, তোমার কাজ হচ্চে ওপরের" —ফার্দ্দিনান্দ আঙুল দিয়ে ওপর-নীচ নির্দ্দেশ ক'রে তার উক্তিকে সুস্পষ্ট

ক'রে বলে, "ইউফ্রেটিস্ আর টাইগ্রিসের বাঁধ বাঁধার কাজ হাতে নিতে হবে, এখন শুধু কথা হচ্ছে সময়ের।"

পীয়ার চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলে, "ধন্যবাদ!"

"কাজটা কেবল ঠিক মানুষের অভাবে পড়ে রয়েচে। হবেই একদিন—হয়তো আগামী বছরই, কিম্বা দশ বছর পর—যখনি মানুষটি উপস্থিত হবে। আমি তোমার জায়গায় হ'লে, এ বিষয়টা ভাবতাম।"

সবাই পীয়ারের পানে তাকায়, মার্লেও তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কিন্তু পীয়ার হেসে ওঠে, বলে, "ওই দুটি প্রাচীন আর শ্রদ্ধেয় নদীকে বেঁধে আমার কি আনন্দটা হবে?"

"প্রথমতঃ ওই বাঁধের ফলে পৃথিবীর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কয়েক কোটি 'বুশেল' বেড়ে যাবে। তাতে কি তোমার আনন্দ হবে না?"

তাচ্ছিল্য ভরে পীয়ার বলে, "না।"

"কিম্বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উর্ব্বরা ভূমির লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইলের ওপর দিয়ে যে সোজাসুজি খবরাখবরের উপায় হবে!"

"তাতেও আমার কোনো উৎসাহ নেই"—পীয়ার বলে। ফার্দ্দিনান্দ মার্লের দিকে গ্লাস উঠিয়ে বলে, "আঃ প্রিয় মহাশয়া, একটি এনাক্রনিজম্-এর (anachronism) সঙ্গে বিবাহিত হ'লে কেমন লাগে বলুন তো?"

মার্লে জড়িত কণ্ঠে বলে, "কি—কিসের সঙ্গে?"

"বলচি আপনার স্বামীটি একটি এনাক্রনিজম্। সে যদি ইচ্ছা করে, সভ্যতার সংগ্রাম-বাহিনীর সর্ব্ব প্রথম দলকে রাজার মত, পয়গম্বরের মত চালনা করতে পারে। কিন্তু তা না ক'রে, নিজের শক্তিকে তুচ্ছ করচে; একদিন সে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, মনে রাখবেন আমার কথা। প্রিয় মহাশয়া, আপনার স্বাস্থ্য-কামনা করচি।"

মার্লে হাসে, গ্লাস ওঠায়, কিন্তু ইতস্তত: করে আর পীয়ারের দিকে আড় চোখে চায়।

"আপনার স্বামীটি এখন শুধু একজন আত্মসুখী, আনন্দময় দিনের সংগ্রাহক মাত্র।"

"আচ্ছা, এটা কি এমন কিছু খারাপ ?"

ফার্দিনান্দ অভিবাদন করে, ইস্পাতের মত চোক দুটোকে কোমল করার চেষ্টা ক'রে বলে, "সে শুধু ব'সে ব'সে তার জীবনের সোনার সুতোগুলোকে ছাড়াচ্চে।"

তরুণী স্ত্রী সাহসের সঙ্গে ব'লে ওঠে, "তাতে মন্দটা কি ?"

"এ ঠিক নয়। এ হচ্চে অমর আত্মার অপচয় করা। সোনার সুতো হলেও, বসে বসে সোনার গ্রন্থি খুলে খুলে জীবনকে উপভোগ করবার অধিকার মানুষের নেই। ব্যক্তিগত আনন্দের দিন বিস্মৃতির মাঝে মিলিয়ে যায়—কাজ থাকে। বিশেষ ক'রে আপনার স্বামীর কথা—ভালো, সে এত সুখী হবে কেন ? জগৎ-বিবর্ত্তন আমাদের কাজে লাগাবেই—আলোর জন্যে, না হয় আগুনের জন্যে। আর পীয়ার—প্রিয় মহাশয়া, আপনার স্বামী আগুন দেবার জন্যে নয়।"

মার্লে আবার পীয়ারের পানে চায়। পীয়ার হেসে ওঠে, তারপর হঠাৎ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে খানার পরে চোক নামায়।

তারপর নার্স ছোট লুইসেকে নিয়ে আসে 'শুভ-রাত্রি' বলতে, শিশুকে কোলে কোলে একজনের কাছ থেকে আরেক জনের কাছে ঘোরানো হয়। কিন্তু যখন ছোট্ট সুকেশা মেয়েটি ফার্দিনান্দ হল্‌মের কাছে আসে, হল্‌ম্‌ যেন তাকে ছুঁতে চায় না, হল্‌ম্‌ পীয়ারের পানে চায়, মার্লে সে দৃষ্টির অর্থ বোঝে, 'এই আরেক বাঁধন তোমায় বেঁধেচে !'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলে, "কিছু মনে করবেন না

টেলিফোনটা আর একবার চাই। ক্রু হল্‌ম্‌ আমায় ক্ষমা করবেন।” ব’লে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ক্লাউস তাদের পানে চেয়ে মাথা নাড়ে; হেসে বলে, “ওই মানুষটি ঘণ্টায় একখানি টেলিগ্রাম না করতে পারলে দমবন্ধ হ’য়ে মারা যাবে।”

বারান্দায় কফি দেওয়া হ’ল, পুরুষেরা ব’সে ধূমপান করতে লাগল। প্রথম হেমন্তের ধূসর গোধূলি, দূরে পাহাড়গুলো কালো, নীল; চারিদিকে উন্তানপুষ্প আর ঘাসের সুগন্ধ। কিছুক্ষণ পর মার্লে উঠে ‘শুভ-রাত্রি’ ব’লে বিদায় নিলে। যখন সে তার শয্যাগৃহে একা গিয়ে বসল, তখন খুসী হবে না বেজার হবে ঠিক বুঝতে পারল না। পীয়ারের সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার পর থেকে, পীয়ার যা-কিছু নিয়ে বেশ আনন্দে ছিল, এই অদ্ভুত লোকগুলো তাকে সেই সমস্ত থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্চে। কিন্তু বন্ধু-যুগলের প্রতি তার আচরণের পার্থক্যটা লক্ষ্য করবার মত। ক্লাউস ব্রকের সঙ্গে সে হাসি-ঠাট্টা করতে পারে কিন্তু ফার্দ্দিনান্দ হল্‌মের কাছে যেন সে সব সময় সতর্ক, নিজেকে জোর ক’রে প্রচার করতে প্রস্তুত। যখনই সে ফার্দ্দিনান্দের প্রতিবাদ করে, কতকটা সম্ভ্রমের সঙ্গে।

পূব আকাশের পাহাড়ের ওপর মস্ত হল্‌দে চাঁদ দেখা দিল, কালো জলের অনেকখানি সোনালি রঙে রাঙিয়ে গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তিনবন্ধু বারান্দায় ব’সে ওদিকে চেয়ে রইল।

একটুখানি সুরা পান ক’রে, শেষটায় ফার্দ্দিনান্দ বললে, “তা হ’লে বাস্তবিক তুমি এইখানে কুঁড়েমি ক’রে দিন কাটাবে স্থির করেচ?”

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পীয়ার বল্‌লে “আমায় বলচ কি?”

“হ্যাঁ, অনুমান হচ্চে যেন সকাল থেকে রাত এখানে তুমি শুধু আনন্দ ক’রে বেড়াচ্চ। আমি ওকে কুঁড়েমি বলি।”

“ধন্যবাদ।”

"তা ব'লে বাস্তবিক তুমি কিন্তু অত্যন্ত অসুখী। যতক্ষণ মানুষ তার শক্তি আর তার বৃত্তিকে উপেক্ষা ক'রে চলে, ততক্ষণ প্রত্যেক মানুষই অসুখী।"

হেসে পীয়ার বল্‌লে, "আরো ধন্যবাদ।"

ক্লাউস এর পর কি আসচে তারই উদ্বেগে চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসল।

ফার্দ্দিনান্দ তখনো হ্রদের পানে চেয়ে; বললে, "ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে তোমার যা কাজ, তাকে তুমি তুচ্ছ মনে কর বোধ হচ্চে।"

পীয়ার বললে, "হ্যাঁ।"

"কেন?"

"এই জন্য যে, নতুন কিছু সৃষ্টি করবার, কেবলি নতুন কিছু করবার একটা অন্তহীন ইচ্ছা আমাদের পেয়ে বসেচে, এর মাঝে আমি একটা সৌন্দর্য্যের অভাব দেখচি। আরো সোনা, আরো দ্রুতবেগ, আরো খাদ্য,—আমরা কি এইগুলোর দিকেই শুধু চলচি না?"

"ভায়া, সোনা মানে হচ্চে স্বাধীনতা। খাদ্য মানে জীবন। আর ত্বরিতবেগ আমাদের মৃত মুহূর্ত্তগুলোর ওপর দিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের জীবনের সম্ভাব্যতাকে দ্বিগুণ ক'রে দাও, মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হ'য়ে যাবে।"

"তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ ক'রে লাভটা কি? কলে-গড়া কোটি কোটি মানুষের আত্মা—এই কি তুমি চাও?"

ক্লাউস উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে ব'লে উঠল, "এ-সব তর্ক রাখো ভাই, অন্ততঃ আমাদের প্রিয় নরওয়ের কথাটাই ভাব। আমাদের জনসংখ্যা যদি এতদূর বাড়ে যাতে জগৎ আমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করবে, তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি এটাকে দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবে না?"

হ্রদের দিকে দূরের পানে চেয়ে পীয়ার বল্লে, "করবো।"

"ও, আকারে আর সংখ্যায় ছোটোর প্রতি গোঁড়ামী তোমায় পেয়েচে।"

"শ্রমিক-বাহিনী আর ফ্যাক্টরী নিয়ে নরওয়ে কলঙ্কিত হবে এ আমি দেখতে চাই না। কেন, আমরা শান্তিতে থাকতে পাব না কেন?"

জলের ওপর প্রতিফলিত জ্যোৎস্না-স্তম্ভটাকে লক্ষ্য করেই যেন ফার্দ্দিনান্দ বললে, "ইস্পাত তা হ'তে দেবে না।"

পীয়ার বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে বললে, "কি? কি বললে তুমি?"

ফার্দ্দিনান্দ অবিচলিত কণ্ঠে বলতে লাগল, "ইস্পাত শান্তি চায় না। আগুন শান্তি চায় না। প্রমিথিউস শান্তি চায় না। এখনো অনেক সোপান বেয়ে মানবাত্মাকে চূড়াগ্রে পৌঁছুতে হবে। শান্তি? না বন্ধু, তোমার আমার বাইরে সেই সব শক্তি রয়েচে যারা এই সব নিয়মিত করচে।"

পীয়ার মৃদু হেসে একটা নতুন সিগার ধরালে। ফার্দ্দিনান্দ চেয়ারে হেলান দিয়ে চাঁদকে লক্ষ্য ক'রেই যেন বলতে লাগল, "টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস, গঙ্গা আর সিন্ধু—এই সমস্তটা পৃথিবী এই সবটাকে আয়ত্ব করা, নিয়মিত করা, কর্ষণ করা, এ আর কি? কয়েকটা বছরের কাজ শুধু। শুধু সামান্য প্রারম্ভ মাত্র হয়েচে। দুশো বছর আন্দাজ চাই, তারপর আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীতে আমাদের করবার কিছুই থাকবে না। তখন অন্য জগতে উপনিবেশ বসাবার চেষ্টা আমাদের করতে হবে।"

নিমেষকাল সবাই চুপ ক'রে রইল। তারপর পীয়ার বললে, "এ সমস্ত ক'রে আমাদের লাভটা কি?"

"লাভ? তুমি কি মনে কর, মানবাত্মার গতিপথ একদিন ফুরিয়ে যাবে? পাঁচ লক্ষ বছর পরে আমরা যতগুলো সৌর-মণ্ডলের কথা জানি, সে সবগুলোই মানবাত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অবিশ্যি বাধা-বিঘ্ন হবেই। গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ বিগ্রহ হবে, গ্রহ-দেশিকতা, গ্রহ-মণ্ডলের মধ্যে একদলের বিরুদ্ধে আর এক দলের মৈত্রী সন্ধি এসব হবে। ছোটো ছোটো জগৎগুলো বড় বড় জগতের অধীন হবে। এই সব কল্পনা ক'রে উদ্‌ভ্রান্ত হবার কি আছে? এতে কি আর সন্দেহ আছে যে মানুষ আগামী লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে বিজয় অভিযানের পথে এগিয়ে যাবে? বিশ্ব-ইচ্ছা তার পথ ধ'রে চলেচে। আমাদের প্রতিরোধ করবার সাধ্য নেই। আমরা সুখী কি না একথা কেউ জিজ্ঞাসা করচে না। যে ইচ্ছা অনন্তের পানে চলেচে সে শুধু এই প্রশ্নই করচে, কাকে সে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করবে, আর কে অব্যবহার্য্য। এই মাত্র।"

পীয়ার প্রশ্ন করল, "আমি যখন মরবো, তারপর?"

"তুমি! তুমি কি এখনো নিজের নাড়ী ধ'রে ব'সে রয়েচে আর অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাচ্চ? ভায়া, তুমি নেই। আমাদের দিকে শুধু একটি ব্যক্তি আছে—সে হচ্চে বিশ্বকামনা। তারই মাঝে আমরা সব আছি! 'আমরা' বলতে আমি তাই বুঝি। আমরা সেই দিনের আশায় কাজ ক'রে চলেচি—যেদিন ভগবানের কাছে সত্যিকার মর্য্যাদা আমরা পাব। মানবাত্মা একদিন বিচার চাইবে, অলিম্পাসের কাছে, রহস্যময়ের সঙ্গে লোকাতীত সর্ব্বশক্তিমানের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ হবে সেদিন। একটা বড় রকমের বোঝাপড়াই হবে। আর দেখ, এই হচ্চে একমাত্র ধার্ম্মিক-ভাব—যা আমাদের প্রত্যেকের মাঝে জাগ্রত জীবন্ত থেকে কাজ করচে, এই একটি মাত্র ভাবনার জোরে, আমরা যে মরব,

আমরা যে পরবশ—এই কথা ভুলে মাথা উঁচু ক'রে সোজা হ'য়ে চলতে পারচি।"

হঠাৎ ফার্দ্দিনান্দ ঘড়ির দিকে তাকালে।

"কিছু মনে ক'রো না, এই আসচি, যদি টেলিগ্রাফ আফিস খোলা থাকে…" বলতে বলতে উঠে সে ভেতরে চ'লে গেল। যখন সে ফিরল তখন ক্লাউস আর পীয়ার তাদের বাল্য লীলাভূমি আর সেই সময়কার কথা বলাবলি করচে।

ক্লাউস জিজ্ঞাসা করল, "সেই যে হাঙর মারতে গিয়েছিলাম আমরা, মনে আছে?"

"খুব, খুব, সেই হাঙরটা। রাখো, তুমিই তো বীরের মত কাজ করেছিলে, না? খালি ঘুসি দিয়ে ওটাকে মেরেছিলে, তাই না? তারপর নকলের ভঙ্গীতে 'ডুরিটা কেটে ফেলো, ডুরিটা কেটে ফেলো, বাঁচতে হ'লে ডুরি কেটে দাঁড় টানো।" ব'লে পীয়ার হো হো ক'রে হেসে উঠল।

"আরে থামো থামো, আর রসিকতা করতে হবে না। কিন্তু বলতো, দেশে আসার পর আর কি সেখানে গিয়েছিলে?" গত বছর পীয়ার সেই গ্রামে গিয়েছিল বলল। তার বৃদ্ধ পালক পিতামাতা মারা গেছে, পীটার রোনিঙ্গেনও নেই। কিন্তু মার্টিন ক্রভোণ্ট আটটি ছেলে-পুলে নিয়ে একখানি ছোট্ট কুঁড়েতে এখনো বেঁচে আছে।

ক্লাউস বললে, "বেচারা!"

ফার্দ্দিনান্দ হলুম্ আবার ব'সে চাঁদের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললে, "তোমাদের পুরোনো এয়ার বুঝি! বেশ তো আমরা তাকে এক হাজার ক্রাউন পাঠাই না কেন?"

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে ফার্দ্দিনান্দ তার ওয়েষ্ট-কোটের পকেট

থেকে পাঁচশ ক্রাউনের একখানি নোট বার ক'রে বললে, "আশা করি আমাকেও এতে যোগ দিতে দেবে, কিছু মনে করবে না তো ?"

পীয়ার তার দিকে চেয়ে নোটখানি নিলে, ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে নোটটা রেখে বললে, "বেচারা বুড়ো মার্টিনের জন্য আমার আহ্লাদ হচ্চে, এতে তার জন্যে পনের শো ক্রাউন হ'ল।" ক্লাউস ব্রক একবার পীয়ারের দিকে আরেকবার ফার্দ্দিনান্দের দিকে চেয়ে একটু হাসল। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক কথাবার্ত্তার পর সে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা পীয়ার, ব্রিটিশ কারবাইড কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটা দেখেচ ?"

"না, কিসের ?"

"হ্রদ আর প্রপাতগুলো সুদ্ধ বেস্না নদীটায় বাঁধ বেঁধে তাকে কাজে লাগাবার জন্য তারা দর চেয়েচে। ও কাজটা তোমার লাইনে।"

ফার্দ্দিনান্দ তীব্র কণ্ঠে বললে, "না, আমি তোমায় আগেই বলেচি, ও কাজটা ওর পক্ষে নেহাৎ ছোট কাজ। পীয়ার ইউক্রেটিসে যাবে।"

বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না ক'রে পীয়ার বললে, "মোটামুটি ওতে কত আন্দাজ লাগবে ?"

ক্লাউস বললে, "আমার যতদূর বোধ হ'ল, বিশ লক্ষ ক্রাউন কিম্বা অমনি কিছু লাগবে।"

ফার্দ্দিনান্দ উঠে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাইতোলা চাপা দিয়ে বললে, "ও পীয়ারের যোগ্য কাজ নয়! ও-সব তুচ্ছ কাজ, তুচ্ছ মানুষদের জন্যে ছেড়ে দাও। শুভ-রাত্রি, মহাশয়েরা।"

ঘণ্টা দুই পরে যখন বাড়ীতে সব নিস্তব্ধ, পীয়ার তখনো নিদ্রাহীন ; প্রকাণ্ড হল-ঘরে নরম ফেল্টের চটি পায় এদিক-ওদিক পায়চারি দিচ্চে। মাঝে মাঝে থেমে জানলা দিয়ে সে তাকায়। ঘুম আসে না কেন তার ? চাঁদ মলিন হ'য়ে এলো, দিনের আবির্ভাব হ'তে লাগল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন ভোরে মার্লে যখন ভাঁড়ার ঘরে একা, তখন পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে ফিরে তাকাল। ক্লাউস ব্রক।

"সুপ্রভাত মহাশয়া! প্রভাতী-বেশে তাহ'লে আপনাকে এমনটি দেখায়! বাঃ, প্রভাতী পোষাকটি কি সুন্দরই মানিয়েচে আপনাকে।"

মার্লে শুষ্ক কণ্ঠে বললে, "আপনি খুব ভোরে উঠেচেন তো।"

"তাই নাকি? আর ফার্দিনান্দ হল্‌ম্? সে যে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে চিঠিপত্র হিসাব নিয়ে বসেচে। আমি আপনাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারি কি? ওই পনীরটা নিয়ে আসব? বেশ, আপনার তো জোর আছে দেখচি। ওই যাঃ, মেয়েদের সম্পর্কে আমি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলি সব সময়।"

লম্বা ভুরুর মাঝ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মার্লে পুনরুক্তি করে বললে, "সব সময়ই বাড়াবাড়ি?"

"হ্যাঁ, আমার প্রথম আর শেষ প্রণয় কার সঙ্গে জানেন?"

"না তো! কি ক'রে জানব?"

"লুইসে, পীয়ারের ছোট বোন। আমার ইচ্ছে হয়, যদি আপনার সঙ্গে তার জানাশোনা হ'ত!"

"তার পর?" ব'লে মার্লে ওই বলিষ্ঠ ভদ্রলোকটির 'পরে দৃষ্টি স্থাপন করলে। ক্লাউস এমনি ভাবে তাকিয়ে রইল, যেন বিশ্ব সংসারে তার কোথাও কোনো উদ্বেগের লেশ মাত্র নেই।

"তারপর, বউঠাকরুণ, তারপর? রাখুন ভেবে দেখি। না, এই মুহূর্ত্তে আমি বাস্তবিক আর কোনো নারীকে মনে ক'রতে পারচি না, শুধু—"

"শুধু কি?"

"শুধু আপনাকে ছাড়া" ব'লে ক্লাউস অভিবাদন করল।

"আপনার দয়াটা একটু বাড়াবাড়ি!"

"তা যখন হচ্চে, তখন অতিথি-সৎকার-পরায়ণা গৃহ-স্বামিনী হিসেবে কি আপনার পরিষ্কার কর্ত্তব্য নয় আমাকে পরিবেশন ক'রে দেওয়া..."

"কি দিতে হবে? এক টুক্‌রো পনীর!"

"না, না ধন্যবাদ, ওর চাইতে ভালো কিছু চাই, ওর চাইতে অনেকখানি ভালো কিছু।"

"কি তাহ'লে চাই?"

"একটি চুমো। এখনি তাহ'লে পেতে আপত্তি কি?"

ক্লাউস এক পা এগিয়ে আসতেই, হাসতে হাসতে মার্লে পালাবার পথ দেখতে লাগল। কিন্তু দরজা আর মার্লের মাঝখানেই ক্লাউস দাঁড়িয়ে।

মার্লে বললে, "বেশ, কিন্তু প্রথম আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। ধরুন, আমার জন্যে আপনাকে ওই মইটা বেয়ে উঠতে হবে।"

"সানন্দে! কেন এ তো বেশ মজা!" ক্লাউস উঠতে লাগল আর তার বিপুল দেহের ভারে মইটা মচ করতে লাগল।

"আর কতখানি উঠতে হবে?"

"একেবারে ওই মাথার তাকটা অবধি—হ্যাঁ, ওইখানে। এখন ওই বড় বয়ামটা দেখচেন তো? সাবধান, ওতে ফলের চাট্‌নি আছে।"

"চমৎকার! ডিনারে বোধ করি চাট্‌নি পাওয়া যাবে আজ!"

আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাউস কোনো রকমে সেই ভারি বয়ামটা ওঠালে; শ্রমে মুখ তার লাল হ'য়ে উঠল, পাত্রটা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

"ছোট বউঠাকরুণ, এখন ?"

"একটুখানি দাঁড়ান, ওটাকে সাবধানে ধ'রে থাকুন, একটা জিনিস নিয়ে আসচি।" ব'লে মার্লে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।

ক্লাউস ভারি বয়ামটা হাতে নিয়ে মইটার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। ক্লাউস চারিদিকে তাকায়, পাত্রটা নিয়ে কি করবে সে! মার্লের ফেরার প্রতীক্ষা করতে লাগল সে, কিন্তু সে এলো না। পাশের ঘরে কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছিল। ভাবলে, সাহায্য করবার জন্য ডাকি। প্রতীক্ষা চলতে লাগল, মুখ ক্রমেই আরো লাল হ'তে লাগল। তবু মার্লে আর এলোই না।

আবার প্রচণ্ড প্রয়াস ক'রে সে বয়ামটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে, মই থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে লাল মুখ নিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করল। দোর গোড়ায় পৌছেই থমকে গিয়ে সে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল।

"কি! বেশ, আমিও এর···ইনি এখানে ব'সে পিয়ানো বাজাচ্ছেন!"

"হ্যাঁ. ব্রক, আপনি বাজনা ভালবাসেন না ?"

তর্জ্জনী হেলিয়ে ক্লাউস বললে, "আপনার ওপর এর প্রতিশোধ আমি নেব। ছোট্ট ঠাকরুণ, একটু অপেক্ষা করুন, এর শোধ যদি সুদশুদ্ধ না নিই।" ব'লে ক্লাউস ফিরে সিঁড়ি বেয়ে হাসতে হাসতে ওপরে চ'লে গেল।

পীয়ারের পড়াশোনার ঘরে যখন ক্লাউস ঢুকলো, তখন পীয়ার কি লিখচে। খাম মোড়ার মোমটা আগুনে ধরে পীয়ার বললে, "মার্টিন ক্রভোল্ডকে এই চিঠিতে টাকাটা পাঠাচ্চি; নীচে স্বাক্ষর করেচি, "হাঙর শিকারীদের কাছ থেকে।"

"হ্যাঁ, ফার্দ্দিনান্দের এই মৎলবটা ভারি চমৎকার হয়েচে। চিঠিখানা

খুলতেই যখন বড় বড় নোটের তাড়া বেরিয়ে পড়বে, তখন বেচারার কেমন লাগবে বলতে পার ?"

খামের ওপর ঠিকানা লিখতে লিখতে পীয়ার বললে, "তখনকার মুখখানা তার দেখতে ইচ্ছে করে।"

চামড়ার আর্মচেয়ারে ব'সে তাতে আরামের ভঙ্গীতে ঠেস্ দিয়ে ক্লাউস বললে, "নীচে গিয়েছিলাম হে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু প্রেম-চর্চ্চা করতে। তোমার স্ত্রী-টি আশ্চর্য্য, পীয়ার !"

পীয়ার তার দিকে চাইলে, পীয়ারের সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ল, বৃহদাকার কুৎসিত ডাক্তার-নন্দন যখন সহরের মজুরণী-মেয়েদের পেছনে ছুটোছুটি করত। চলবার সেই পুরাণো ভঙ্গীর কতকটা এখনও আছে, কিন্তু নানাদেশের মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কতকটা কায়দাদুরস্ত হয়েচে, চালচলনের মাঝে একটা সহজ মার্জ্জিত ভাব এসেচে।

"কি যেন বলছিলাম ?" ক্লাউস বলতে লাগল, "ও হ্যাঁ, আমাদের বন্ধু ফার্দ্দিনান্দ চমৎকার লোক, কি বল ?"

"তা তো বটেই।"

"সেই আগে যখন আমরা তিনজন এক সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার যেমন লাগ্‌ত, কাল আমার ঠিক তেমনি লাগ্‌ছিল। যখন তার কথাগুলো কান পেতে শুনি, তখন তার কথাগুলো স্বীকার না ক'রে পারি না—তারপর তুমি বলতে সুরু কর, আবার তুমি যা বল, মনে হয় যেন সেগুলোও আমারি অন্তরতম কথা। পীয়ার, তোমার কি মনে হয় আমি তরল হ'য়ে পড়েচি ?"

"ভাল কথা, তোমার বাষ্পীয় হাল বেশ চলচে আশা করি, আর তোমার হারেমের মহিলারাও তোমায় খুব জ্বালাতন করে না হয়ত। পড়াশোনো কিছু হয়-টয় ?"

ক্লাউস দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে বললে, "ও-সব কথা তুলো না ভাই, থাক্।" হঠাৎ পীয়ারের মনে হ'ল যেন বন্ধুর মুখে প্রবীণতা আর জীর্ণতার ছাপ পড়েচে।

"না", ক্লাউস আবার বলে, "ও-সব কথা বেশি না বলাই ভাল। কিন্তু ওহে বলতো—কিছু মনে করো না জিজ্ঞেস করচি ব'লে—ফার্দিনান্দ কি তোমার সঙ্গে কখনো ভায়ের মত কথা বলেচে কিম্বা—"

পীয়ারের মুখ একেবারে লাল হ'য়ে উঠল; একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, "না।"

"না ?"

"সংসারে তারি কাছে আমি সব চাইতে বেশি ঋণী। কিন্তু সে আমাকে কুটুম্ব বলে মনে করে, না, শুধু তার দয়ার পাত্র বলেই মনে করে, তা সে কখনো স্পষ্ট বুঝতে দেয়নি।"

"ও ঠিক ওই রকমই। অদ্ভুত রকমের লোক। কিন্তু আরেকটা কথা..."

পীয়ার চোখ তুলে বললে, "কি ?"

"কথাটা হচ্চে ইয়ে...কথাটা পাড়া বড় শক্ত। অবিশ্যি জানি, পৃথিবীর সব চেয়ে ভালো জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীতে তুমি তোমার টাকা রেখেচ—"

"হ্যাঁ, তুমিও আমারি মত ভাগ্যবান্।"

"ওঃ, তোমার তুলনায় আমার টাকা তো কিছুই নয়। তোমার সব টাকাই কি ফার্দিনান্দের কোম্পানীতে রেখেচ ?"

"হ্যাঁ, তবে কিছু শেয়ার বিক্রী ক'রে ফেলব ভাবচি। হয়ত বুঝতে পারচ কিছুকাল থেকে আমার খরচ কিছু বেশি রকমই হচ্চে, আমার আয়ের চাইতে বেশি।"

"এখনি বিক্রী করো না পীয়ার। কারণ আমার বোধ হয়, তুমি দেখেইচ যে শেয়ারের দর পড়ে গেছে।"

"না, সে তো আমি জানিনে!"

"তবে এটা সামান্য কিছুদিনের জন্য। একটা সাময়িক দর-পড়তি মাত্র। শিগ্‌গীরই আবার চাহিদা বাড়বে নিশ্চয়, দর আবার চড়বে। কিন্তু জান তো, খিদিভের হাতেই হচ্চে সব। অথচ লোকটি খামখেয়ালী ধরণের। ফার্দিনান্দ কাজটাকে আরো বাড়াতে চায়, আরো নতুন জমি অর্থাৎ নতুন মরুভূমি খরিদ করতে চায়। সেখানে চাষ-বাস নির্ভর করচে শুধু যন্ত্রশক্তির ওপর—ফার্দিনান্দের ধারণাটা এই রকমের। সেই জন্যেই কাজটা যত ব্যাপক হবে, যন্ত্রশক্তির খরচটা তত কম পড়বে, খিদিভ কিন্তু আর এগুতে চাচ্চে না। হয়তো এটা তার একটা সাময়িক খেয়াল মাত্র, কালই হয়ত সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু বলা তো যায় না কিছুই। আর খামখেয়ালী খিদিভের কাছে ফার্দিনান্দ নত হবে এর চাইতে ভুল ধারণা কিছুই হ'তে পারে না। ফার্দিনান্দ চাচ্চে যত বেশি সম্ভব মূলধন যোগাড় ক'রে খিদিভের অংশটাকেও কিনে ফেলা। তুমি কি বল? খিদিভকে তার অংশটা কিনে ফেলে একেবারে কোম্পানী থেকে বিদায় করে দেওয়া খুব বড় রকমের বাজি। কিন্তু ভায়া, আমি তোমার জায়গায় হ'লে শেয়ারের দর একটু চড়া মাত্রই কিছু শেয়ার বিক্রী ক'রে ফেলে, দেশেই কোনো কাজে লাগিয়ে দিতুম। যাই বল, এখানেও যথেষ্ট দরকারী কাজ করবার রয়েচে।"

পীয়ারের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল, কিছুক্ষণ সামনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। শেষে বললে, "নাঃ, ফার্দিনান্দ আর আমার মাঝে যে সম্বন্ধ, তাতে যদি দু'জনের মাঝে কেউ কাউকে ছাড়তে চায় তো সে আমি নই।'

"ও, তা হ'লে পরে—আমায় ক্ষমা ক'র" ব'লে ক্লাউস্ উঠে সেখান থেকে চ'লে গেল।

নামকরণ উৎসবটা একটা মস্ত ব্যাপার। অতিথিতে বাড়ী ভ'রে গেল, বক্তৃতাদিও হ'ল প্রচুর। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তাটি দলের মধ্যে সব চাইতে তরুণ আর সব চাইতে উৎফুল্ল। সে বললে, তার ছেলের জন্ম উৎসবটিকে একেবারে খাঁটি ইথীয়পীয়ান ধরণে করা চাই,—অর্থাৎ আতসবাজী আর নৌকাবিহার হওয়া চাই।

সেদিন সন্ধ্যারাতের চাঁদ ঘন মেঘে ঢাকা রইল, কিন্তু অতিথি-মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ নৌকাগুলো কালো জলের ওপর দিয়ে হাসি আর গানের সঙ্গে সঙ্গে চললো এক পাগলাটে যুবা উকীল আরেক জনের স্ত্রীর কোলের ওপর ব'সে কনসার্টিনা বাজাতে লাগল, তাই শোনার জন্যে তীরের খামার বাড়ীর বাতায়ন খুলে লোকেরা মাথা বার ক'রে দিতে লাগল।

তারপর হ্রদের কূলে কূলে আতসবাজীর আগুন জ্বালানো হ'ল, সেই আলোগুলো জলের মাঝে জ্বলন্ত সূর্য্যের মত দেখাতে লাগল। অতিথিরা বনভোজের চারদিকে ছোট ছোট মণ্ডলী ক'রে ঘাসের 'পরে শুয়ে পড়লেন; আবার কোথাও কোথাও যুগলে যুগলে ভ্রমণ আর কানাকানি কথাও চলতে লাগল।

একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে মার্লে আর পীয়ার ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়াল। অরুণ দীপ্তিতে তাদের মুখ, তাদের শরীর প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল; পরস্পরের পানে চেয়ে তারা হাসল। পীয়ার মার্লেকে আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে সেই আলোক-মণ্ডলের বাইরে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারে উজ্জল-বাতায়ন তাদের বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বললে, "মার্লে, মনে কর এইটেই আমাদের শেষ উৎসব।"

"পীয়ার, এ কি বলচ তুমি?"

"না, কিছু নয়। কেমন যেন মনে হ'ল, মনে হ'ল যেন একটা কিসের অবসান হ'ল, যেন একটা নতুন কিসের সূত্রপাত হ'ল। জানিনে কেন, এ-রকম মনে হচ্চে। কিন্তু মার্লে, যে-সুখে দিনগুলো আমাদের কাটল সে জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করচে।"

"কিন্তু পীয়ার এ-সব তুমি—" আর বলা হ'ল না। পীয়ার মার্লের কাছ থেকে তখনি স'রে গিয়ে অতিথির একটি দলে যোগ দিয়ে আর সকলের মতই হাসি-আমোদ করতে লাগল।

তারপর অতিথি দুজনের বিদায় নেবার দিন এলো। এই কিছুদিন আগে যার লোরেঞ্জ উথোগ নাম রাখা হয়েছিল, তার জন্মদিনে ফার্দ্দিনান্দেরা যে উপহার দিয়েছিল সেটি বৈঠকখানায় রাখা ছিল; আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তার ধর্ম্মপিতারা সূর্য্যদেবতা রী হোর্ম্মাকিসের যে রক্ত মর্ম্মরের মূর্ত্তি এনেছিল সেইটিই তারা তাকে উপহার দিয়েছিল। এখন সেই মূর্ত্তিটি বৈঠকখানায় টবে-রাখা পাম্-গাছের ফাঁকে ব'সে কোমরে হাত দিয়ে তার মৃত্যুস্তব্ধ বিশাল চোখ দুটো মেলে অন্তহীন শূন্যতার পানে তাকিয়ে রইল।

জলের ওপর রেখা টেনে ষ্টীমারখানি তার পেছনে ছোট্ট ঢেউয়ের মণ্ডলটি ছড়াতে ছড়াতে যখন যাত্রা করল, তখন জেটির ওপর দাঁড়িয়ে হাত তুলিয়ে পীয়ার তার পুরানো সাথীদের বিদায় দিলে।

যখন সে ফিরল, তখন বাড়ীময় সে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর খামার, জঙ্গল, মার্লে আর ছেলেপুলেদের পানে এমনি ভাবে তাকাতে লাগল যে, মার্লের কাছে তা কেমন নতুন আর অদ্ভুত লাগতে লাগল।

পর দিন রাত্তিরে পীয়ার আবার একা একা হলটায় পাইচারি ক'রে আর জানলা দিয়ে অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থেকে কাটালে।

তার বিস্মৃত আর বিগত জীবনের সোনালি সুতোর পাক খুলছিল কি সে ?

আলো না হ'য়ে সে কি জ্বালানি কাঠ হ'য়েই তৃপ্ত ?

কিসের সন্ধান করে সে ? সুখের ? কিন্তু তারপর ?

বালক বয়সে সে একে স্তব সঙ্গীত বলেছিল, সর্ব্ববিশ্বের স্তবগান বলেছিল। এখন কি বলবে ? ঈশ্বর ? কিন্তু অলসতার মধ্যে তো তাঁকে পাওয়া যাবে না।

পারিবারিক জীবনের আনন্দ থেকে, বিবাহ থেকে, পিতৃত্ব, বিশ্বপ্রকৃতি আর চতুষ্পার্শ্বের মানুষের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব পরিপুষ্টি লাভ করেচ ; কিন্তু তোমার মাঝে অব্যবহৃত আরো কত শক্তি রয়েচে, তারা কাজ চায়, নানা কর্ম্ম-প্রয়াসের মধ্যে তারা মুক্তি চায় যে।

পীয়ার, বেস্‌নাতে যে বাঁধ বাঁধার কাজটা রয়েচে সেটা তোমার নেওয়া উচিত। কিন্তু তার কন্‌ট্রাক্‌ট্ তুমি পাবে কি ? যদি কোমর বেঁধে দাঁড়াও সত্যি ক'রে, তা হ'লে আর কেউ তোমায় হারাতে পারবে বলে তো মনে হয় না, নিশ্চয়ই ও কাজটা তুমি পেতে পারবে। কিন্তু বাস্তবিক ও কাজটা তুমি চাও কি ? একটা ঘাসকাটার যন্ত্র তো তৈরী করবার চেষ্টা করচ, না ? মোটের ওপর স্বীকার করতে হচ্চে তুমি তোমার সেই পুরানো কাজটা ছেড়ে থাকতে পারচ না, চিরকালই ইস্পাত আর আগুন নিয়ে তোমাকে নাড়াচাড়া করতে হবেই। তোমার আর কোনো পথ নেই পীয়ার !

গত কয়েক বছর ধ'রে তোমার দৃষ্টি যে-দিকে পড়েচে, সে শুধু কুয়াসা-ঢাকা একটা সোনার স্বপ্ন মাত্র। ইস্পাত তার আপন পথে চলেচে। তোমার মাঝে ইস্পাত জেগে উঠচে—ইস্পাতের সঙ্গীত

গুঞ্জন সুরু হয়েচে, ইস্পাত তার পথে এগিয়ে যাবেই। তোমার কোনো হাত নেই তার ওপর।

বিশ্বশক্তির ইচ্ছা তার পথে চলেচে। তার সঙ্গে সঙ্গে চলো, ভালো কথা, তা না হ'লে সে তোমাকে আবর্জ্জনার মত বর্জ্জন করবে।

সারা রাত পীয়ার কেবলি পাইচারি দেয়, তার পাইচারির আর বিরাম নেই।

পর দিন সকালবেলা পীয়ার রাজধানীর দিকে রওনা হ'ল। গাড়ীটা যখন যেতে লাগল, মার্লে সে-দিকে তাকিয়ে আপন-মনেই বলতে লাগল, ঠিকই বলেছিল, নতুনের সূত্রপাত হয়েচে।

## নবম পরিচ্ছেদ

পীয়ারের কাছ থেকে একখানি কার্ড এলো, সংক্ষিপ্ত সংবাদ নিয়ে; লিখেচে, 'জমি দেখতে যাচ্চি।' পনেরো দিন পরে পীয়ার একরাশি ম্যাপ আর প্ল্যান নিয়ে ফিরল। বলল, "যেমন সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে আমার তাই; একটু দেরী হ'য়ে গেচে। যাহ'ক, রোসো।"

পীয়ার তার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিলে, এত দিনে পীয়ারের কাজ করা কাকে বলে তা মার্লে দেখতে পেলে। সকাল বেলা মার্লে শুনতে পায়, পীয়ার পাইচারি করচে, শীস্ দিচ্চে আর পায়চারি করচে। তার পর নিঃশব্দতা—পীয়ার তার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, অঙ্ক আর নোট লেখার মাঝে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। আবার পায়ের শব্দ শোনা যায়। পীয়ার গান গাইতে থাকে,—এটা পীয়ারের কাছে নূতন ব্যাপার। তার অন্তরে যেন আনন্দের একটি ভাণ্ডার রয়েচে; ভালোবাসার, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আর আনন্দিত মুহূর্ত্তের সম্পদ

যেন তার অন্তরে সঞ্চিত রয়েচে; তাই যেন গানের মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। একটা মস্ত বাঁধ বাঁধার পরিকল্পনাকে গান দিয়ে কেনই বা অভিনন্দিত করবে না? অঙ্কশাস্ত্র নীরস কাজ বটে, কিন্তু সময় সময় এ সব জীবন্ত স্বপ্ন হ'য়ে উঠে জ্যোতির্লোকে উধাও হ'য়ে যেতে পারে। পীয়ারের গানের সুর চড়তে থাকে। আবার নিঃশব্দতা নামে। মার্লে আজকাল জানতেও পারে না, কখন সে কাজ থামায়, কখন সে শুতে আসে। পীয়ার যখন তার ঘরে গান গায়, সেই গানের সুরে মার্লে ঘুমিয়ে পড়ে; আবার যখন মার্লে জাগে—তখন পীয়ার আবার তার ঘরে পায়চারি সুরু ক'রে দিয়েছে, মার্লের কাছে তার ওই পায়ের শব্দ মস্ত একজন সেনাপতির রাশভারি চলনের মত মনে হয়। পীয়ারের মনে নতুন স্বপ্ন, নতুন কল্পনা জেগেচে, তার কণ্ঠে তাই এক অপূর্ব্ব মহিমাময় ভঙ্গী; মার্লে তার দিকে আধ-বোজা চোখে অতৃপ্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। আবার পীয়ার তার কাছে নবীন হ'য়ে উঠেছে; কখনো পীয়ারকে সে এমনটি দেখে নি।

শেষে তার কাজ শেষ হ'ল; পীয়ার তার 'টেণ্ডার' পাঠিয়ে দিলে। পীয়ার আগের চাইতে আরো অধীর হ'য়ে পড়ল। হপ্তাখানেক উত্তরের প্রতীক্ষায় কাটতে লাগল। কখনো পীয়ার বাড়ীটার আশে-পাশে চঞ্চল হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে, কখনো বিজুর পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়ে আর শেষে বিজুকে ঘামে নাইয়ে দিয়ে তবে ফেরে। অধীর মন নিয়ে ঘোড়ায় চড়লে তখন ঘোড়াকে দ্রুত না ছুটিয়ে চলাই অসম্ভব। দিনের পর দিন কাটে, পীয়ারের ঘুম বিদায় নেয়, খাওয়াও বন্ধ হ'য়ে যায়। আরো দিন যায়। শেষে একদিন খোকার শোবার ঘরে ঝড়ের মত পীয়ারের প্রবেশ।

"মার্লে, টেলিফোনে ডাক পড়েচে; কোম্পানীর ডিরেক্টরদের

সভায় ডেকেছে। এখুনি যাওয়া চাই। আমার জিনিষপত্রগুলো বেঁধে দাও এসে—শীগ্‌গির!"

কালবিলম্ব না ক'রে পীয়ার আবার সহরের পানে ছুটল।

উদ্বিগ্ন চিত্তে এবার মার্লের পাইচারি করবার পালা এলো। কাজটা পীয়ার পাবে কি পাবে না মার্লের তাতে কিছুই আসে যায় না; কিন্তু মার্লে তীব্র আগ্রহে শুধু একটি কামনা করে—পীয়ারের জয় হোক্।

দু'দিন পরে টেলিগ্রাম এলো "হুর্‌রে প্রিয়া!" টেলিগ্রামখানা মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মার্লে ঘরময় নাচ্‌তে লাগল।

পরদিন পীয়ার আবার ফিরে এলো, ঘরে এদিক থেকে ওদিক পাইচারি দিতে লাগল, "মার্লে, তোমার বাবা এতে কি বলবেন, এঁ্যা?"

"বাবা? কিসে কি বলবে?"

"তোমার বাবাকে যদি দু লক্ষ ক্রাউনের জন্মে আমার জামিন হ'তে বলি?"

"বাবাকেও কি এতে থাকতে হবে নাকি?" ব'লে মার্লে বড় বড় চোক ক'রে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তা তিনি যদি না হ'তে চান তো, আমরা তাঁকে জোর করব না। কিন্তু প্রথম তাঁকেই বলব। গুড্‌ বাই।" ব'লে পীয়ার সহরের দিকে রওনা দিলে।

লরেঞ্জ উথোগের বাড়ীখানা প্রকাণ্ড; আপিস ঘরটা পেছন দিকে ব'লে, তাতে যাবার রাস্তাটা একটা লোহার দোকানের ভিতর দিয়ে। খাতাপত্র বগলে নিয়ে পীয়ার দরজায় ঘা দিলে। হের উথোগ সবে মাত্র গ্যাসের আলোটা জ্বলিয়ে তাঁর আমেরিকান 'রোল-টপ্‌' ডেস্কটার সাম্‌নে বসচেন এমন সময় পীয়ার প্রবেশ করল। আলোর সবুজ আচ্ছাদনের ছায়ায় ঢাকা ঘনবিন্যস্ত কেশ, পক্ক-শ্মশ্রু মুখখানি তার দিকে ফিরল।

"আরে তুমি? ব'স ব'স, তারপর শুনছি তুমি নাকি ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় গিয়েছিলে। আজকাল কি নিয়ে ব্যস্ত আছ?"

তারা পরস্পরের সামনে বসল। পীয়ার শান্ত-দৃঢ়ভাবে ব্যাপারটা খুলে বলল।

উথোগ ছায়া থেকে মুখ সরিয়ে আলোয় স'রে এসে পীয়ারের পানে তাকিয়ে বললেন, "কাজটা কত টাকা আন্দাজের হবে?"

"চব্বিশ লক্ষ ক্রাঙ্ক।"

বৃদ্ধ তাঁর লোমশ হাত ডেস্কের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে উঠে পীয়ারের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলেন, শ্বাস যেন পড়তে চায় না। টাকার অঙ্কটা তাঁকে যেন কেমন অভিভূত ক'রে ফেলল। ওই অঙ্কের পাশে তিনি আর তাঁর কাজকর্ম্ম এ সবই যেন তুলাদণ্ডে ধূলোর মত তুচ্ছ মনে হ'তে লাগল। তিনি যা-কিছু করেচেন, যা-কিছু করবার কল্পনা করেন, সহরে তাঁর ঐশ্বর্য্য, প্রতিষ্ঠা আর শক্তি, সব এর তুলনায় কতটুকু? ওই রকমের অঙ্কের তুলনায়, তিনি যে সামান্য পরিমাণের টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে থাকেন সে কতটুকু?

অস্ফুট-জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমি,—আমি ঠিক ধরতে পারচি না—তুমি বিশ লাখ বললে না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ও আপনার কাছে সামান্য মনে হচ্চে," পীয়ার বললে, "তবে পাঁচ কোটি টাকা অবধি আমি কন্‌ট্রাক্ট্ নিয়েচি।"

"কি? কত বললে?" উথোগ চঞ্চল ভাবে ঘরময় পাইচারি করতে লাগলেন। নিজের চুলগুলা টানতে টানতে পীয়ারের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন; তাঁর যেন সন্দেহ হ'তে লাগল হয়ত পীয়ারের মাথা ঠাণ্ডা নেই। আবার সেই সঙ্গে মনে হ'তে লাগল যে, অভিভূত হ'য়ে পড়াটা তাঁর পক্ষে ঠিক হবে না। নিজেকে অবিচলিত রাখবার চেষ্টা চলতে লাগল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তা থেকে লাভ কি আন্দাজ হবে ?"

"দু' লাখ পাবার আশা করি।"

"ও!" লাভের অঙ্কটার পরিমাণ আবার বৃদ্ধকে চমকে দিলে। না, তিনি কিছুই ন'ন; এ জগতে তিনি কিছুই হ'তে পারেন নি' ?

"এত লাভ যে হবে তা কি ক'রে জানলে ?"

"আমি সব হিসেব ক'রে দেখেছি।"

"কিন্তু যদি—কিন্তু এতে নিশ্চয়তা কি ? ধর যদি, তোমার হিসেবে ভুল হ'য়ে থাকে ?" বলতে বলতে বৃদ্ধের মাথাটি আবার আলোকের দিকে এগিয়ে এলো।

পীয়ার বললে, "আমার হিসেব ঠিকই হ'য়ে থাকে।"

পীয়ার যখন জামিনের কথাটা পাড়ল, বৃদ্ধ তখন ঘরের মাঝ দিয়ে তার কাছ থেকে স'রে যাচ্ছিলেন। তিনি থমকে দাঁড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কি ? জামিন ? আমাকে বিশলক্ষ ক্রাউন জামিন হ'তে বলচ ?"

"না, কোম্পানী চার লাখের গ্যারান্টি চাচ্চে।"

একটুখানি স্তব্ধ থেকে বৃদ্ধ বললেন, "বুঝেচি, হ্যাঁ, বুঝেচি। কিন্তু, কিন্তু আমি—আমি অত টাকার জামিন হবার যোগ্য নই।"

"চারের মাঝে তিন লাখের শেয়ার আমি নিজে নিতে পারি। তার পর অবশ্যি আমার লোরেঙের সম্পত্তি, কারখানা এ সবও আছে। কিন্তু যাক্, সোজাসুজি অঙ্কটাই ধরা যাক্, আপনি একলাখের জামিন হ'তে পারবেন ?"

আবার খানিকক্ষণ চুপ। তারপর ঘরের আরেক কোণ থেকে উত্তর এলো, "এও তো অনেক টাকা।"

"অবশ্যি আপনার যদি আপত্তি থাকে আমি অন্য ব্যবস্থা করতে

পারি। আমার দু'বন্ধু যাঁরা এসেছিলেন—" বলতে বলতে পীয়ার উঠে তার কাগজ-পত্র গুটোতে লাগল।

"না, না; তুমি অত তাড়াহুড়ো করচ কেন? তুমি মানুষের ওপর একেবার হঠাৎ বরফের পাহাড়ের মত এসে পড়। আমায় একটু ভাবতে দাও, অন্তত কাল অবধি। আর কাগজপত্রগুলো,—ওগুলো আমি একটু দেখতে চাই।"

অস্থির-উদ্বিগ্ন রাত্রি কাটল। উথোগের পায়ের তলার মাটি যেন স'রে গেছে, তাঁর মন যেন কোনো দৃঢ় আশ্রয়কেই পাচ্চে না। তাঁর জামাইটি একটি মস্ত লোক,—এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ নেই বললেও চলে। কিন্তু এক লাখের বাজি কেনা—জমাজমিতে নয়, বড় একটা কারবারে নয়, একটা বাঁধের সাফল্যের ওপর। এটা একটা নতুন ব্যাপার। তাঁর কাছে এটা একটা অদ্ভুত রকমের কাল্পনিক ব্যাপার মনে হ'তে লাগল—বাইরেকার বিশাল জগতের পক্ষে কিম্বা ভবিষ্যতের পক্ষে হয় ত এ সত্য। তাঁর কি এ কাজে নামবার সাহস আছে? কে বলতে পারে কত রকমের আকস্মিক দুর্ঘটনা, কত রকমের বিপদ আসতে পারে? নাঃ! বৃদ্ধ মাথা নাড়তে লাগলেন। তিনি পারবেন না, তাঁর সাহস হয় না। কিন্তু ওই কাজটা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হবার চাইতে কিছু বেশি হবার কামনা তাঁর বরাবর। এতবড় অনিশ্চিতের দায়িত্ব তিনি নেবেন, কি নেবেন না? এর মানে হচ্চে সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি এক কথায় যা কিছু আছে সব এমন একটা ইঞ্জীনিয়ারিং-এর কাজে বাজি রাখা—যার সম্বন্ধে তিনি এক বর্ণও বোঝেন না। এ একটা বাজি ( Speculation ) ছাড়া আর কি! একেবারে জুয়াখেলা। না, তাঁকে 'না'ই বলতে হবে। তা হ'লে মোটের উপর শেয়াল রাজাই তিনি। না, তাঁকে 'হাঁ' বলতে হবে। হা ভগবান্!

বৃদ্ধ হাতে হাত নিপীড়ন করতে লাগলেন ; হাতগুলো ঘামে চট্‌চটে হ'য়ে উঠল ; মস্তিষ্কের ভেতরটা যেন ঘূর্ণীপাকে পাক খেতে লাগল। এ একটা পরীক্ষা, একটা প্রলোভন। প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু তাতে কি লাভই বা হবে, তিনি নিজেই যে ঈশ্বরকে বর্জ্জন করেচেন।

পরদিন টেলিফোনে ডাক পড়ল, বৃদ্ধের বাড়ীতে ডিনারে মার্লে আর পীয়ারের নিমন্ত্রণ।

কিন্তু যখন তারা সবাই খেতে বসল, তখন কথাবার্ত্তা চালানো অসম্ভব হ'য়ে উঠতে লাগল। সকলেরই মনে যে চিন্তা চল্‌ছিল, তা নিয়ে কথা সুরু করতে প্রত্যেকেরই কেমন সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগল। বৃদ্ধের মুখখানি অনিদ্রায় ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছিল আর তাঁর পত্নী চশমার ভেতর দিয়ে একবার এর পানে আরেকবার ওর পানে তাকাচ্চিলেন। পীয়ার শান্ত, মুখে তার মৃদু হাসি।

শেষে যখন ক্ল্যারেট এলো ফ্রু উথোগ তাঁর গ্লাসটি পীয়ারের উদ্দেশে তুলে পান ক'রে বললেন, "তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। আমরা তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করবো না। তুমি যখন এটা ভাল মনে করচ তখন তাই ঠিক। আশা করি, এতে তোমার ভালই হবে পীয়ার।"

মার্লে তার বাবা-মার দিকে তাকালো; যতক্ষণ খাওয়া-দাওয়া চলছিল মার্লের উদ্বেগ আর অস্বস্তিতে কেটেচে ; এখন তার চোক জলে ভরে উঠল।

পীয়ার গ্লাস তুলে বৃদ্ধ দম্পতীর উদ্দেশে পান ক'রে বললে, "ধন্যবাদ।" বৃদ্ধ উথোগকে অভিবাদন ক'রে আবার বললে, "ধন্যবাদ।" সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেল। স্পষ্টতই বৃদ্ধ স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা ক'রে একমত হয়েচেন।

সব ঠিক হ'য়ে গেল, কিন্তু চার জনেরই মনে হ'তে লাগল যেন পায়ের

তলার মাটি একটু দুলচে। তাদের ভবিষ্যৎ, ভাগ্য এসবই যেন একটা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করচে।

দিন দুই পরে অক্টোবরের কোমল সূর্য্যালোকে পীয়ার সহরে গেল। জানালায় তার শাশুড়ীকে দেখতে পেয়ে, কিছু ফুল কিনে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ল। জানালার পাশে বসে তিনি হরিদ্বর্ণ আকাশের পানে তাকিয়ে ছিলেন। "ধন্যবাদ পীয়ার" ব'লে তিনি আকাশের পানে তাকিয়েই রইলেন।

পীয়ার বললে, "মা, আপনি কি ভাবচেন ?"

"আ! সব সময়েই যা ভাবা যায় তা বলা ভালো নয়", ব'লে তিনি তাঁর চশমা-পরা চোক হ্রদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

"আশা করি বেশ ভালো কিছুই ভাবছিলেন ?"

"তোমার কথাই ভাবছিলাম, পীয়ার। তোমার আর মার্লের কথা।"

"সে আপনার অনুগ্রহ।"

"দেখো পীয়ার, তোমার দুঃখের দিন আসচে। অনেক দুঃখ।" পশ্চিমের হল্‌দে আকাশের দিকে চেয়ে তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন।

"দুঃখের দিন ? কেন ? আমাদের দুঃখ আসবে কেন ?"

"কারণ তুমি সুখী, পীয়ার।"

"কি ? কারণ আমি—?"

"কারণ তোমার চারিদিকে সবই এখন পুষ্পিত হ'য়ে শ্রী-সম্পন্ন হ'য়ে উঠচে। নিশ্চিত জেনো পীয়ার, এমন সব অদৃশ্য শক্তি রয়েচে যারা তোমার এই সুখ সহ্য করতে পারচে না।"

পীয়ার মৃদু হেসে বললে, "আপনি বুঝি তাই মনে করেন ?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, দূরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন "আমি এ জানি, পীয়ার। অদৃশ্য ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছায়ামূর্ত্তিদের কিছুকাল থেকে তুমি

শত্রু ক'রে তুলেচ। অদৃশ্য হ'লেও তারা কিন্তু আমাদের ঘিরে রয়েচে। আমি তাদের রোজ দেখতে পাই। এই দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধ'রে আমি তাদের দেখতে শিখেচি। আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেচি। এইটেই ভালো যে ছায়া মূর্ত্তিতে ভরা বাড়ীর মাঝে মার্লে গান গাইতে শিখেচে। ঈশ্বর করুন যেন সে গান গেয়ে তোমার কাছ থেকেও তাদের দূর করতে পারে।"

পীয়ার যখন সেই বাড়ী থেকে বিদায় হ'ল, তখন তার মনে হ'তে লাগল যেন তার মেরুমজ্জার ভেতর একটা কেমন হিম-শীতল স্পর্শ তাকে কাঁপিয়ে তুলচে। রাস্তায় নেমে পীয়ার চেঁচিয়ে উঠল, "দূর! ওঁর মাথা খারাপ।" তাড়াতড়ি গাড়ীতে চড়ে পীয়ার বাড়ীর দিকে চলল।

পীয়ার ভাবতে লাগল, যাই হোক, বুডোরোড খুসী হবে। তার ওয়ার্কশপে সে এখন কর্ত্তা হ'তে পারবে, এই তো তার সারা জীবনের স্বপ্ন। ভালই, যার যেমন সঙ্কল্প! বছর খানিক, বছর দুয়েকের জন্য লোরেঙএ বেলিফ্ ও তার খুসী মত কাজ করতে পারবে। ভাল, ভাল! চল্, ব্রাউনী!

## দশম পরিচ্ছেদ

"পীয়ার নিশ্চয়ই এখুনি তুমি চলে যাবে না? ও পীয়ার, তুমি যেতে পাবে না। আমায় একলা ফেলে যেয়ো না, পীয়ার।"

"মার্লে মণি, অবুঝ হয়ো না। না, না, যেতে দাও লক্ষ্মীটি।"

মার্লে পেছন থেকে পীয়ারের গলা জড়িয়ে ধরেছিল, পীয়ার তাই ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

"পীয়ার আগে তুমি কখনো এ রকম তো ছিলে না! তুমি কি আর আমার জন্যে, ছেলেপিলেদের জন্য এতটুকুও কেয়ার কর না?"

"মার্লে, প্রিয়তমা আমার, মনে ক'র না, যেতে আমার ভালো লাগচে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে এ বছর আবার একটা মস্ত ভাঙন ধরে? তা হ'লে কিন্তু সর্ব্বনাশ হবে তোমায় বল্‌চি। হয়েচে, এখন আমায় যেতে দাও।"

মার্লে কিন্তু তবু শক্ত ক'রে ধ'রেই রইল। "আমার কি হবে না হবে তার চাইতে সেই বাঁধগুলোর কি হবে না হবে তাই তোমার কাছে বেশী?"

"তোমার কিছু হবে না মণি। ডাক্তার আর নার্স কথা দিয়েচে, তুমি খবর দেওয়া মাত্র এসে উপস্থিত হবে। আগেও তো তোমার কোনো গোলমাল হয়নি।...আমি এখন আর কিছুতেই থাকতে পারিনে মার্লে। বড় বেশি আজ বিপন্ন। আচ্ছা, এখন তা হ'লে গুড্‌বাই। নিশ্চয় কিন্তু টেলিগ্রাম করবে—"

চোখের ওপর চুমো খেয়ে পীয়ার তাকে ধীরে চেয়ারে বসিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; সে স্পষ্ট অনুভব করলে যে মার্লের ভীত দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করচে।

নিম্ন প্রদেশটাকে এপ্রিল সূর্য্য তখন তুষার গলিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেচে; কিন্তু পীয়ার যখন এস্পেডালে ট্রেন থেকে নামল, তখন আবার যেন হিমঋতুকে ফিরে পেল—ক্ষেত খামার সব তুষারাচ্ছন্ন, পাহাড় আর তাদের চূড়াগুলো সাদা ধব্‌ধবে বরফে একেবারে ঢাকা। তাড়াতাড়ি পীয়ার পশুচর্ম্মে গা ঢেকে একটা রোগা-পটকা ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে পাশের উপত্যকা বেয়ে মালভূমির দিকে যাত্রা করল।

বরফের মাঝ দিয়ে একটু সরু পথ, সারাটা শীতকাল তারই

পশু-বাহিনী ভারি সিমেণ্টের বস্তা ব'য়ে পথখানিকে গর্ত্ত আর চাকার চিহ্নে সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেচে। এই শেষ পথ যা মালভূমি পর্য্যন্ত গেছে, আর বরফ-ঢাকা হ্রদের ওপর দিয়ে বেস্‌না অবধি চলে গেছে।

ইস্পাতের অভিযান থামবার নয়; ইস্পাত মানুষের কোন পরোয়াই করে না। মার্লেকে এর মাঝ দিয়ে একাই আসতে হবে।

সুস্থ সুখী মানুষ যখন কোনো বড় কাজ করতে গিয়ে নানা রকম গণ্ডগোল আর বিপত্তির হাতে বাধাগ্রস্ত হ'তে থাকে, তখন সে দীর্ঘ যাত্রা-পথের আরব ঘোড়ার মত করতে থাকে। প্রথম প্রথম সে পাহাড়ের চড়াই উৎরাইটা তুল্‌কি চালে চলতে থাকে; তারপর যতই তার শক্তি ক্ষীণ হ'য়ে আসতে থাকে, ততই তার গতি দ্রুত হ'তে থাকে। শেষটায় যখন একেবারে দম ফুরিয়ে ধরাশায়ী হবার সময় আসে, তখন সে লাফিয়ে চলতে আরম্ভ করে।

এক সময়ে যে কাজের স্বপ্ন সে দেখেছিল, এ তা নয়। আগের মত এখনো সাফল্য লাভের সঙ্গে নিত্যবস্তুর ক্ষুধা তাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকে—কোথায়? কেন? আর তার পরই বা কি? ধীরে ধীরে বাধা-বিপত্তি এত বেশি বেড়ে উঠল যে, পীয়ারের সমস্ত মনকে একটি মাত্র চিন্তা অধিকার করল—কাজটাকে শেষ করতেই হবে। ভালো হ'ক, মন্দ হ'ক—কাজটাকে সাফল্য-মণ্ডিত করতেই হবে। কাজটাকে হাতে নিয়েচে যখন শেষ করতেই হবে। হার মানা চলবে না—কিছুতেই।

তাই সংগ্রাম চলল। এটা ছিল শুদ্ধমাত্র শক্তি-পরীক্ষা; বস্তুগত বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে লড়াই। হাঁ, কিন্তু তাই কি সব? কখনো কখনো তার কি মনে হ'ত না যে, সে একটা কোনো বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে লড়াই করচে? তার জীবনে যেন একটা নূতন শক্তির কার্য্যকলাপ সুরু

হয়েচে—সে হচ্চে দুর্ভাগ্য। তার ইচ্ছা-শক্তির বাইরেকার একটা শক্তি যেন তার সঙ্গে চাল-বাজি খেলতে সুরু করেচে।

তোমার হিসাবপত্র ঠিক হ'তে পারে, সব খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত নির্ভুল হ'তে পারে। তবু করতে গিয়ে সব একেবারে গোলমাল হ'য়ে যেতে পারে।

হিসাবের মাঝে এই সম্ভাবনাটাকে কি ক'রে ধরবে যে, সম্পূর্ণ ধীরবুদ্ধি ইঞ্জিনীয়ার একদিন মাতাল হ'য়ে প'ড়ে এমন উন্মাদের মত আদেশ দিয়ে বসবে—যার ক্ষতিপূরণ করতে হাজার হাজার টাকা লেগে যাবে? কে আগে থেকে এই অসম্ভব ব্যাপার কল্পনা করেছিল যে, সুড়ঙ্গ কাটতে গিয়ে একটা মস্ত জলনালী বেরিয়ে পড়বে, আর তারি প্রবল উচ্ছ্বাসের বন্যায় সব কাজ, আর সব মজুরের দল এমন ভাবে বিনষ্ট বিপর্য্যস্ত হ'য়ে যাবে যাতে পরদিন বরফ-ঢাকা হ্রদগুলোর ওপর দিয়ে শুধু শবাধারের বাহিনী এঁকে বেঁকে যাবে?

একাধিকবার সংবাদপত্রে মন্তব্য আর প্রশ্ন হয়েচে—"বেস্না প্রপাতে আরেক দুর্ঘটনা। দোষী কে?"

পীয়ার অন্যত্র গিয়েছিল কাজের খাতিরে, এদিকে ফক্‌ম্যান্ প্রাথমিক সতর্কতা অবলম্বন করতে অবহেলা করার ফলে সুড়ঙ্গের ভেতর প্রকাণ্ড শিলাপাত হ'ল; চারজন লোক মারা গেল; আর নূতন বেলজীয়ান্ পাথর-ছেঁদা যে যন্ত্রটি কাজে লাগানোর আগেই বিনষ্ট হ'ল তার দামও লাখখানেক। এতো ভুল হিসাবের ফল নয়—এ দুষ্ট ভাগ্যের কাজ।

"এসো হে এসো। আজ রাত্তিরেই আমাদের সেখানে পৌঁছুতে হবে। বন্যা যেন এবছর আমায় এই ব'লে দোষী না করতে পারে যে আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না।"

তারপর অন্য-সব দুর্ভাগ্যকে টেক্কা মারলে এই ঘটনাটি। মালপত্রের

যিনি প্রধান কনট্র্যাক্টার ছিলেন তিনি ফেল মারলেন; হিসাবে যে-দর ধরা হয়েছিল নতুন দর তার চেয়ে অনেক বেশী হ'য়ে গেল; অনেক হাজার বেশী খরচ হ'ল তার ফলে।

টাকা লোকসান হয় হ'ক, কিন্তু পীয়ারকে সাফল্য লাভ করতেই হবে। তার ঈর্ষাক্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীরা টেক্‌নিক্যাল পত্রিকাগুলিতে তার প্ল্যানের নিন্দা করতে সুরু করেচে কিছুদিন থেকে—তারা যে বোকা, পীয়ার তা প্রমাণ করবার আশা রাখে এখনও।

তারপর?

কে জানে হয়তো প্রমিথীয় প্রাণ-দেবতা অনন্তের কোথাও এই বিশ্বের হিসাব খতিয়ানের দেনা-পাওনার আয়োজন করচে। কিন্তু তাতে আমার কোন্ লাভ? আমার অমর আত্মার গতি কি হবে?

চুপ কর—এগোও, এগোও! যে কোনো মুহূর্ত্তে তুষার-ঝঞ্ঝা এসে পড়তে পারে। চল্, চল্!

ঘোড়াটা কোনো রকমে বারো মাইলের এক পাল্লা শেষ করল; সেইখানে উপত্যকা শেষ হ'য়ে গেল। এবার মালভূমির প্রচণ্ড বাত্যার সামনাসামনি। এইখানে পোষ্টিং ষ্টেশন, উপত্যকার শেষ বাড়ী এই। দুলতে দুলতে অন্দরে ঢুকে কামরায় ব'সে কফি-চুরুট সেবন হ'ল।

মার্লে? মার্লে কেমন আছে না জানি!

আঃ! এই তো তার নিজের ঘোড়া! গুড্ ব্রাণ্ডস্‌ডালের সেই বড় কালো ঘোড়াটা এসেছে। ওই বেচারা থাকি ঘোড়াটার আর এই কালোর দুলকি চলনে কত তফাৎ—সে দ্রুত বেগে দরজায় এসে দাঁড়াল। এক নিমেষে পশু চর্ম্মে আপনাকে ঢেকে নিয়ে পীয়ার গাড়ীতে বসল।

আঃ, তাজা ঘোড়া হ'লে কি আরাম! তার স্পর্শে যেন বোঝাটাও হাল্কা হ'য়ে যায়। মাথাটা উঁচু ক'রে ঘণ্টাগুলোকে ঝুনঝুনিয়ে দ্রুত

তুলকি চালে ঘোড়াটা বরফ জমা হ্রদগুলোর উপর দিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। এখানে-সেখানে পাহাড়ের গায়ে দু-একটা ধূসর কুটীর দেখা যায়—এগুলো 'সেটার', ঠিক ওই রকমই হয়তো হাজার দুই বছর ধ'রে ওরা ওখানেই রয়েছে। কিন্তু একটা নতুন যুগ আসচে। সেটারের শিঙা আর বাজবে না; এবার সেখানে টারবাইন ইঞ্জিনের গান উঠতে থাকবে।

হিম-শীতল বাতাস বইচে। ঘোড়াটা মাথা তুলে হেঁটে উঠ্‌চে, বড়বড় তুষার-খণ্ড হাওয়ার মুখে ছুটেচে; খানিক পরেই একেবারে রীতিমত তুষার-ঝঞ্ঝা, যাত্রীর মুখে যেন চাবুক মেরে তার দম বন্ধ ক'রে দিতে চায়। প্রথম ঘোড়ার ঘাড় আর তার লেজটা তুষারে সাদা হ'য়ে গেল, তারপর তার সারাটা শরীর। তুষারপাত আরো ঘন হ'য়ে আসতে লাগল, সেটাকে কাটিয়ে চলবার জন্য ঘোড়া লাফিয়ে চলতে থাকে। সাবাস জোয়ান! অন্ধকার হবার আগেই পৌঁছানো চাই সেখানে! বরফের ওপর দিয়ে পথ নির্দ্দেশ করবার জন্য ছোট ছোট গাছের গুচ্ছ বসানো আছে, কিন্তু এই ঝড়ের মাঝে কে তার দিকে নজর রেখে চলতে পারে? পীয়ারের মুখ যেন সাদা বরফ দিয়ে পলেস্তারা করা হ'য়েছে; বরফের ঘা খেয়ে পীয়ার কেমন যেন হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েছে।

মিসরের জ্বলন্ত রৌদ্রে সে কাজ করেচে, আর আজ এর মাঝে। ইস্পাতের অভিযান চলেচে। ঢেউ ছুটেচে সারা দুনিয়ার ওপর দিয়ে পথ করতে করতে।

এই তুষারপাত যদি বর্ষণে পরিণত হয়, তা হ'লেই বন্যা, তা হ'লেই মজুরদের রাত্তির বেলা বেরিয়ে পড়তে হবে বাঁধ বাঁচাবার কাজে।

আরেকটা দুর্ঘটনা; তা হলে চুক্তির সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা

এক রকম অসম্ভব হয়েই দাঁড়াবে। সেই তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পর এক একটি দিনের মানে এক হাজার ক্রাউন ক'রে জরিমানা।

অন্ধকার হ'য়ে আসে।

শেষটায় পথে আর কিছুই দেখা যায় না, শুধু যেন একটা আকারহীন তুষারপুঞ্জ মাথা নীচু ক'রে ঝড়ের মুখে লড়াই করতে করতে তুষারপুঞ্জের মাঝ দিয়ে পথ ভেঙে চলেচে। সে পথের যেন একটা ঠিক-ঠিকানা নেই, মনে হচ্চে যেন এলোমেলো তার পেছনে একটা অস্পষ্ট শুভ্র পিণ্ড—একেবারে চুণের মত সাদা, তার পেছনে একটি মানুষ কোনো রকমে 'শ্লে'র কড়াগুলো আঁকড়ে ধ'রে তার সাধের প্রাণ বাঁচানর চেষ্টা করচে—এ হচ্চে শেষ স্টেশনের পোষ্ট-বয়।

অবশেষে অন্ধকারে হাৎড়াতে হাৎড়াতে তারা তীরের দিকে চলল, তুষার কুয়াশার মাঝ দিয়ে স্টেশনের ইলেক্‌ট্রিক লাইটগুলো ক্ষীণ ভাবে দেখা যেতে লাগল। শ্লে থেকে নামতে না নামতেই তুষারপাত থেমে গেল, আর মজুরদের ব্যারাক্, সহকারীদের কোয়ার্টার্স, আপিসবাড়ীগুলো আর তার তক্তা দিয়ে তৈরী বাড়ী,—এ সমস্তের ওপর ইলেক্‌ট্রিক সূর্য্যগুলো একেবারে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। দু'জন ইঞ্জিনীয়ার বেরিয়ে এসে পীয়ারকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানালে।

"তার পর কেমন চলছে সব ?"

পাকাদাড়ি লোকটি উত্তর দিলে—"মজুরেরা ধর্ম্মঘট করেচে আজ।"

"ধর্ম্মঘট ? কিসের জন্যে ?"

"সেই কলঘরের লোকটা—যাকে সেদিন মাতলামো করার জন্যে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাকে তারা কাজে ফিরে পেতে চায়।"

পীয়ার ফারের কোট থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলে ব্যাগ হাতে নিয়ে তার বাড়ীটার দিকে চলল, আর সবাই তার পেছনে চললো। "তা

হ'লে তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে কাজে, আমাদের এখন ধর্ম্মঘট হ'লে চলবে না," পীয়ার বলল।

দুদিন পরে, পীয়ার শুয়ে আছে তখন পোষ্টব্যাগটা এলো। বিছানার ওপরেই ব্যাগটা উল্টে ফেলে পীয়ার ক্লাউস ব্রকের একখানি চিঠি দেখতে পেল।

ব্যাপার কি? চিঠিখানা হাতে নিতে তার হাত কাঁপে কেন? নিশ্চয়ই বন্ধু ক্লাউস সাধারণ ভাবে যে-সব চিঠি লিখে থাকে, এও তাই হবে!

"প্রিয় বন্ধু, বড় কঠিন চিঠি লিখচি আজ। কিন্তু আমি আশা করি, তুমি আমার পরামর্শ মত তোমার কিছু টাকা নরওয়েতেই লাগিয়েছিলে। যাহ'ক, সংক্ষেপেই কথাটা ব'লে ফেলি। ফার্দ্দিনান্দ হল্‌ম্ পলাতক, কিম্বা জেলে, কিম্বা হয়তো তার চেয়েও খারাপ অবস্থায়। তুমি ভাল ক'রেই জান এ-দেশে যখন কোনো বড় লোক নিরুদ্দেশ হ'য়ে পড়ে, তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা নিরর্থক। বড বড় জায়গায় সে শত্রু তৈরী করেছিল; ভয়ানক খেলায় সে নেমেছিল—তার পরিণাম এই।

এখানে যখন কোনো কারবার ফেল মারে, আর তাকে দেখবার কোনো শক্ত লোক থাকে না, তখন তার মানে যে কি তা তুমি জান। আমাদের অর্থাৎ ইওরোপিয়ানদের তো এখন সব আশায় জলাঞ্জলি।

ঠাণ্ডা মেজাজেই তুমি এটাকে গ্রহণ করবে জানি! আমার প্রত্যেকটি পাই-পয়সা হারিয়েচি—তোমার তবু ওখানে বাড়ী আছে। ওয়ার্কশপ আছে। আবার তুমি দুগুণো উপায় ক'রে নেবে এ আমি নিশ্চিত জানি, আমি তো তোমায় চিনি! আশা করি বেস্‌না-বাঁধটা ঠিক হ'য়ে যাবে।

—তোমারি চিরদিনের ক্লাউস ব্রক

পুনঃ—বুঝতেই পারচ, আমার বন্ধু শেষ হয়েচে, এবার আমার পালা খুব সম্ভবতঃ। কিন্তু এখন আমার ছাড়বার উপায় নেই, চেষ্টা করলেই সন্দেহ জাগবে। আমাদের অর্থাৎ বিদেশীদের পক্ষে পতনের হাত থেকে বাঁচা বড় কঠিন ব্যাপার। যাক্, যদি আমার সংবাদ আর না পাও তা হ'লে জানবে যে একটা কিছু হয়েচে।"

বাইরে প্রণালী বেয়ে ঝরণার জল-ধারা পড়ছিল। পীয়ার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে রইল; কাপড়ের নীচে একটা হাঁটু উঠতে পড়তে লাগল। সে তার দুই বন্ধুর কথা ভাবছিল। তার মনে হ'তে লাগল, সে এখন দরিদ্র, আর মনে হ'ল যে জামিনের বেশীর ভাগ বোঝাটা এখন বৃদ্ধ লোরেঞ্জ ডি উথোগের উপরই পড়বে। আর কি পীয়ার, স্পষ্টই তো দেখচ, তোমার পথটিকে সহজ করার চেয়ে অন্য কাজে এখন ভাগ্যদেবতা ব্যস্ত। তোমাকে এখন একা-একাই সংগ্রাম করতে হবে।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

হেমন্তের শেষাশেষি। সন্ধ্যাবেলা মার্লে বাড়ীতে ব'সে তার স্বামীর প্রতীক্ষা করচে। কয়েক সপ্তাহ হ'ল পীয়ার গেছে। তার ফিরে আসবার দিনে সে যে একটুখানি উৎসবের আয়োজন করবে সে তো খুবই স্বাভাবিক। সবগুলো ঘরে আলো জ্বালানো হয়েচে, সবগুলো স্টোভে কাঠের আগুনের পটাপট শব্দ হচ্চে; রাঁধুনী পীয়ারের প্রিয় খাদ্য তৈরী করতে ব্যস্ত, আর পাঁচ বছরের ছোট্ট লুইসে তার নীল মখমলের ফ্রকটি পরে মেজের পরে ব'সে তার ছোট পুতুলের পরিচর্য্যা করতে করতে তাদের সঙ্গে কথা বলচে, "দ্যাখো, জোসোফিন, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার দাদামশাই এখুনি আসবেন।"

মার্লে রান্নাঘরের ফাঁক দিয়ে তাকায়, বলে, "বার্থা, ক্ল্যারেটটা আনা হয়েছে তো? বেশ, ওটা বরং স্টোভের কাছে রেখে দাও, একটু গরম হ'ক।" তারপর মার্লে আবার সবগুলো ঘর ঘুরে আসে। সব চেয়ে ছোট মেয়ে দুটি বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্চে। আর কিছু করবার নেই তো?

তার আসার এখনো অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক; মার্লে তবু পথের ওপর চাকার শব্দ শোনবার জন্য উৎকর্ণ না হ'য়ে পারে না। কিন্তু এখনো কাজ শেষ হয় নি তো। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে গরম জলের কলটা খুলে দিলে। চুলটা শুকনো রাখার জন্য অয়েল ক্লথ দিয়ে মাথাটা ঢেকে স্পঞ্জ আর সাবান দিয়ে গা ধোয়া আরম্ভ করলে। যদিচ চারদিক তাদের একরকম অন্ধকার, তবু সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে মনোহারিনী হবার।

মনে মনে একটি কথার স্রোত ব'য়ে চলল। একজনের দেহ যে আরেকজনের কাছে এত আনন্দের হ'তে পারে, এটা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এইখানে সে চুমো খেয়েছিল, এইখানে—এইখানে—আর কতবারই না সে আনন্দে আত্মহারা হয়েচে। মনে আছে কি সেই সেবারের কথা? তুমি স'রে স'রে থাকতে, বোধ করি একটু বেশি রকমই; এখন আর কি উপায় আছে? আঃ এখন তার অন্য জিনিস ভাববার আছে! সেদিন চ'লে গেছে, যেদিন সকল বিপত্তির মাঝে তুমিই প্রচুর সান্ত্বনা হ'তে পারতে। একেবারেই কি চ'লে গেছে সেদিন? হ্যাঁ, নিশ্চয়; শেষবার যখন সে বাড়ী এসেছিল, তখন আমাদের নতুন মেয়েটাকে সর্বপ্রথম দেখেও সে এতটুকু লক্ষ্য করলে না! হ্যাঁ, লগ্ন ব'য়ে গেছে, তাতে আর সন্দেহ চলে না। সেদিন সে কোনো অনুযোগ জানায় নি, শান্ত ধীর ছিল তার ব্যবহার; কিন্তু মন তার ছিল কত সব গুরুতর ব্যাপারের চিন্তায় পূর্ণ। সেখানে স্ত্রীপুত্রের

এতটুকু স্থান নেই। আজ সন্ধ্যাবেলাও কি তাই হবে? তাকে খুসী করবার জন্য তুমি যে প্রসাধন করলে, সে কি তা দেখবে! তোমায় জড়িয়ে ধ'রে আর কি সে আনন্দ অনুভব করবে?

সাদা ফ্রেম দেওয়া মস্ত আয়নাটার সামনে মার্লে দাঁড়াল, নিজেকে সে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল। না, তার সেই তারুণ্য আর নেই। গত কয়েক বছর থেকে তার গালের সেই অরুণিমাটুকু ম্লান হ'য়ে এসেচে, আর দু'চারটে রেখাও পড়েচে কপালে; তাদের লুকানো চলে না। কিন্তু ওই তার ভুরু—সে এক সময় ওই ভুরুতে চুমো খেতে ভালো বাসত—ভুরু নিশ্চয়ই আগের মতই আছে। নিজের অজানতেই মার্লে দর্পণের দিকে ঝুঁকে ঘন ভুরুতে হাত বুলোতে লাগল, এ যেন পীয়ারের হাত তাকে আদর করচে।

চওড়া লেসের কলার দেওয়া আর চওড়া হাতায় সোনালি লেস লাগানো ঢিলে নীল পোষাকটি পরে শেষে মার্লে নীচে নেমে এলো। বেশি সাজগোজ না দেখায় সেইজন্যে একটা লাল-ফুল তোলা এপ্রন দিয়ে সে আপনাকে মামুলি গৃহিণীর মত সাজালে।

সাতটা বেজে গেল। লুইসে খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে তার কাছে এল; মার্লে তাকে কোলে নিয়ে জানালার পাশে একটা চেয়ারে ব'সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। রাতের বেলা গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দে নিয়তির আবির্ভাবও হ'তে পারে। কোন সিদ্ধান্ত, কোন চরম কথা এক নিমেষে আমাদের সৌভাগ্য থেকে সর্বনাশের তলায় ফেলে দিতে পারে; কে বলতে পারে? পীয়ার ইংলণ্ডে গেছে, কোম্পানীর সঙ্গে একটা রফা করতে। শ্‌শ্‌—চুপ—চাকার শব্দ হ'ল না? মার্লে কাঁপতে কাঁপতে উঠল, উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগল।

না, গাড়ীটা চ'লে গেল।

আটটা বেজে গেল ; লুইসের শোবার সময় হ'য়ে গেছে। মার্লে তার জামা ছাড়াতে লাগল। অল্পক্ষণের মাঝেই লুইসে তার ছোট্ট বিছানাটিতে দুপাশে দুটি পুতুল নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। লুইসেটা বকবক করছিল, "বাবাকে আমার চুমো আর ভালোবাসা দিও মা, কেমন ? আচ্ছা মা, কাল সকালে বাবা আমায় তার বিছানায় একটুখানি যেতে দেবেন না ?"

"ওঃ নিশ্চয় দেবেন! এখন শুয়ে পড়তো, ঘুমোও; এই তো লক্ষ্মীটি।"

মার্লে আবার ঘরে এসে বসল প্রতীক্ষায়। শেষে মার্লে উঠে পড়ল, একটা গাউন পরে মার্লে বেরিয়ে পড়ল।

হেমন্ত অন্ধকারে অস্ফুট শুভ্র আলোকাবরণে ঢাকা সহর, কালো পাহাড়ের ওপর দিয়ে অগণিত তারায় ভরা আকাশ দেখা যাচ্চে। সেইখানে কোথাও পীয়ার আছে, হয়ত অনেক দূরে কোনো গ্রাম্যপথে ঘোড়াটা আপন ইচ্ছামত অন্ধকারের মাঝ দিয়ে চলেচে আর মালিক মাথা নীচু ক'রে ভাবচে।

"ওগো তুমি আমাদের সহায় হও ; তাকে সহায়তা দাও ; কিছুকাল থেকে সে যে বড় বেশি বিপন্ন হ'য়ে পড়েচে।"

কিন্তু তারকাপূর্ণ আকাশ হিমশীতল, উদাসীন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রার্থনা সে এর পূর্ব্বে কত শুনেচে—মানুষের প্রার্থনায় এ বিশ্বজগতের কি!

মার্লের মাথাটা ঝুঁকে পড়ল, আবার সে বাড়ীর ভেতর এলো।

পাহাড়ের চড়াই দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে পীয়ার যখন বাড়ীর দিকে চলেচে তখন রাত দুপুর। উজ্জল-বাতায়ন সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর দৃশ্যটা তার শ্রান্ত মনকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করল যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে ঘোড়াটাকে একটা চাবুক কসিয়ে দিলে।

আস্তাবলের চাকরটা একটা আলো নিয়ে এগিয়ে এলে, তার দিকে ঘোড়ার বল্লাটা ছুঁড়ে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে যখন সে উঠতে লাগল তখন এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার মাঝে তার কেমন একটা ভয়ই করতে লাগল ; এ যেন তার বাড়ী নয়, যেন আর কারু হ'য়ে গেছে।

বৈঠকখানার দোর খুলে ঢুকল সে, কেউ নেই, শুধু আলো আর আরাম। ঘরের ভেতর দিয়ে পীয়ার তার পাশের ঘরটায় প্রবেশ করল ; মার্লে একাটি বসে আছে একটা আর্ম্ম-চেয়ারে ; বাহুর পরে মাথাটি রেখে ঘুমিয়ে পড়েচে।

এই দীর্ঘক্ষণ ধ'রে সে কি তার প্রতীক্ষা করছিল ?

প্রাণটা যেন সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠল ; স্তব্ধ হ'য়ে সে মার্লে'র পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; ঠিক তখনি মার্লে'র নুয়ে-পড়া দেহটি ধীরে ধীরে সোজা হ'য়ে গেল, মার্লে'র পাণ্ডুর মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। তাকে আর না জাগিয়ে, সে গিয়ে শিশুদের ঘরে প্রবেশ করল, সেখানে তখনো আলোগুলো জ্বলচে। কিন্তু সেখানে সেই আলোকে শুধু তাদের ছোট তিনটি শিশু পরিষ্কার জামা পরে ঘুমিয়ে আছে।

পীয়ার ডাইনিং রুমের দিকে ফিরে এলো, আরো আলো ; দুজনের জন্য একখানি টেবিল পাতা, ধবধবে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা, তার ওপর ফুল। পীয়ারের ন্যাপকিনটাতে একটা হালকা বেগুনি রঙের ফুল বাঁধা —এ নিশ্চয় লুইসে, ছোট্ট লুইসের কাজ।

শেষে কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে মার্লে জেগে উঠল, "এ্যাঁ, এসেচ তুমি ?"

"শুভ সন্ধ্যা, মার্লে !" তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলে, পীয়ার মার্লে'র কপালে চুমো খেলে, কিন্তু মার্লে বুঝতে পারল যে পীয়ারের মন অন্য চিন্তায় উন্মনা।

টেবিলের সামনে বসে তারা খাওয়া শুরু করল। পীয়ারের মুখের ভাব, তার কণ্ঠস্বর, তার শান্তভাব—এসব মার্লে বুঝতে পারে, মার্লে বুঝতে পারে, খবর ভালো নয়।

কিন্তু মার্লে তাকে কোনো প্রশ্নই করে না, সে শুধু দেখাতে চায়, যদি তারা পরস্পরকে ভালোবাসে তা হ'লে আর সবই সইতে পারা যাবে।

কিন্তু সে দিন তো আর নেই, যেদিন মার্লের একটুখানি অপ্রত্যাশিত আদর পীয়ারকে আনন্দে পাগল ক'রে তুল্‌তো। রুদ্ধ প্রতীক্ষায় মার্লের ভেতরটা কাঁপতে থাকে, বিস্মিত হ'য়ে ভাবে, পীয়ার কি তাকে লক্ষ্য করবে, এখনো যেটুকু সৌন্দর্য্য, যেটুকু তারুণ্য তার মাঝে অবশিষ্ট রয়েচে, তাতে কি পীয়ার তার সঙ্গিনীকে নিয়ে আজ একটুও সান্ত্বনা পাবে?

পীয়ার যেন বহুদূর থেকে দেখচে এমনি ভাবে মৃদু হেসে একবার সে মার্লের পানে চাইল। পীয়ার প্রশ্ন করল, "মার্লে, তোমার বাবার সমস্ত সম্পত্তির দাম কত হবে মনে কর?" এ যেন জাহাজডুবির সময় সেতুর পরে দাঁড়িয়ে কাপ্তেনের দৃঢ় শান্ত আদেশের মত।

"ও পীয়ার, আজ রাতে আর ওসব ভেবে কাজ নেই; তোমায় আজ স্বাগত করচি আমি," বলে মৃদু হেসে মার্লে তার হাতটি ধরে।

"ধন্যবাদ" বলে পীয়ার মার্লের আঙুলগুলো চেপে ধরে, কিন্তু পীয়ারের ভাবনা তখনো বহুদূরে। কি যে খাচ্চে সেদিকে লক্ষ্য না করেই সে সে খেতে লাগল।

"তোমার কি মনে হয় পীয়ার? লুইসে তো বেহালা আরম্ভ করেচে; ওই ছোট্ট মেয়ে যে কেমন বাজাচ্চে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

"আচ্ছা, তাই নাকি?"

"আর, আস্টার আরেকটা দাঁত উঠেচে, ওটা ওঠার সময় বেচারীর বড় কষ্ট গেচে!"

সন্তানগুলোকে পীয়ারের সামনে তুলে ধ'রে মার্লে বলতে চায়, 'আর কিছু না থাক, অন্ততঃ এরা তো আছে আমাদের।'

পীয়ার নিমেষকাল মার্লের পানে তাকিয়ে থাকে, বলে, "মার্লে, আমায় বে করা তোমায় উচিত হয়নি; তোমার পক্ষেও ভালো হ'ত, তোমার বাপ-মায়ের পক্ষেও ভালো হ'ত।"

"কি যা-তা বলচ, পীয়ার। এ সব আবার তুমি ঠিক ক'রে নেবে তাতো জান।"

তারা শুতে গিয়ে কাপড় ছাড়তে থাকে। মার্লে ভাবতে থাকে, "পীয়ার এখনো আমায় লক্ষ্য করে নি।"

একটুখানি হেসে মার্লে বলে, "আজ সন্ধ্যাবেলা ব'সে ব'সে আমি আমাদের দেখার প্রথম দিনের কথাটা ভাবছিলাম। তুমি বোধ করি সে কথা কখনো মনেও কর না?"

অর্দ্ধেক কাপড় ছাড়া অবস্থায় পীয়ার ফিরে মার্লের পানে তাকায়। মার্লের কথাগুলো, পীয়ারের কানে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক লাগে; ভাবে, 'আমি কেমন আছি, কাজকর্ম্ম কেমন চলচে সে কথাটা একবার জিজ্ঞাসাও করচে না!' কিন্তু তারপর মার্লের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষে পীয়ারের চোখ খুলে যায়, মার্লের হাসির অন্তরালে তার উদ্বিগ্ন চিত্তটিকে দেখতে পায়।

ও হ্যাঁ; সেই সুদূর গ্রীষ্মকালটি তার ভালো করেই মনে পড়ে। জীবন ছিল তখন পাহাড়ের মাঝে একটা ছুটি; তখন তার জীবনে সর্বপ্রথম ষ্টোভে কফি তৈরী করতে করতে একটি মেয়ে তার পানে চেয়ে হেসেছিল। আরো মনে পড়ল তার উজ্জ্বল হ্রদ-দর্পণের ওপর তার

ভালোবাসার প্রথম অরুণ-রাত্রিটি, যখন স্বর্গমর্ত্ত্যের পানে একটি বিপুল স্তব-সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে তার হৃদয়টিকে পূর্ণ ক'রে তুলেছিল।

মার্লে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মার্লে এখনো আছে তার। কিন্তু তাদের জীবনে এই সর্বপ্রথম মার্লে তার কাছে দীনবেশে উপস্থিত; আজকের এই আমাকে নিয়ে তোমার যদি এতটুকু তৃপ্তিও সম্ভব হয়, তা হ'লে সেইটুকুই নাও—এই তার ভিক্ষা পীয়ারের কাছে।

পীয়ারের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রবাহ ব'য়ে যেতে লাগল। কিন্তু পীয়ার আবেগোদ্বেল আনন্দের ঝড়ে মার্লেকে উধাও ক'রে নিয়ে যেতে চাইল না, মার্লেকে আলিঙ্গন করতে সে ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। সমুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে পীয়ার দাঁড়িয়েই রইল, আর ঠোঁট চেপে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, 'সব বাধাকে বিচূর্ণ ক'রে পথ বার করব, এখনো আমাদের যা-কিছু আছে তা বাঁচাব।'

'আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাদা বিছানায় তারা গভীর ঘুমে মগ্ন হ'য়ে গেল। সটান হ'য়ে শুয়ে ওপর দিকে মুখ ক'রে চোখ বুজে পীয়ার ভাবতে লাগল। তার প্রিয়পাত্রদের রক্ষা ক'রবার একটা পথ সেই অন্ধকারে সন্ধান করতে লাগল সে। আর মার্লে সেই অন্ধকারে পীয়ারের একটুখানি আদরের প্রতীক্ষা করতে লাগল অনেকক্ষণ ধ'রে, শেষে রুমালটা বার ক'রে তা দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরল আর নিঃশব্দ রোদনের বেগে তার সর্ব্বদেহ কম্পিত হ'তে লাগল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ লোরেঞ্জ ডি উথোগ তাঁর ক্রসেথ-বাসিনী ধনবতী ভগ্নীটির সঙ্গে ক্বচিৎ দেখা করতে যেতেন, কিন্তু আজ তিনি প্রান্তপথ বেয়ে এখানে উপস্থিত হয়েচেন। দুটি প্রভুত্ব-প্রিয় বুড়োবুড়ী পরস্পরের সামনা-সামনি ব'সে।

পিসী মারিট পুরুষের মত হাঁটুটায় হাত বুলোতে বুলোতে তাঁর বিপুল বক্ষটিকে ফুলিয়ে দিয়ে বললেন, "পথটা তা হ'লে খুঁজে পেয়েচ, কি বল?"

উথোগ তাঁর চওড়া কাঁধটাকে সোজা ক'রে বললেন, "হ্যাঁ, ভাবলাম দেখে যাই কেমন আছ।"

"ধন্যবাদ, বেশ ভাল আছি। আমার তো আর জামাই নেই, তাই এটা বেশ বলতে পারি যে, দেউলে হবার আমার বিশেষ সম্ভাবনা নেই।"

বৃদ্ধ লাল চোক দুটো পিসীর দিকে নিবদ্ধ ক'রে বললেন, "আমিও দেউলে নই।"

"না হ'তে পার। তার কি খবর?"

"সেও নয়। বেশি দিন লাগবে না,—সে আবার ধনী হ'য়ে উঠবে।"

"সে? ধনী? কি বললে?"

বৃদ্ধ শান্তভাবে বললে, "একটি বছরও যাবে না। কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে হবে।"

পিসী মারিট চেয়ারটাকে পেছন দিকে সরিয়ে অবাক হ'য়ে বললেন, "আমি? কি বললে, আমি আমি? হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক ক'রে বলতো, ওই তোমার ড্রেন, না, খাল না কি যেন, সেটাতে ও কয় লাখ লোকসান দিয়েছে?"

"আমি জানি, সে যে কড়ার করেছিল তার চেয়ে ছ'মাস বেশি সময় নিয়েছিল। কিন্তু কোম্পানী যখন দেখলে কি অদ্ভুত কাণ্ড সে করেচে, তখন বাজেয়াপ্ত টাকার পরিমাণটা কোম্পানী অর্দ্ধেক করতে রাজি হয়েছে।"

"হ্যাঁ, তারপর কণ্ট্র্যাক্টরদের খবর কি? তাদের নাকি পীয়ার টাকা দেয়নি শুনচি?

"এখন সে তাদের সব টাকা দিয়ে দিয়েচে; ব্যাঙ্ক সে সব ব্যবস্থা করেচে।"

"বুঝেচি, সে আর তুমি—তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়েছ তবে! যা করেচ, তোমাদের দুজনকেই আচ্ছা ক'রে বেত লাগানো উচিত।"

উথোগ দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

"টাকার দিক দিয়ে কাজটা সফল হয়নি তার তা স্বীকার করি কিন্তু টেকনিক্যাল কাগজগুলোয় ইঞ্জিনীয়াররা এ সম্বন্ধে কি বলচেন তা তোমায় দেখাচ্চি। এই দেখ সেই বাঁধের আর পীয়ারের ছবিশুদ্ধ একটা প্রবন্ধ।"

বিধবাটি প্রবন্ধটির পানে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে বললেন, "বেশ তো! ওই সব প্রবন্ধ দিয়ে সে তার সংসারের পেট ভরাক না!"

কাগজগুলো আবার পকেটে রেখে দিয়ে তাঁর ভ্রাতা বললেন, "আবার শীগ্‌গিরই ও সবার ওপরে স্থান করে নেবে।"

কোনরকম বিচলিত না হ'য়েই তিনি ভগ্নীর সামনে ব'সে রইলেন। ইনি লোককে দেখাতে চান, অবস্থা বিপর্য্যয়ে দলিত পিষ্ট হবার মত লোক ইনি নন; এঁর কাছে টাকাটাই সব চেয়ে বড় জিনিষ নয়, এর চাইতেও বড় জিনিষ আছে।

পিসী মারিট পুনরুক্তি ক'রে বললেন, "আবার ওপরে উঠবে! আবার বুঝি কোনো ছাইপাঁশ দিয়ে সে তোমায় ফুসলিয়েচে?"

"সে একটা নতুন ঘাস-কাটা কল তৈরী করচে, প্রায় শেষ হ'য়ে এসেচে। বিশেষজ্ঞদের মত হচ্চে এর দাম হবে দশ লাখ।"

"ও! তুমি ওই গল্প দিয়ে আমায় ভুলোতে চাও!" বলে বিধবা তাঁর চেয়ারটাকে আরো পেছনে সরিয়ে নিলেন।

"এই বছরটা চালিয়ে নিতে আমাদের দুজনকেই তোমায় সাহায্য করতে হবে। যদি তুমি ত্রিশ হাজারের জন্য জামিন হও তা হ'লে ব্যাঙ্ক···

পিসী মারিট খুব জোরে হাঁটু চাপড়ে ব'লে উঠলেন, "ওসব কিছুই আমাকে দিয়ে হবে না!"

"তা হ'লে বিশহাজার?"

"বিশটি পয়সার জন্যও না!"

লোরেঞ্জ উথোগ বোনের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থাপন করলেন। তাঁর লাল চোখ দুটো জ্বলে উঠল। শান্ত কণ্ঠে বললেন, "মারিট, এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।" বলে পকেট থেকে পাইপটা বার ক'রে নিয়ে তাতে তামাক পাতা দিয়ে আগুন ধরাতে লাগলেন।

দুজনেই পরস্পরের পানে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলেন। প্রত্যেকের মন একেবারে খাড়া হ'য়ে রইল। পাছে অন্যের কাছে নত হ'তে হয়, এই আশঙ্কা নিয়ে। এতক্ষণ ধরে তাঁরা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন যে শেষে দুজনেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেসে ফেললেন।

ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়ে বিধবাটি শেষে ব'লে উঠলেন "বোধ করি এখন স্ত্রীকে নিয়ে গির্জ্জায় যাওয়া সুরু করেচ?"

উত্তর এলো, "যদি প্রভুর ওপর বিশ্বাস থাকত তা হ'লে প্রার্থনা

করতে ব'সে যেতাম আর সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেলেও কিছু করতাম না। কিন্তু মানুষের কাজের ওপর আমার বেশি বিশ্বাস। তাই আজ এখানে এসেচি।"

উত্তরে পিসি খুসী হ'য়ে উঠলেন। ক্রসেথের এই বিধবাটি নিজেও গির্জ্জায় যেতেন না। তাঁর মনে হ'ত যে, তাঁকে সন্তান না দিয়ে প্রভু একটা ভয়ানক ভুল করেচেন।

আসন ছেড়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কফি আনব?"

"এতক্ষণে সুবুদ্ধির কথা বলেচ" বলতে বলতে ভায়ের চোক দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

এই বোনটিকে আর তার ভাব-সাব তাঁর জানা ছিল। পাইপটা ধরিয়ে উথোগ এবার আরাম ক'রে চেয়ারে হেলান দিলেন।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আবার একবার ঢালাইয়ের কারখানায় আগুন আর ইস্পাতের সঙ্গে পীয়ারের মল্লযুদ্ধ সুরু হলো।

ওয়ার্কিং ড্রয়িংটা দরকারী জিনিষ; মাথার ভেতরকার পরিকল্পনাটাও বেশ। কিন্তু তার পরিকল্পনাকে ধরা-ছোঁয়া যেতে পারে এমন মডেলে পরিণত করবার জন্য সে যে-সব লোক নিযুক্ত করল তারা সব ধীরে ধীরে কাজ করতে লাগল। যা করতেই হবে তাতে নিজের হাতই বা লাগাবে না কেন?

যখন মিস্ত্রী-মজুরেরা সকালবেলা কারখানায় এলো, তখন ছোট ঘরের ভেতর হাতুড়ি পেটা আরম্ভ হয়ে গেছে। আবার যখন তারা সন্ধ্যাবেলা বিদায় নিলে, কর্ত্তাটি তখনও কাজ থেকে বিরাম নেন নি'।

রিজেবীর 'ভালো-মানুষেরা' যখন শুতে যায় তখন তারা জানলা দিয়ে তাকায় আর তার কারখানায় আলো দেখতে পায়।

এইখানে কাজ সুরু করবার আগেও পীয়ার এমন যথেষ্ট কাজ করেচে যা তাকে ক্লান্ত করেচে। কিন্তু সেই সময়, এটা ওটা করবার মত যথেষ্ট শক্তি তার আছে কিনা একথা কেউই তাকে জিজ্ঞাসা করে নি। নিজে তো কখনো করেই নি, আগের মত এখনও সেই একই প্রশ্ন, যে-কোনো রকমে হোক কাজটাকে করা চাই। এর আগে কোনো কাজে কিন্তু এতখানি দায় জড়ায় নি।

নতুন মেশিনের কাঠের মডেলটা তৈরী হয়ে গেছে, ঢালাই করা অংশগুলোও লাগান হয়েছে। জিনিষটা দেখতে খুবই সাদাসিধে, কিন্তু প্রথমকার তৈরী সাদাসিধে যন্ত্র আর এতে কত তফাৎ—এ যেন একটা জীবন্ত বস্তু, যেন ধাতু দিয়ে তৈরী একটা মস্তিষ্ক। এই যে চাকা আর চক্রদণ্ড (axle) গুলো, এদের পিতা-প্রপিতামহদের আবির্ভাব হয়েছিল কোন্ অতীতে; ইস্পাত তাদের জন্ম দিয়েচে, তারা আবার আরো সূক্ষ্ম, আরো শক্তিশালী, আরো কর্মপটু যন্ত্রকে জন্ম দিয়েছে। তারপর সেই ক্রম-বিকাশের পথে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই বিশেষ যন্ত্রটিকে আজ তার এই শেষের স্তরে এনে উপস্থিত করেচে—কিন্তু মোটের ওপর এটা কি বিশেষ ভালো হয়েচে? কোনো উদ্ভাবন তার আবিষ্কর্ত্তার অর্থোপার্জন করবার মত সার্থকতা হয়ত পেতে পারে কিন্তু তাই তো সব নয়! আরো কিছু হওয়া চাই; সারা দুনিয়ার মাঝে এর সাফল্য চাই, যাতে এ যন্ত্র "প্রেয়ারী" (prairie)র মাঝ দিয়ে, ভারতবর্ষ আর মিশরের বিশাল প্রান্তরের মাঝ দিয়ে আপনার পথ করে নিয়ে চলতে পারে, এমন হওয়া চাই। ঘুম? বিশ্রাম? খাওয়া? এত বড় দায়ের সামনে এ সবের মূল্য কতটুকু?

পীয়ারের সেই প্রশ্ন আর নেই ; 'কেন?' 'কোথায়?' 'তারপর?' এসব ভাবা বৃথা। তার দিগন্তসীমা সঙ্কুচিত হয়ে মাত্র ওই একটি সমস্যায় এসে ঠেকেচে। একদিন ভূমার স্বপ্নের সঙ্গে তার কাজের স্বপ্নের যোগ ছিল, মিল ছিল ; আজ নিশ্চয়ই তা নেই। আচ্ছা, মানব জাতি যদি ওই একটি যন্ত্র বেশি পায়ই, তাতে তার লাভটা কতই বা হবে? মানুষের অন্তরে কি তাতে উষার আলো একটুও বেশি হবে?

কিন্তু যাই হোক, এই কাজই আজ তার সব। এই-ই হতে হবে, হওয়া চাই। পীয়ার আজ এর সঙ্গে কঠিন ভাবে বাঁধা।

যখন পীয়ার জানালার দিকে মুখ তুলে চায়, মনে হয় যেন প্রত্যেক সাসির ভেতর দিয়ে কারা চেয়ে আছে ; যেন তারা বলে, "কি? এখনো হল না? যদি না হয় তা হলে কি হবে ভেবে দেখো।" মার্লের মুখ আর ছেলেপিলেগুলোর মুখ যেন ভেসে ওঠে, তারা ব'লে, "এই শীতে কি লোরেঙ থেকে বিতাড়িত হতে হবে আমাদের?" বৃদ্ধ উথোগ আর তাঁর স্ত্রীর মুখ, "এই জন্যই কি এই সম্মানিত পরিবারে প্রবেশ করেছিলে, তাদের সর্ব্বনাশ করবার জন্য?" আর তাদের পেছনে যেন সারাটা শহর ভিড় করে আসতে থাকে। কতখানি যে এর সঙ্গে জড়ানো, কেন যে সে এত খাটে, সবাই তা জানে, সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে ; আর সবারই মত ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও প্রতীক্ষা করতে থাকে।

সাঁড়াশি দিয়ে ঘাড়টাকে চেপে ধরে কে যেন বলে, করতে হবেই তোমায়। ক্লান্ত? কঠিন? সময় বড় কম? এসব কিছু কথা নয়। করতে হবেই তোমাকে! এটা-সেটা অসম্ভব? বেশ তো, সম্ভব করে তোল। সম্ভব করে তোলাই তো তোমার কাজ।

বাড়ীতে এখন আর যাওয়া হয় না বললেই চলে, ওয়ার্কশপে একটা সোফাই এখন তার শয্যা হয়েচে। মার্লে এখন প্রায়ই তার খানা নিয়ে

আসে। তার শীর্ণ পাংশু চেহারা আর পাকাচুলের দিকে তাকিয়ে মার্লের কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না, বরং মার্লে পরিহাস করবার চেষ্টা করে। যেখানে হাসি দিয়ে ছায়ামুর্ত্তিদের দূরে রাখতে হত সেই বাড়ীতে বহুপূর্ব্বেই মার্লে প্রফুল্ল থাকবার সাধনা করেচে।

কিন্তু একদিন, মার্লে চলে যাচ্চে এমনি সময় পীয়ার তাকে টেনে ধরল, কেমন একরকম হেসে মার্লের পানে চাইল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মার্লে জিজ্ঞেস করলে, 'কি প্রিয়?'

পীয়ার মার্লের পানে তেমনি করেই, সেই সুদূর হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইল। পীয়ার যেন মার্লের ভেতর দিয়ে সেই ছোট্ট জগৎটির পানে তাকিয়ে রইল, যে জগতের প্রতীক এই মার্লে। এই গৃহ, এই পরিবার যাকে গৃহহারা মানুষ পীয়ার মার্লের ভেতর দিয়ে অর্জ্জন করেচে, এর কি আজ ভরাডুবি হবে?

পীয়ার মার্লের চোখে চুমো খেয়ে তাকে ছেড়ে দিলে।

মার্লের পায়ের ধ্বনি মিলিয়ে যায়: পীয়ার নিমেষকাল দাঁড়িয়ে থাকে; এই কাজে যেন সে কৃতকার্য্য হয়, উর্দ্ধে কোন্ শক্তির কাছে প্রার্থনা করবার জন্য একটা আকস্মিক ইচ্ছা তাকে চঞ্চল করে তোলে। কিন্তু তেমন কোনো শক্তি যে নেই! তাই শেষটায় তার দৃষ্টি আবার লোহা, আগুন, যন্ত্রপাতি আর তার নিজের হাতের পানেই ফিরে আসে; দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন সে এদের কাছেই প্রার্থনা করে, 'সহায় হও আমার। যাতে আমার স্ত্রী সন্তানদের সুখটুকু বাঁচাতে পারি, সেজন্য আমায় সহায় হও!'

ঘুম? বিশ্রাম? ক্লান্তি? আর একটি বছর রেয়াতী পাওয়া গেছে। ব্যাঙ্ক শুধু একটি বছর অপেক্ষা করবে!

শীত-বসন্ত তখন কেটে গেছে, জুলাই মাস। একদিন পীয়ার বাড়ী

এসে মার্লের কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "কাল, মার্লে; তারা কাল আসচে!"

"কারা?"

"যারা কলটা দেখবে। কাল আমরা ওটার কাজ পরখ করবো।"

রুদ্ধশ্বাসে তার পানে তাকিয়ে থাকে মার্লে, বলে, "ও পীয়ার!"

পীয়ার বলতে থাকে, "ভালো বলতে হবে যে বিদেশে আমার জানাশোনা ছিল! একজন আসচেন একটা ইংলিশ ফার্ম্ম থেকে, আরেকজন আসচেন আমেরিকা থেকে। খুব বড রকমের ব্যবসাই হবে এতে।'

কাল এল। পীয়ার যখন হ্যাটটাকে পেছন দিকে বাঁকা করে বসিয়ে রাত্রির বর্ষণশেষের কুয়াসার মাঝ দিয়ে চলে গেল, মার্লে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে থাকবার সময় কোথায়! অপরিচিতেরা আসবেন ডিনারে, মার্লেকেই তার আয়োজন করতে হবে।

বাইরে ময়দানে হাল্‌কা-গড়ন একটি নতুন রঙ লাগানো মেশিন; চাকর-ছেলেটা তাতে ঘোড়া জুতছিল।

নরম-হ্যাট আর হালকা ওভার-কোট পরা দুটি লোক এলেন সেখানে—বৃদ্ধ উথোগ আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। ছড়ির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা চারদিক দেখতে লাগলেন; এই দিনের ফলাফল এই দুটি ভদ্রলোকের পক্ষে তুচ্ছ ব্যাপার নয়। লোরেঙ থেকে বড় গাড়িতে করে দুটি অপরিচিত ভদ্রলোককে নিয়ে পীয়ার হাজির হল, পীয়ার হোটেল থেকে তাদের আনতে গিয়েছিল।

পীয়ার যখন উঁচু আর ঘন ঘাসের মাঠটার ওপর দিয়ে মেশিনটাকে চালাবে বলে লাগাম হাতে নিয়ে বসল, তখন তার মুখ একটু পাংশু হয়ে এল।

ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে লাফিয়ে চলবার চেষ্টা করতে লাগল; পেছনে মেশিনের শব্দে একটু চমকে উঠে, তার পর সহজগতিতে চলা সুরু হল; ইস্পাতের কাঁচিগুলো বৃষ্টি-ধোয়া উজ্জ্বল তৃণপ্রান্তরের ওপর দিয়ে একটি চওড়া পথ কেটে চলতে লাগল।

বিদেশীদ্বয় পেছনে পেছনে ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন, আর কাটা ঘাসের ওপর মাঝে মাঝে থেমে দেখতে লাগলেন কাঁচিতে ঠিক কাটচে কি না। প্যাঁস-নে পরা প্রকাণ্ড দাড়িওয়ালা দীর্ঘকায় লোকটি ছিলেন লীড্স-এর জন ফাউলারের এজেন্ট, আর ইহুদীদের মত নাক, পরিষ্কার কামানো লোকটি ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার হ্যারো এণ্ড কোং-র প্রতিনিধি।

মাঝে মাঝে পীয়ারকে থামিয়ে তাঁরা মেশিনের অংশ বিশেষ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

তখন তাঁরা অন্যরকম জমির ওপর মেশিনটাকে চালিয়ে দেখাতে বললেন, অসম ঢালু জমির ওপর যেখানে থোবা থোবা ঘাস হয়েছিল। শেষে ফাউলারের এজেন্ট বললেন, 'মেশিনটাকে এক টুকরো পাথুরে জমির ওপর চালিয়ে দেখা দরকার।' কিন্তু তাতে কাঁচিগুলো যে নষ্ট হবে? 'তা খুব সম্ভব হবে' কিন্তু ফাউলারের লোকটি ঠিক ঠিক জানতে চান জমিতে পাথর থাকলে কাঁচিগুলোর কি রকম অবস্থা হবে।

শেষে মেশিনের পরখ শেষ হল, দর্শকেরা চিন্তিত ভাবে পরস্পরের পানে চেয়ে মাথা নাড়লেন। নিশ্চয়ই একটা নতুন জিনিষ তাঁরা দেখলেন বটে। এই দুনিয়ায় কৃষি-যন্ত্র বিভাগে যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলচে, তাতেও এই যন্ত্রটি প্রায় আর সব যন্ত্রকেই বাজার থেকে তাড়াতে পারবে এমন সম্ভাবনা এর মাঝে আছে।

পীয়ার তাঁদের চোখের ভাবে এটা বুঝতে পারল, উত্তেজনালেশহীন

বিশেষজ্ঞের চোখে একটা স্বপ্নের মায়া—তারা যেন সোনার নদী দেখতে পেয়েচে।

কিন্তু তবু একটুখানি 'কিন্তু', সামান্য একটা কিন্তু রয়ে গেল।

ডিনার হয়ে গেল, দর্শকদ্বয় চলে গেলেন, খালি মার্লে আর পীয়ার। মার্লে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে পীয়ারকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে সব ভালয় ভালয় হয়ে গেছে ত?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আর একটুখানি কাজ বাকী রয়েচে।"

"এই ক'মাস এত খেটেও আবার একটুখানি বাকী?" বলে মার্লে বসে পড়ল, হাত দুটো কোলের ওপর এলিয়ে পড়ল।

পীয়ার ব্যগ্রভাবে পাইচারি দিতে দিতে বলতে লাগল, "সামান্য একটুখানি কাজ। ঘাস যখন ভিজে থাকে, তখন কাঁচিগুলোর ওপরে যে ইস্পাতের কাঠিগুলো আছে, তাতে ঘাস লেগে জমা হচ্ছে থাকে, কাজ ঠিক হয় না। কি যে হল আমার, বৃষ্টির সময় মেসিনটা পরখ করে দেখার কথা মনেই হয়নি। কিন্তু মণি আমার, একবার ওটুকু ঠিক করে নিলে, এ মেশিন সারা দুনিয়ায় টেক্কা দেবে বলে রাখচি।"

আবার ওয়ার্কশপে মেশিনটাকে টাঙানো হয়। পীয়ার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে আর ভাবে; সেই একটুখানি কলকব্জা, যাতে সব ঠিক হয়ে যায়, তাই বার করতে গিয়ে পীয়ার মাথা খুঁড়ে। আর সবই শেষ হয়ে গেছে, সবই ঠিক হয়েচে, কিন্তু এখনো একটুখানি উজ্জ্বল কল্পনা বাকী, দৈব প্রেরণায় একটি মুহূর্তের বিকাশ চাই, ব্যস্, তা হলেই এক নিমেষের কাজ ওই ইস্পাত যন্ত্রকে জীবন্ত করে তুলবে, তখন সে পাখা মেলে এই বিশাল জগতের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে যাবে।

সেই উজ্জ্বল কল্পনাটি যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। পীয়ার

মেশিনটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর সেই আসার এত দেরী হচ্চে দেখে হতাশায় মরিয়া হয়ে ঘুসি বাগাতে থাকে।

শুধু শেষ-ছোঁয়াটুকু বাকী, 'র' এর নীচে ফোঁটা দিতে যতটুকু, ততটুকু। লোহার কাঠিগুলোর আকার কিম্বা অবস্থানের একটুখানি পরিবর্ত্তন, কিম্বা ওই কাঁচির দৈর্ঘ্যের,—কি করলে এটা ঠিক হবে? রাতে সে ঘুমোবে কেমন করে?

তার মনে হতে লাগল যে সে এমন একটা দুরূহতার সামনাসামনি দাঁড়িয়েচে যা সে স্বচ্ছন্দে দূর করতে পারত, যদি সে কাজে তাজা মন নিয়ে নামতে পারত; কিন্তু অতি পরিশ্রমের দৌরাত্ম্যে মস্তিষ্ক তার শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু আরবী ঘোড়ার যখন ক্লান্তিতে পতন ঘনিয়ে আসতে থাকে তখন তার লাফিয়ে চলার সময় আসে।

পীয়ার প্রতীক্ষা করতে পারে না। বাতায়নের সামনে কতকগুলো মুখ তার পানে তাকিয়ে থাকে, আর প্রশ্ন করতে থাকে, 'এখনো হল না?' মার্লে, ছেলেপিলে, উথোগ আর তাঁর স্ত্রী, আর সেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। তারপর দুনিয়া-জোড়া তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দল। আজ সে তাদের থেকে একটুখানি এগিয়ে রয়েচে, কিন্তু কাল সে পেছনে পড়ে যেতে পারে। প্রতীক্ষা? বিশ্রাম? নাঃ!

হেমন্ত এসেচে। বিনিদ্র রজনী তাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন করে। ডাক্তার শীতল স্নান, পরিপূর্ণ শান্তি, ঘুমের ওষুধ, লোহা আর আর্সেনিকের ব্যবস্থা করেন। হ্যাঁ তাইত। পীয়ার সমস্ত ওষুধ গিলতে পারে। একটি জিনিস পারে না—ঘুমুতে কিম্বা শান্তিতে থাকতে।

ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গিয়ে অনেক রাত অবধি পীয়ার বসে থাকে, আর যন্ত্রপাতি, অগ্নিকুণ্ডের নিবু নিবু অগ্নিখণ্ডগুলোর পানে তাকিয়ে

থাকে। তার চোখের সামনে দিয়ে যেন সংখ্যাহীন আগুনের ফুলকি উড়তে থাকে, গলিত লোহার তরলপুঞ্জ যেন জীবন্ত প্রাণীর মত দেয়াল আর মেজের ওপর দিয়ে বয়ে চলতে থাকে। আর অগ্নিকুণ্ডের পাশেই ওদিকে যেন একটা কি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেন একটা কুহেলি-মূর্ত্তি স্পষ্টতর হয়ে উঠে আয়তনে বাড়তে থাকে, শেষে এক উলঙ্গ দাড়িওয়ালা 'ডেমিগড' মানবদেবতা এক হাতে আগুন আরেক হাতে বড় হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়ায়।

'এ কি? কে?'

'মানব, তুমি আমায় চেন না?'

'কে তুমি, জিজ্ঞাসা করি?'

'তোমাকে আমার একটা কথা বলবার আছে। বিশ্বজগতের ক্রমাভিব্যক্তি—ইভল্যুশন—ছাড়া আর কোনো কিছুতে বিশ্বাস তোমার পক্ষে বৃথা। প্রার্থনায় কোনো ফল হবে না। স্বপ্নে হয়ত তুমি ইস্পাত আর আগুনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু শেষে এদেরই কাছে আপনাকে তোমায় নিবেদন করে দিতে হবে। এদের সঙ্গে তুমি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। এদের বাইরে তোমার আত্মা কিছুই নয়। ভগবান? আনন্দ? তোমার এই তুমি? তোমার ব্যক্তি জীবনের নিত্যতা? এসব কিছু নয়। বিশ্বের ইচ্ছা তার শাশ্বত পরিণতির পানে প্রবাহিত হয়ে চলেচে, ব্যক্তি এর মাঝে আগুনের কাঠ-খড় মাত্র।'

সত্যি কেউ কাছে রয়েচে ভেবে পীয়ার লাফ দিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু কেউ না, শূন্য হাওয়া মাত্র!

মাঝে মাঝে সে লোরেঙ-এ বাড়ীতে যায়, কিন্তু সেখানকার সবই যেন কি এক কুয়াসায় ঢেকে গেছে। বাড়ীময় ঘুরে ঘুরে মার্লে আনন্দের গান গাইতে থাকে, কিন্তু তার চোখ দুটো যে লাল তা তার চোখে পড়ে।

তার মনে হয় যেন মার্লে তাকে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে বলে, পীয়ার ঘুমুতে যায়। কি আরামের এই ঘুম! কিন্তু মধ্যরাত্রে তার মনে হয় যে কাঁচির আকারটাই দোষের মূল। তখন আর তাকে থামায় কে? উঠে তাড়াতাড়ি করে পীয়ার কারখানায় ছোটে, আবার হিমঋতুর আবির্ভাব হয়েচে, আবার তুষার ঝঞ্ঝার মাঝ দিয়ে সংগ্রাম করতে করতে সে পথ চলতে থাকে। নিস্তব্ধ রাত্রিবেলা সে তার ল্যাম্প জ্বালায়, অগ্নিকুণ্ডে আগুন ধরায়, আবার মেশিন থেকে কাঁচিগুলো খুলে ফেলে। কিন্তু কাঁচিগুলো বদলে ফেলে তাদের যখন সে আবার মেশিনে লাগায় তখনি সে বেশ বুঝতে পারে, দোষ কাঁচির নয়।

মাথা সাফ রাখার পক্ষে কফিটা ভালো। ওয়ার্কশপে নিজেই সে কফি তৈরী করে; বিশেষ করে রাতের বেলা কয়েক পেয়ালায় বেশ উপকার করে। তাতে এমনি তৃপ্তি আসে যে, পীয়ারের আর খেতে ইচ্ছে করে না। আবার যখন তার মনে হয় যে মেশিনের প্রত্যেকটা অংশ আবার নতুন করে গড়াই হচ্চে সব চেয়ে ভাল, তখনও দীর্ঘ রাত্রির পর রাত্রি জেগে থাকতে এই কফি খুবই সাহায্য করে।

পীয়ারের মনে হতে লাগল তার শ্বশুর, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আর মার্লে ও জায়গাটার আশে পাশে রাতদিন ঘুরে বেড়ায় আর কাজটা হয়ে এল কিনা তাই লুকিয়ে লুকিয়ে সন্ধান করে। কেন, তারা কি তাকে একটুখানি—আর এক হপ্তা শান্তিতে থাকতে দিতে পারে না? যাই হোক, আগামী গ্রীষ্মের পূর্বে মেশিনটা পরখ করা চলবে না। মাঝে মাঝে কারখানার লোকেরা চমকে ওঠে; তাদের মালিক পীয়ার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে আর উগ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কেউ এখানে আসতে পারবে না বলচি। আমাকে নিরিবিলি থাকতে দাও বলচি।'

পীয়ার আবার ভেতরে চলে গেলে তারা সবাই পরস্পরের পানে তাকিয়ে মাথা নাড়ে।

একদিন সকাল বেলা মার্লে আসে, বাইরের কারখানার ভেতর দিয়ে গিয়ে স্বামীর ঘরের দরজায় ঘা মারে। কোনো উত্তরই আসে না; দোর খুলে তখন মার্লে ভেতরে ঢোকে।

মুহূর্ত্তকাল একটি নারীর চীৎকার শুনতে পেয়ে মজুরেরা ছুটে গিয়ে দেখতে পায়, মার্লে তার স্বামীর ওপর আনত হয়ে আছে আর পীয়ার মেঝের ওপর বসে একেবারে শূন্য অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে আছে।

ঝাঁকানি দিয়ে মার্লে চেঁচিয়ে ওঠে, "পীয়ার, পীয়ার, শুনতে পাচ্ছ? ভগবানের দোহাই, প্রিয় আমার, একি—"

* * *

এপ্রিল মাস; সেদিন রিঙ্গেবীর ছোট শহরে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জনস্রোত ফিয়র্ডের পথ ধরে লোরেঙের দিকে চলতে থাকে। সবাই বেশ ভালো জামা কাপড় পরে চলেচে—যদিচ এটা বুধবার, রবিবার নয়। সম্পাদকযুগল তাঁদের সনাতন কলহের একটাকে সবে মাত্র মিটিয়ে চলেচেন; আইনজ্ঞযুগলও ছিটেফোঁটা কাজ পাবার জন্ম তেমনি ব্যগ্র, তাঁরাও চলেচেন। ব্যবসায়ী আর শ্রমিক শিল্পীরা চলেচে; আর সকলেই একটা লম্বা ওভার কোট আর মেটে-রঙের ফেল্ট হ্যাট পরেচে। কিন্তু চর্ম্মকারটি উঁচু সিল্ক হ্যাট পরেচে যাতে তাকে একটু লম্বা দেখায়।

পথটা যেখানে বনানী পার হয়েচে সেখানে এসে সবাই মুহূর্ত্তকাল থেমে লোরেঙের দিকে তাকায়। প্রকাণ্ড শুভ্র বাড়ীখানা যেন হ্রদের ওপর দিয়ে চারদিকের দেশটাকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখবে বলে পাহাড়ের

ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গভর্ণরের বাসকাল থেকে সুরু করে কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত যখন ইঞ্জিনীয়র হলুম মহিমাভ্রষ্ট হয় নি—এই প্রকাণ্ড বাড়ীটির বুকে কত উৎসব, কত শোভা, কত বড় বড় ব্যাপারই না হয়েচে; লোকেরা সেই সব বলাবলি করতে থাকে।

কিন্তু আজ সেই বাড়ী নীলামে চড়বে, তার আসবাবপত্র সব শুদ্ধ; দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা কেউ হেঁটে, কেউ গাড়ী করে তাই দেখতে আসচে। কারণ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ মনে করচেন যে পীয়ার হলুম্ যখন হাসপাতালে পীড়িত হয়ে পড়ে রয়েচে, আর কোনো ডাক্তারই যখন বলতে পারচেন না যে সে আবার কখনো কর্ম্মক্ষম হবে কি না, তখন রেয়াতী মেয়াদ দেওয়া উচিত হবে না।

আঙিনাটা শীগগিরই লোকে লোকে ভরে গেল। ভেতরে প্রকাণ্ড হলের মধ্যে একজন কর্ম্মচারী নীলাম ডাকা সুরু করল। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই একটু পিছিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে রইল, ভেতরে ঢুকতে যেন তাদের অনিচ্ছা। একদিন এখানে ফ্রিল দেওয়া জামা পরা 'ক্যাভালিয়ার'রা সোনার 'স্পর' ( spur ) লাগিয়ে লুটিয়ে-পড়া সিল্কের পোষাক-পরা মহিলাদের সম্বর্দ্ধনা করেচে। তার পর এই সেদিনও প্রসিদ্ধ মিশরাগত ইঞ্জিনীয়র তার ঐশ্বর্য্যের দিনে এইখানেই সমস্ত মধ্যবিত্ত লোকদের নিমন্ত্রণ করে কত আনন্দভোজ দিয়েচে; সেই সব ঐশ্বর্য্য আর আতিথেয়তার স্মৃতি দিয়ে যেন সমস্ত বায়ুমণ্ডলটা আজও পরিপূর্ণ রয়েচে।

বেশির ভাগ লোক ঢুকবার জায়গাটায় আর সিঁড়ির 'পরেই দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে তারা দেখতে পেল একটি ঘন কালো-ভুরু পাণ্ডুর নারীমূর্ত্তি কালো পোষাক পরে আঙিনার ওপর দিয়ে জিনিষপত্র সরাবার আদেশ দেবার জন্য চাকরদের মহলে কিম্বা

ভাণ্ডারে আনাগোনা করচে। এটি মার্লে, এখানে আর তার কোনো অধিকার নেই আজ!

● সিঁড়ির ওপর বৃদ্ধ লোরেঞ্জ ডি উথোগের সঙ্গে ক্রুসেথের প্রতাপ-শালিনী মহিলাটির সঙ্গে দেখা। উথোগের পানে তিনি তাকালেন, তাঁর কুঞ্চিত চোখে উপহাসের হাসি। বৃদ্ধ দেহটাকে টান করে তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'তোমার কোনো ভয়ের কারণ নেই। আমি যে-ব্যবস্থা করেচি, তাতে আমি এখনো দেউলে হইনি। তোমার প্রাপ্য তুমি পুরোপুরিই পাবে।'

বিশালস্কন্ধ ঋজুদেহ লোকটি সমস্ত লোকের পানে শান্ত দৃষ্টি মেলে চলাফেরা করতে থাকেন, যাতে তারা বুঝতে পারে যে ভাগ্য বিপর্যায়ে নিষ্পিষ্ট হবার মত লোক তিনি নন।

বেলা বাড়লে পর বাদামী 'বিজু' নীলামে উঠল। গলায় দড়ি বেঁধে তাকে আঙিনার মাঝ দিয়ে নিয়ে আসা হল; আসতে আসতে একটুখানি থেমে মাথাটাকে উঁচু করে বিজু ডেকে উঠল, আর আস্তা-বলের আর সব ঘোড়াগুলো তার উত্তর দিলে। সে কি বিদায় নিলে? তার কি মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগেকার সেদিনের কথা, যেদিন যৌবন আর শক্তির প্রাচুর্য্যে ভরা বিজু প্রথম তার ওই সাদা সাদা পায়ে নাচতে নাচতে এখানে এসেছিল?

কিন্তু কাঠ রাখার ঘরটার পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট বৃদ্ধ তার নিত্যকার নিয়ম মত ব্যস্তভাবে করাতে কাঠ চেরা-ফাড়া করছিল, যেন কোথাও কিছু হয়নি। একজন মালিক যায়, আরেকজন আসে। তার মনে হয় জ্বালানি কাঠ চাই সকলেরই। কেউ এসে যদি তাকে চলেও যেতে বলে, তাতেই বা তার কি। ভগবানের দয়ায় সে একেবারে বদ্ধ কালা! ধুপ্ ধুপ্—কুঠারের শব্দ চলতে থাকে।

পাহাড়ের ওপর দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে একটি যুবা আসে—গোলাপী মুখ, ঘননীল চোখ। আসতে আসতে সে তার ওভার কোটটা খুলে ফেলে, তার নীচে লম্বা কালো ফ্রক কোট আর বড় ওয়েষ্ট কোটটা দেখা যায়। এ হচ্ছে উথোগ জুনিয়র ইংলিশ টুইডের জেনারেল এজেন্ট। ভগ্নীপতির ব্যবসায় যোগ দেয়নি বলে সে আজ তার বাবার এই দুঃসময়ে সাহায্য করতে পারে।

লোরেঙএ নীলাম কিন্তু কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে।

# তৃতীয় খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

পশ্চাতের পর্ব্বতমালা আর নদীটির মাঝখানে পাহাড়ের গায়ের ওপর গভীর একটি উপত্যকা, তার ওপর রৌদ্রালোকিত কতকগুলো খামার বাড়ী।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একটা স্প্রিং-কার্ট আর তার পেছনে একটা মালগাড়ী হাঁকিয়ে বুড়ো রোষ্টা নিজেই ষ্টেশনে এসে উপস্থিত। ষ্টেশনে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, কোনো অতিথির প্রতীক্ষায় নাকি? বুড়ো তার প্রকাণ্ড দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, 'হতে পারে', ব'লে ঘোড়া-গুলোর পানে তাকায় আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। 'যাঁরা ওই কোর্ট-হাউসটা নিয়েচেন, তাঁরা আসচেন নাকি?' বুড়ো বলে, 'খুব সম্ভব তাঁরাই।'

গাড়ী আসে, একটি পাণ্ডুর পুরুষ নীল চশমা চোখে বেরিয়ে আসে, চুল দাড়ি সাদা হয়ে এসেচে; সঙ্গে স্ত্রী আর তিনটি সন্তান। অপরিচিত লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে, 'পল রোষ্টা?' 'হ্যাঁ, আমিই' বুড়ো উত্তর দেয়। উত্তরে যে পাহাড়গুলো আকাশের মাঝে হারিয়ে গেছে, বিদেশী সেদিকে তাকায়, বলে, 'এখানকার হাওয়াটা ভালই হবে?'

রোষ্টা বলে, 'হ্যাঁ, এখানকার হাওয়া সব দিক দিয়েই ভাল' ব'লে গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করতে আরম্ভ করে।

পাহাড়ের ওপর উঠতে থাকে তাদের গাড়ী। স্বামী স্ত্রী গাড়ীর

ভেতরে বসে, স্ত্রীর কোলে একটি শিশু কিন্তু বড় ছেলে মেয়ে দুটি রোষ্টার মাল বোঝাই গাড়ীর ওপর বসে। স্ত্রীলোকটি মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'খামারাটা কি এখান থেকে দেখা যায়?' বুড়ো আঙুল তুলে দেখায়, 'ওই।' তাকিয়ে সূর্য্যালোকিত পর্ব্বতের প্রায় মাথার ওপরই তারা একটা বড় খামার দেখতে পায়। খামারের পাশেই স্লেটের ছাউনি একটা লম্বা নীচু বাড়ী, পূর্ব্বকালে জেলা-অফিসাররা এই রকম জায়গায় থাকতেন। আবার স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করে, 'ওই বাড়ীতেই কি আমাদের থাকতে হবে?' বুড়ো রোষ্টা বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক ওই বাড়ীটাই' ব'লে একটা শব্দ করে ঘোড়া দুটোকে এগুতে বলে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্ত্রীলোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এই তা হলে তাদের নতুন বাড়ী। বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে বহুদূরে তাদের এই ভাবে থাকতে হবে! সমস্ত ডাক্তারদের ওষুধ ব্যর্থ হয়েচে, এখানে কি পীয়ারের স্বাস্থ্য ফিরে আসবে?

গেটের কাছে একটা ল্যাপলণ্ড কুকুর তাদের দেখে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। দুটো শূকর রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে থমকে গিয়ে নবাগতদের পানে গভীর মনোযোগসহকারে তাকিয়ে থাকে, তার পর হঠাৎ লাফাতে লাফাতে বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঢোকে।

কোর্ট হাউসের বাইরেটায় কৃষকের স্ত্রী নিজেই প্রতীক্ষা করছিল; দীর্ঘাকৃতি স্ত্রীলোক, কপালে রেখা পড়েচে, মাথায় কালো টুপি, অমসৃণ, অস্থিসার একখানি হাত বাড়িয়ে বললে, 'আসুন।'

বাড়ীর ছাতটা নীচু, আর ঘরগুলো বড় বড়, ষ্টোভগুলোও বড়, শীতকালে যথেষ্ট কাঠের দরকার। আর তার আসবাবপত্র নানা বিচিত্র রকমের একটা মিশ্রণ। মেহগনির সোফা, গোলাপ-আঁকা আলমারী, পুরানো নর্স-ঢঙের কাজকরা চেয়ার আর দেয়ালের ওপর বিদেশী

রাজ-পরিবারের আর ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের ভয়ানক সব ছবি। ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মার্সে বলে ওঠে, 'হা ভগবান, এই সবের মাঝখানে কি ক'রে থাকব আমরা ?'

কিন্তু তখনি লুইসে নূতন সংবাদ নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসে। 'মা, বাবা, এখানে ছাগল রয়েচে!' ছোট্ট লোরেঞ্জ পেছনে দুলতে দুলতে আসে, দোরের ওপর হুঁচোট খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'মা, ছাগল!'

এই পুরাণো বাড়ীটি শূন্য আর মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে কত বছর হল। আবার যেন ও জেগে উঠল। বাইরে যাওয়া আর ভেতরে আসার পায়ের শব্দ হয়, ছোট ছোট অনুসন্ধিৎসু পায়ের চাপে আবার সিঁড়িটায় মচ মচ শব্দ হতে থাকে, কোণে কোণে গতি জাগে, রান্নাঘরে বাসনপত্রের শব্দ হতে থাকে, আগুন জ্বলে ওঠে, চিমনী দিয়ে ধোঁয়া ওঠে; বাইরে দিয়ে যে-সব লোক যাতায়াত করে তারা এদিকে তাকায় আর দেখে পুরানো মরা বাড়ীটা আবার নবজীবন পেয়েচে।

অসুখের পর পীয়ার খুবই দুর্ব্বল, তবু মোটপত্র খুলতে একটু সাহায্য করে সে। কিন্তু একটু পরেই সে হাঁপিয়ে ওঠে, তার মাথা ঘুরতে থাকে আর মাথার পেছন দিকটায় কোথায় যেন একটা হাতুড়ি মারার শব্দ হতে থাকে অবিরাম। ধরো যদি স্থান পরিবর্ত্তনে তোমার কোনো উপকারই না হয়? তোমার শেষ ধাপে পা পড়েচে। এক বছর এখানে থাকার মত টাকা কোনো রকমে ধার করেচ। তার পর? তোমার স্ত্রী, তোমার সন্তান? চুপ! ওসব এখন আর ভেবো না। ও ভাবনা নয়, আর কিছু ভাবো, শুধু ও ভাবনাটা নয়।

কাপড়গুলো ওপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার শেষ পরিণতি ছিল পরের দয়ায় বেঁচে থাকা। তাও তো বেশি দিন চলবে না। যদি আগামী গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত কিম্বা দুবছরেও তুমি এর চাইতে

ভালো না হও? তখন? তোমার নিজের কথা? হ্যাঁ, তোমার নিজের একটা না একটা পথ হবেই। কিন্তু মার্লে আর ছেলেপুলে? চুপ! ওসব ভাবনা থাক। এক সময় একটা কোন কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাঝে শেষ করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। আর এখন তোমার কর্ত্তব্য হচ্চে আবার সেরে ওঠা, আগামী বছর তোমাকে ঘোড়ার মত সবল হয়ে উঠতে হবে। এই তোমার কর্ত্তব্য। ওই হাতুড়িটার শব্দ, মাথার ভেতর ওই হতভাগা হাতুড়িটার শব্দ যদি একটু থামত!

বার-ভেতর করতে করতে মার্লেও হয়ত একই কথা ভাবে, কিন্তু তার মাথা আরো কত ভাবনায় ভরা, জিনিসপত্র সব গুছোতে হবে, গৃহস্থালীর কর্ম্মচক্রকে আবার সচল করতে হবে। কাছের দোকান থেকে খাদ্য ক্রয় করতে হবে; সকালে কতখানি দুধ নিতে হবে? ডিম কোথায় পাওয়া যাবে? এখনি রোষ্টাডের ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে। কালো রঙের পোষাক-পরা পাংশু বর্ণ নারী মাথা নীচু করে আঙিনার মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়। কিন্তু যখন সে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলতে থাকে, তখন লোকেরা সভ্যতা ভব্যতা ভুলে গিয়ে তার পানে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকে, এমনি অদ্ভুত রকমের তার হাসি।

লুইসে বিছানায় শুয়ে পীয়ারের গলা জড়িয়ে ধরে রাত্তিরের বিদায় নিতে নিতে বলে, 'বাবা, এখানে দেয়ালে ষ্টার্লিঙ পাখীদের থাকার একটা বাক্স আছে, আর কানাচের নীচেও পাখীদের বাসা আছে, বাবা!'

"হ্যাঁ নিশ্চয়, দেখ না কি মজাটাই হয় রোষ্টায়!"

কিছুক্ষণ পরে মার্লে আর পীয়ারও তাদের অদ্ভুত শয্যায় শুয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী গ্রীষ্ম রাত্রির পানে তাকিয়ে রইল।

ভগ্নপোত-যাত্রী তারা কূলে ঠেকেচে বটে, কিন্তু এখনো বোঝা যাচ্চে না পরিত্রাণ তারা পেয়েচে কিনা।

পীয়ার অশান্তভাবে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। তার অস্থি-চর্ম্ম এমনি শুকিয়ে গেছে যে শিরাগুলোর ওপর যেন কোনো আবরণই নেই ; তাই কোনো অবস্থায়ই স্বস্তি পায় না। এদিকে মাথার ভেতর আবার তিনশো চাকার ঘূর্ণন-ধ্বনি চলতে থাকে আর স্ফুলিঙ্গরাশি স্বপ্নে রূপান্তরিত হতে থাকে।

বিশ্রাম ? যখন সব নিরুদ্বেগে চলছিল, তখন কেন বিশ্রামে তৃপ্তি ছিল না ?

ফার্ষ্ট ক্যাটারাক্ট-এ (First Cataract) তার প্রসিদ্ধি লাভ হয়েছিল। নতুন পম্প তৈরী করে তা থেকে অনেক টাকা লাভ করেছিল সে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ অন্তরে প্রশ্নের দংশন চলছিল, কেন ? কোথায় ? তার পর কি হবে ? চীফ ইঞ্জিনীয়র হয়েছিল সে ; রেলওয়ে তৈরী করেছিল, আরো রেলওয়ে তৈরী করবার ভার সে পেতে পারত, কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন, 'কেন ?' 'তাতে কি হবে ?' বাড়ী চল, তা হলে বাড়ী চল, স্বদেশে শিকড় বসানো যাক। কিন্তু তাতেও কি বিশ্রাম লাভ হল ? আবার এ কি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ? ইস্পাত, সেই ইস্পাত আর আগুন।

হায়রে সেই দিন! যে দিন ঘাসকাটা কল থেকে নেমে সেই কলটাকে আরো ভালো করবার কল্পনায় সে শৃঙ্খলিত হল। কেনই বা সে ওই কাজে হাত দিয়েছিল ? তার কি টাকার দরকার ছিল ? না। কাজ কি বন্ধ হয়েছিল ? না। তবু ইস্পাত তার পথ চায়। তার একটা মানুষের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই সে তার টুঁটি চেপে বলেছিল, 'তোমাকেই করতে হবে।'

আনন্দ ? বিশ্রাম ? না, না! সঞ্চিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার স্তূপ একদিন আসুরিক শক্তিতে পরিণত হয়, আর মানুষকে অবিশ্রান্ত

চাবুকের ঘা মেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলতে থাকে। হুঁচোট খেতে পার, পড়ে যেতে পার, কিন্তু তাতে তার কিই বা! ইস্পাত একজনকে নিষ্পিষ্ট ক'রে আরেকজনকে চেপে ধরে। বিশ্ববৈশ্বানরের জ্বালানি কাঠ চাই, হে মানব, নত মস্তকে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়!

আজ তোমার উন্নতির দিন, ঋদ্ধির দিন, কালই তুমি পার্থিব নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। ক্ষতি কিসের? তুমি তো জ্বালানি কাঠ মাত্র!

কিন্তু আমি তা হব না। এই বিশ্বজগতে ওই বৈশ্বানরই যদি একমাত্র দেবতা হয় তা হলেও তার গ্রাস পূর্ণ করব না আমি। আমি আপনাকে বন্ধন মুক্ত করব, আমারই মধ্যে আমি স্বাধীন হব। আমার আত্মাকে আমি অমর করব। এই উন্নতি প্রবাহে সহস্র বৎসর পরে এই জগৎ রূপান্তরিত হয় হোক, তাতে আমার কি!

তোমার আত্মা? তোমার সত্যিকারের সৎভাইটির প্রতি তোমার যে মহৎ মনোভাব একবার শুধু সেই কথাটি ভেবে দেখ, হাঃ হাঃ হাঃ! সেক্সপীয়র ভুল করেছিলেন, বিজাতকেরাই প্রতারিত হয়।

'প্রিয়তম পীয়ার, ভগবানের দোহাই, ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঘুমোব বই কি। কিন্তু বড় গরম' ব'লে পীয়ার গায়ের কাপড় সরিয়ে ফেলে আর গভীর নিশ্বাস নিতে থাকে।

'নিশ্চয় তুমি শুয়ে শুয়ে কেবলি ভাবচ। সুইড ডাক্তার যা বলেচেন, তাই করতে পার না? ভাববার চেষ্টা কর যেন তোমার চারদিকে সব অন্ধকার।'

পীয়ার পাশ ফিরে শোয়, তার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। কিন্তু সেই আঁধারের বুকে তরঙ্গ জাগে, সুরের তরঙ্গ নিকট থেকে নিকটতর হয়ে আসতে থাকে। একটি স্তব সঙ্গীতের ধ্বনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে যেন লুইসে তার! কি শান্তি, হে ঈশ্বর, কি শান্তি, কি বিরাম!

কিন্তু লুইসে ত্বরিতেই মিলিয়ে যায়; নির্ব্বাপিত দীপশিখার মত সে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটা গর্জ্জন কোলাহল নিকট হয়ে আসতে থাকে, সব চূর্ণ বিচূর্ণ নিষ্পিষ্ট দলিত ক'রে। পীয়ার একে খুব ভালো করেই জানে, এ হচ্চে ইস্পাতের সঙ্গীত।

অগণিত মানবকে বন্দী ক'রে নিয়ে, হলদে দুটো চোখ মেলে রেলওয়ে থেকে, জাহাজ থেকে ইস্পাত গর্জ্জন ক'রে ধেয়ে চলেচে।— কোথায়? যে ইস্পাত-দানব বিশ্রাম বিরতিহীন ভাবে মানুষ শিকার করে চলেচে, যে ইস্পাত-দানব জগতের শিরায় শিরায় জ্বরের উত্তাপ জাগিয়ে তাকে মিথ্যা ধাঁধায় মুগ্ধ করে উন্মত্ত করে নিয়ে চলেচে, তারই তাড়নায়, প্রতিযোগিতার তাড়নায় সে দ্রুত, আরো দ্রুত চলেচে।

ষ্টীল-গার্ডার পতনের শব্দ। চাকার ঘূর্ণন গুঞ্জন, ক্রেন আর শিকলের ঝন্‌ঝনা, বাষ্পীয় হাতুড়ির ঘাত-প্রতিঘাত এই সমস্তই গর্জ্জন ধ্বনির মধ্যে রয়েচে। অন্ধকারের কোণে কোণে আগুনের নারকী দৃষ্টি জ্বলে উঠচে আর সেই রক্তদীপ্তিকে ঘিরে মানুষ দলে দলে পুঞ্জীভূত হচ্চে শয়তানদের মত। ওরা ইস্পাতের আর আগুনের দাস, এগিয়ে চলেচে, বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে অবিশ্রান্ত চলেচে!

এই কি প্রমিথিউসের আত্মা? ওই চেয়ে দেখ, ইস্পাতের ইচ্ছা মানুষকে আকাশের পানে উৎক্ষিপ্ত করচে। ইস্পাত আকাশ জয় করচে। কেন? আরো দ্রুতবেগে সে চলবে বলে। ও আরো দ্রুত— আরো, আরো দ্রুত চলতে চায়, কিন্তু কেন? কোথায়? হায়রে, ইস্পাত আপনাকে জানে না!

ধরণীর শিশুরা কি আজ এতই গৃহহারা? তারা কি এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নিতেও ভয় পায়? তারা কি নিজেদের অন্তরের পানে তাকিয়ে সেখানে শূন্যতাকে আবিষ্কার করবে বলে ভীত হয়েচে? তারা কি

হারানো কিছুর সন্ধান করচে আজ—কোন স্তব সঙ্গীতের, কোন সুর-সঙ্গতির, কোনো ভগবানের ?

ভগবান ? তারা শুধু দেখতে পাচ্চে রক্তপিপাসু জিহোবাকে আর ক্রুশবিদ্ধ একজন সন্ন্যাসীকে। আধুনিক মানবের ভগবান কি এই ? এতো ধর্ম্ম-ইতিহাস, ধর্ম্ম নয়।

মার্লে আবার বলে, 'পীয়ার ভগবানের দোহাই, ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'মার্লে, তোমার কি মনে হয়, এখানে আমি সেরে উঠব ?'

'কেন, তোমার কি ইতিমধ্যেই এখনকার হাওয়াকে আশ্চর্য্য বলে মনে হয়নি ? নিশ্চয় সেরে যাবে তুমি।'

পীয়ার মার্লের আঙুল নিজের আঙুলে জড়ায়। শেষে আবার লুইসের স্তব সঙ্গীত ফিরে আসে, তাকে তুলে ধরে ধীরে ধীরে দোলা দিতে থাকে। পীয়ারের চোখ বুজে আসে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোট্ট পথখানি এঁকেবেঁকে বনানীর মাঝ দিয়ে চলেচে; পথে দুটি চাকার রেখা পড়েচে, তার মাঝখানটি দেওদারের পাতায় ঢাকা। গাছ আর আকাশের নিস্তব্ধ শান্তি বিরাজ করচে। এখানে বেড়াতে পরম আনন্দ লাগে। পথটি এমনি উত্থান-পতনের ঢেউ তুলে চলেচে যে, এতে কারু ক্লান্তি আসতে পারে না। বাস্তবিক, পথটি যেন বন্ধুর মত চলেচে আর কানে কানে বলচে, 'কোনো ভাবনা নেই, তাড়াতাড়িরও দরকার নেই; বেশ করে বিশ্রাম করে নাও।'

তন্বীর ক্ষীণ দেহযষ্টির মত দীর্ঘ তরুশ্রেণীর মাঝে দিয়ে পথখানি বক্র গতিতে চলেচে।

পীয়ার এইখানে রোজ বেড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'ফর' গাছের পানে সে তাকায়, আবার চলতে থাকে। নিমেষকাল শ্যাওলা-পড়া পাথরের ওপর বসে, কিন্তু মুহূর্ত্তকালের জন্যই, আবার সে ওঠে, চলতে থাকে, যদিচ গন্তব্য স্থান তার কিছুই নেই। কিন্তু যাই হোক, এখানে শান্তি আছে। 'ফর' গাছের ডাল বেয়ে একটা পোকা চলতে থাকে, পীয়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে; বহু নিম্নে উপত্যকার মাঝ দিয়ে নদী কলধ্বনি করে চলে আর পীয়ার তাই কান পেতে শোনে। রজনের সুন্দরগন্ধে আতপ্ত বায়ু ভরে যায়, পীয়ার তাই নিশ্বাসে নিশ্বাসে গ্রহণ করে।

এই যে তার বর্ত্তমান জীবন, জীবন-যাত্রার এ একটা প্রণালী। বিনিদ্র রাত্রির পর যখন উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাতায়ন স্বচ্ছ হয়ে উঠতে দেখে, তখন পীয়ার ভাবে, আরেকটি নবীন দিবসের আবির্ভাব হল, আমি এর মাঝে কিছুই করতে পারব না।

কিন্তু তবু তাকে উঠতে হয়, পোষাক পরে খেতে নীচে যেতে হয়। যা খায় তার মাঝে একটা বিস্বাদ—পরানুগ্রহ আর পরনির্ভরতার স্মৃতিতে, ক্রুসেথের বিধবা আর ইংলিশ টুইডের এজেন্টের স্মৃতিতে ভোজন বিস্বাদ লাগে। কিন্তু তার ভুললে চলবে না যে, ধীরে ধীরে খেতে হবে, প্রত্যেকটি গ্রাস সতর্কতার সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে, খাবার পর বিশ্রাম করতে হবে, আর সবার চেয়ে জরুরী কথা, কিছুই ভাবতে পাবে না সে, এই বিশাল জগতের কোনো কথাই ভাবতে পাবে না। তার পর সে বাইরে ভেতরে আসা যাওয়া করতে পারে অন্য লোকদের মত, কিন্তু তার এই চলাফেরা কাজকর্ম্মের নিজস্ব কোনো প্রয়োজন নেই, অর্থ নেই; এসব করা শুধু স্বাস্থ্যের জন্য, কিম্বা ভাবনাকে দূরে রাখার জন্য, কিম্বা সময়টাকে অতিবাহিত করবার জন্য।

কি করে এমন হল? কি করে এমন অর্থহীন ব্যাপার ঘটতে পারল? বিধাতাও কেন একে ঠিক করবার কোনো চেষ্টা করল না? পীয়ার ভেবে কিছুতেই এ বুঝতে পারে না। এমন অকস্মাৎ কেন সে ধ্বংস হতে বসেচে? তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন সপ্তাহ মাসগুলো অর্থহীন শূন্যতার মাঝে মিলিয়ে যাচ্চে,—কেন? তার ইচ্ছা যাতে সায় দেয় না, অনিদ্রা আর যাতনাক্লিষ্ট দেহ তাকে সেই সব করতে বাধ্য করচে। মেঝের পরে পায়ের এতটুকু শব্দ হতে না হতেই সে তার স্ত্রীপুত্রের ওপর উগ্র হয়ে ওঠে, তার পর আসে অনুশোচনা, কখনো কখনো ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে সে, কিন্তু তাতে কি কোনো লাভ হয়? আবার তেমনি, তার চেয়েও খারাপ ব্যবহার করে সে। এই তো তার দুর্ব্বহ জীবন! এমনি জীবন তাকে বয়ে চলতে হবে!

কিন্তু ওপরকার এই ছোট্ট বনপথটিতে সে কারু অনিষ্ট করে না। কোনো উৎকট কোলাহল এখানে তার শিরদাঁড়ার ভেতর ছুরির মত বেঁধে না। পরম শান্তি এখানে, এই শান্তি কল্যাণময়। ওই নীচে শ্যামল ঢালুটার ওপর একখানি ধূসর ভগ্নজীর্ণ কুটীর; ওর পানে চেয়ে মনে হয় যেন একটা বুড়ো শীর্ণ ঘোড়া ঘাস খেতে খেতে মাথা তুলে তোমার পানে তাকিয়ে আছে; মনে হয় ওকে নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত; কালই মাটিতে মিশিয়ে যাবে আর উঠবে না, তবুও ও কেমন শান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে নিজের নিয়তিকে স্বীকার করে নিয়েচে!

আঃ, রোস্টাড থেকে যে অনেক দূরে চলে এসেচে সে! ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে ওঠে, চড়াই বেয়ে ফিরে যাবার শক্তি হয়ত পাবে না সে। নাঃ, ভয় কি! একটু বিশ্রাম চাই। ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পীয়ার আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে।

তুষার থেকে তাজা স্বচ্ছ বায়ুর স্রোত সারাদিনই উপত্যকার ওপর

দিয়ে বয়ে যেতে থাকে ; মনে হয় যেন ওই আকাশের নীচে য়োতুনহাইম পাহাড়টাই শুয়ে শুয়ে স্বচ্ছন্দ আরামে বায়ুপান করচে। গভীর নিশ্বাস টেনে পীয়ার শ্বাসযন্ত্রটাকে পূর্ণ ক'রে বায়ু পান করে, ওই যেন ওকে রক্ষা করবে। বলে, ওগো হাওয়া, ওগো নির্জ্জনতা, ও আলো, আমার সহায় হও, যাতে আবার আমি সুস্থ, কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি ; জগতে ধরে থাকবার ওই আমার একমাত্র ধর্ম্ম অবশিষ্ট রয়েচে।

ওই শৈলশ্রেণী দুটোর উপর উর্দ্ধে সীমাহীন নীলিমার এক বিরাট প্লাবন, বুকে শাশ্বত বিশ্রাম নিয়ে স্থির অবিচল দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, সেখানেও কি একটি ইচ্ছাশক্তি আছে যার সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের যোগ আছে ? তুমি তাতে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তবু তো একটি ছোট্ট প্রার্থনা তার দিকে উধাও হয়ে যায় ! ওগো, তুমিও আমায় সহায়তা দাও। কে ? সেই তুমি যে আমার কথা শুনতে পাচ্চ। পৃথিবীর বুকে মানুষ বলে যে সব হতভাগ্য জীব বিচরণ করে, যদি তাদের প্রতি তোমার কণামাত্র দৃষ্টিও থাকে তাহলে আমার সহায় হও। শাশ্বত সত্যের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করার জন্য যদি কখনো একটা মস্ত কিছু করার কামনা করে থাকি, সে আমার ভুল হয়েছিল, আমি আমার মিথ্যা গর্ব্বের কথা স্বীকার করে তার জন্য অনুতাপ করচি। আমায় ক্রীতদাস করে খাদ্য সংগ্রহের জন্য দাসত্বে নিযুক্ত কর, তবু মা'কে আর সন্তানদের থেকে আমায় বঞ্চিত করো না। ওগো, শুনচ কি তুমি ?

অন্ধ-নিয়তি-নিপীড়িত মানবের পানে চেয়ে স্বর্গে কি কেউ আনন্দ পাও ? আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এরা কি একটা অর্থহীন দৈবের দাস মাত্র —আর তুমি কি তবু হাসতে পার ? ওগো যদি বধির না হও, তো উত্তর দাও, ওগো বহুনামের নামী, উত্তর দাও !

তারই কাছে ঘাসের মাঝে মাঝে একটা ফড়িঙ একটা তীব্র ধ্বনি

করতে থাকে, পীয়ার চমকে উঠে বসে। নীচে দিয়ে একটা রেলগাড়ী চীৎকার করতে করতে চলে যায়।

এমনি করে দিনের পর দিন যায়।

রোজ সকালবেলা মার্লে লুকিয়ে লুকিয়ে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে দেখে রাত্তিরে তার ঘুম হয়েচে কি না। চোখের দিকে চেয়ে দেখে, ঘোলাটে, না ফোলা, না শান্ত। নিশ্চয় পীয়ার শীগ্‌গীরই সেরে উঠবে। নিশ্চয় এখানকার পরিবর্ত্তনে তার উপকার হবে। মার্লেও ওষুধে বিশ্বাস হারিয়েচে; কিন্তু এই হাওয়া, এই গ্রাম্য জীবন, এই নির্জ্জনতা, বিশ্রাম,—নিশ্চয়ই এরা যে সাহায্য করচে তার লক্ষণ অবিলম্বেই দেখা দেবে।

কত রাত মার্লে একটুও চোখ বুজতে পারে না, তবু সন্তানগুলোকে দেখতে হয়, বাড়ীর কাজকর্ম্ম করতে হয়, এমন কি যতদূর সম্ভব চাকরাণী না রেখেই কাজ চালাবার সঙ্কল্পও সে করে।

মার্লে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, 'আজকাল তুমি যে খামারে অত বেশি যাতায়াত করচ, ব্যাপার কি! বুড়ো রোষ্টার ওখানে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাক।'

পীয়ার উত্তর দিলে, 'আমি—আমি ওখানে আমোদ পাই, সময়টা কাটে।'

'কি, পলিটিকস চর্চ্চা কর না কি?'

'না, তাস খেলি। আমার পানে অমন করে তাকাচ্চ যে মার্লে?'

'আগে তো তুমি কখনো তাস খেলতে না।'

'না, কিন্তু আমি কি করি বল তো! এই পোড়া চোখের জন্য আর ওই মাথার ভেতরকার হাতুড়ি-পেটানোটার জন্য পড়াশোনা করতে পারি নে।...এই দিককার যতগুলো খামার আছে, সবগুলো গুণে

শেষ করে ফেলেচি, সবশুদ্ধ পঞ্চাশটা আছে। আর এখানকার খামারে ছোটবড় ঠিক একুশটা বাড়ী আছে। এখন এর পর কি করব বল?"

মার্লে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, "হ্যাঁ, বড় কঠিন তোমার পক্ষে। তাস খেলার জন্য সন্ধ্যে অবধি বসে থাকা তো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়; ছেলেরা সব ঘুমূলে আমি তোমার সঙ্গে খেলতে পারতাম, সে হলে বেশ হতো!"

"ধন্যবাদ, মার্লে। কিন্তু সারাদিন কি করে কাটাই? সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মনের মধ্যে নিমেষে নিমেষে এইটে অনুভব করা যে প্রত্যেকটা মুহূর্ত্ত একেবারে মিছিমিছি নষ্ট হয়ে যাচ্চে, এ যে কি তা কি বুঝতে পার মার্লে? না, না, তুমি বুঝতে পারবে না তা। এই যে ভয়ানক অন্তহীন দিনগুলো, এর মাঝে আমাকে নিয়ে আমি কি করি? মদ-মাতাল হয়ে থাকব?"

"আচ্ছা, জ্বালানি কাঠ কিছু কাটবার চেষ্টা করতে পার কি?"

"জ্বালানি কাঠ?" পীয়ার মৃদু মৃদু শীস্ দেয়, বলে, "এ একটা আইডিয়া বটে! হ্যাঁ, কাঠ কেটেই দেখা যাক।"

ঠুক্ ঠাক্ ঠুক্ ঠাক্।

কিন্তু দম নেবার জন্যে যখন সে পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় রোষ্টার ফসলকাটা কলের শব্দটা পাহাড়ের ঢালু থেকে পীয়ারের কানে এসে লাগে; যেন কি যাতনায় পীয়ার দাঁতে দাঁত ঘসে। সে তার নিজের উদ্ভাবিত ফসল-কাটা কল চালাচ্ছিল; অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছিল আর কলে কেবলি ঘাস আটকে যাচ্ছিল; কেমন করে কলটাকে ঠিক করবে সে? মাথার ভেতর ক্ষতের ওপর কে যেন ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে আর যাতনায় পীয়ার লাফাতে থাকে। ঠুক্ ঠাক্ ঠুক্ ঠাক্! কোনো রকমে কলের ওই শব্দটাকে ডুবিয়ে দেওয়া চাই।

হাতে কুড়ুল চালালে কি হবে, সারাক্ষণ মাথার ভেতর নানান রকমের কত উদ্ভট খেয়াল কেবলি টগবগ করতে থাকে। কল্পনাকে সংযত করবার, সম্বরণ করবার শক্তি ফুরিয়ে যেতে পারে। তখন চতুর্দ্দিক থেকে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এগিয়ে আসতে থাকে, শিকারী পাখীদের মত ওপর থেকে তারা ছোঁ মারতে থাকে; পূর্ব্বে তারা যে বার বার বিতাড়িত হয়েছিল, যেন তারি প্রতিশোধ নেবার জন্ম তারা চীৎকার করে জানায়, এই আমরা এসেচি। আবার যেন সে সেই মেক্যানিক্যাল ওয়ার্কস-এ শিক্ষানবীশ হয়ে সেই প্রকাণ্ড বয়লারে Compressed air Tube দিয়ে প্লেট বসাচ্চে আর বয়লারের ক্লিঙ-ক্ল্যাঙ্ শব্দ যেন সারা শহরে সকরুণ আর্ত্তনাদের মত ছড়িয়ে পড়চে। সেই বয়লারটা এখন যেন পীয়ারের মাথার ভেতর চলা সুরু করেচে—ক্লিঙ ক্ল্যাঙ। আঃ, সারা শরীরে ঠাণ্ডা ঘাম ঝরতে থাকে, পীয়ার কুড়ুলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পীয়ারকে যেতে হবে, এখান থেকে পালাতে হবে, কোথায় তা সে জানে না। যে মুখগুলোকে পীয়ার ঘৃণা করে, সেইগুলো এ কোণ থেকে উঁকি মারে আর বলে, 'কি হে, বলেছিলাম না, আজ ভিখিরী, কাল পাগলা গারদের পাগল!'

কিন্তু এমনও হতে পারে, রাত্তির বেলা সহায়তা আসে। যা মনে করা ভালো, এমন সব স্মৃতিও আসে। ওই যে সে-বার…আবার সেই যে…ওই যে একটি নারী আর ওই যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেইখানে! লুভ্র্-এ ভেরোনীজের একটি চিত্র আছে, ভেনিসের একটি তরুণী প্রাসাদের মর্ম্মর-সোপান দিয়ে একটি সোনালী-চুল ছেলের হাত ধরে নামচে; পরণে তার কালো মখমল, যৌবনের আর আনন্দের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি। উদ্যানে কি সে তার প্রণয়ীর কাছে চলেচে? প্রথম চুম্বন! চন্দ্রালোকে ম্যাণ্ডোলীনের সুর-ঝঙ্কার!

ক্লান্ত দেহের শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। উজ্জ্বল স্মৃতিগুলো দেবদূতের মত দলে দলে আসতে থাকে, পীয়ার তাদের পাখার ধ্বনি যেন শুনতে পায়; পীয়ার তাদের ডাকে সাহায্য করতে, তারা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। তার আত্মাকে রক্ষা করবার জন্য তারা অন্ধকারের অনুচরদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে থাকে। পীয়ারের জীবনে প্রচুর আলোক ছিল, সৌন্দর্য্য ছিল, নিশ্চয় দেবদূতদের শক্তিই বেশি, তাদেরই জয় হবে। আহা, কেন সে নারী আর ফুল আর শরাবের আনন্দে রাজার মত জীবন যাপন করে নি?

ঘুম থেকে উঠতে উঠতে একদিন পীয়ার বলে, "মার্লে, আমাকে এমন কিছু কাজ বার করতে হবে, যা করতে করতে আমি একেবারে খুব ক্লান্ত হয়ে এসে ঘুমুতে পারব।"

মার্লে বলে, "হ্যাঁ মণি, তাই চেষ্টা করো।"

পীয়ার বলে, "ঠেলাগাড়ীতে করে পাথর বওয়া সুরু করা যাক, দিন ভর তাই করেও যদি ঘুম না আসে তো কি বলেছি।"

সেই দিন থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ের ওপরকার একটা নতুন জমি থেকে নীচের পথের পাশের বাঁধটায় পীয়ার পাথর নিয়ে যেতে লাগল।

শান্ত সোনালী হেমন্তের দিনগুলো। শৈলশ্রেণীর চূড়ার দিকে একটির পর আরেকটি খামার, সর্ব্বত্রই পাকা শস্যের হলদে ক্ষেত। একেবারে শৈলশীর্ষে আকাশের বুকে একটি ছোট্ট কুটীর, তারও একটুকরো হলদে শস্যের ক্ষেত রয়েচে। গভীর উপত্যকার ওপর দিয়ে এক পাহাড়ের চূড়া থেকে আরেক চূড়ার দিকে ধীর গতিতে একটি ঈগল ভেসে চলেচে।

যে সব লোকেরা ওদিক দিয়ে যায়, তারা পীয়ারকে সার্ট গায় খালি

মাথায় পাথর ঠেলতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আর মাথা নেড়ে বলাবলি করে, 'হুঁ, ভদ্রলোকদের মাথায় কত আজগুবি খেয়ালই ঢোকে!'

পীয়ারের মাথার ভেতর কে যেন শুষ্ক তীব্র কণ্ঠে বলতে থাকে, ব্যস্, ওই করতে থাক। এ হচ্চে বেয়াকুবের কাজ, কিন্তু তোমার ভাগ্যে ওই নির্দ্দিষ্ট হয়েচে। ওই চর্ম্মসার পা নিয়ে কসে ঠেলো। তোমার আগে কত ঘোড়াকে ওই কাজ করতে হয়েচে। রাত্তিরে তোমার ঘুম চাই যে! আর দশটি মাস শুধু বাকি আছে; তারপর আবার পথের মোড়ে শয়তান প্রভুর আবির্ভাব হবে। বেচারী মার্লে, তার চুল পাকা স্বরু হয়েচে! বেচারী শিশুরা, স্বপ্ন দেখচে হয়ত যে তাদের বাপ খুব মারচে, তাই বোধহয় ওরা প্রায়ই ঘুমের মাঝে কেঁদে ওঠে। যাক, চলো চলো, গাড়ী ঠেলে চলো। হ্যাঁ, ও বোঝাটা তো হল, আবার আরেক বোঝা আনবে চলো।

তুমিই না একদিন রুটির জন্য এই যে পশুশ্রম একে অবজ্ঞা করেছিলে আর আজ তোমাকে তার চেয়েও নীচে নেমে, তার চেয়েও হেয় কাজ করতে হচ্চে। আজ তুমি নিতান্ত বেয়াকুবের মত নিরর্থক বোঝা টান। আজ তুমি একজন কয়েদী, দুর্ভাগ্য তোমাকে দিয়ে আজ কাজ করাচ্চে, যেই তুমি নড় তোমার শৃঙ্খল ঝনঝনিয়ে ওঠে। এই তোমার দিনযাপন!

পীয়ার সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কপালের ঘাম মোছে, আবার ঠেলা-গাড়ীতে পাথর বোঝাই করতে থাকে।

এই যে শিকল-বাঁধা জীবন, আর কতকাল এ চলবে? তোমার কি জবের (Job) কাহিনী মনে আছে; নিশ্চয়ই সেই সুখী মানুষটির পেছনে শয়তানকে লেলিয়ে দেবার ওই উন্মাদ খেয়াল কোনো ভোজোৎসবের

সময় জিহোবার মাথায় এসেছিল। জবের সাতটি ছেলে মেয়ে, গরু ভেড়া বাছুর। এসবই নাকি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ওই তামাসা করবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে কিছু দেওয়া হয়েছিল বলে বাইবেলে লেখে না। তার ফোঁড়া, তার যাতনা, তার দুর্দ্দশা এই সমস্ত নিয়ে সে রাজসভার বিদূষক সেজেছিল, স্বর্গের দেবতারা বিনি পয়সায় একটু আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। পশুপাল আর সন্তান-সন্ততির মোটা মূলধনটা, সেটা জবকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ব্যস্! হাঃ হা!

প্রমিথিউস! দেবলোকে তুমিও কি শুধু মানব-বন্ধু? বাস্তবিক কোনোদিন আমাদের কি তুমি মুক্ত করতে পারবে? সেই বিরাট বিদ্রোহ জাগাতে কবে তুমি আসবে?

হয়েচে, হয়েচে, ঠেলা গাড়ীটা নিয়ে চল আবার, দেখচ না, ওটা যে বোঝাই হয়ে গেছে!

কানের কাছে সোনালী বেণী দোলাতে দোলাতে ছোট্ট লুইসে দৌড়ে পাহাড় বেয়ে নেমে আসে, বলে, "বাবা, ডিনারের সময় হল, বাড়ী চলো।"

"ধন্যবাদ, ওরে দুষ্টু, আজ কি ডিনারে কিছু ভালো খাবার আছে?"

"আ—হা! সে বলচি না," রহস্যের ভঙ্গীতে মেয়েটা বলে। তারপর বাবাকে খুসী দেখে কাছে যাওয়া যাবে ভেবে মেয়ের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলে, "বাবা আমায় ধরো দিকিন্, আমি তোমার চাইতে বেশী দৌড়াতে পারি।"

"খুকী, আমি এখন বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েচি মনে হচ্চে।"

"বাবা গো, তুমি বড্ড ঠকে গেছ?" বলতে বলতে মেয়েটি এসে বাবার হাত ধরে। তখন সে পীয়ারের বাহুটাকে নিজের বাহুতে জড়িয়ে

ধরে। বয়স্কা তরুণীর মত বাপের বাহু ধরে পাহাড় বেয়ে উঠতে তার ভারি মজা লাগে।

তারপর তুষারপাতের ঋতুর আবির্ভাব হলো। একদিন সকালবেলা পাহাড়ের চূড়াগুলো সব সাদা সাদা মেঘের মত হয়ে গেল আর সেখান থেকে বরফের রাশি নেমে আসতে লাগল নীচের দিকে। মলিন আলোয় বিষণ্ণমুখে মার্লে বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে, নিম্নে পাহাড়-ঘেরা উপত্যকা-টিকে আগের চাইতে আরো সঙ্কীর্ণ মনে হয়, শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতের মনেরও যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

দূর হোক গে! তার চাইতে রান্নাঘরে যাওয়া যাক্, আবার কাজে লাগা যাক—কাজ, কাজ, কাজ করো আর ভোলার চেষ্টা করো।

তারপর একদিন মার্লে পত্র পেলে, তার মা মারা গেছেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয় ক্লাউস ব্রক,

হে পৌরাণিক বীর, একদিন তো খিদিবীয় উচ্চতা থেকে পতন হয়েছিল। আবার কিচ্‌নারের সঙ্গে উর্দ্ধে প্রয়াণ করেচ! আচ্ছা, বলি, সুদানে গিয়ে জুটেচ কেন বলতো? ওমড়রমানে গিয়ে জীবনকে বিপন্ন করেচ কেন কিসের জন্য? আবার বোধ হয় সেই পুরাণো মরিয়াপনা যার কথা তুমি সব সময়ই বলে থাক? আচ্ছা, শপেনহাউয়েরের আত্মঘাতী চিন্তা নিয়ে বিনিদ্র রাত্রি কাটাবার জন্য একেবারে মরুপ্রান্তে গিয়ে কেন পড়েচ বলতো? তুমি বল যে; একেবারে আদর্শহীন ভাবেই তুমি জীবনটা কাটিয়েচ; যৌবনটাকে তুমি নষ্ট করেচ; তোমার ঘর নেই, নৈতিক আদর্শ নেই, স্বদেশ নেই, ধর্ম্ম নেই। আচ্ছা, অবস্থাটাকে আরো খারাপ করে কোন্ ভালো হবে?

ভাল কথা, তা বলে আমার এই গ্রাম্য জীবন দেখে হিংসা করবারও কিছু নেই, আর মোজেস ( Moses ), প্রার্থনা সঙ্গীত, ভগবান এই সব মেশানো ছোট্ট বেলাকার সেই ছোট্ট গির্জ্জার জন্য যে তোমার আকুতি, সেও অর্থহীন। হ্যাঁ, হয়ত অন্তরের ওই তৃষ্ণায় কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তাকে পাবার চেষ্টা ক'র না কখনো। ভায়া হে, আসল কথা হচ্চে ভগবান-টগবান আর পাওয়া যাবে না কোথাও।

আমার মনে হচ্চে, ছোট বেলায় আমারি মত তোমার ওপরও ধর্ম্মের প্রভাব ছিল। আমরা দুজনই দুর্দ্দান্ত পাজি ছিলাম। গির্জ্জায় যেতে আমাদের কিন্তু ভালো লাগত, সেই ভালো-লাগা ধর্ম্ম বক্তৃতার জন্য নয়, ভালো লাগত যখন প্রার্থনা সঙ্গীত উঠত তখন মাথা নত ক'রে তাতে যোগ দিতে। যখন অর্গ্যানের সুর-তরঙ্গ গির্জ্জার ভেতর দিয়ে বয়ে যেত তখন মনে হ'ত—অন্তত আমার মনে হ'ত—যেন আমার অন্তরাত্মার মাঝে কি বিপুল হ'য়ে উঠচে, সে যেন আমায় নিয়ে চলেচে কোন রাজ্যে, যেখানে সবই ঠিক মনের মতো। যখন আমরা দুনিয়ায় বেরিয়ে গেলাম, তখনও কানে সেই সুরের রেশ কতকটা লেগেই রইল। জিহোবাকে অভিশাপ দিয়েচি হয়ত। কিন্তু তবু মনের এক কোণে সেই প্রার্থনা সঙ্গীত জেগে রইল অন্তর-তৃষার মতো, বিশ্বসমন্বয়ের ক্ষুধিত কামনার মতো। ব্যস্তদিনের সারাক্ষণ হয়ত ইস্পাতের গর্জ্জমান সঙ্গীতে যোগ দিতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা নিঃসঙ্গ সোফায় আরেক শক্তি এসে আমাদের মনকে অধিকার করে। সে হচ্চে অন্তরের ক্ষুধা, তখন, যার গতিবিধি সকল সন্ধানের বাইরে, সেই শাশ্বতের তরঙ্গ দোলায় দোল খেতে অন্তর ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু আমাদের স্বদেশের কোথাও যে তুমি তোমার ছোট্ট বেলাকার সেই গির্জ্জাটিকে খুঁজে পাবে এমন বিশ্বাস ক'র না ; অমাদের এখানে

সর্ব্বত্র এখন বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন, শ্রমিক সঙ্ঘ, রাজনৈতিক সভা দেখতে পাবে, কিন্তু গির্জ্জাঘর শূন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমি সেখানে গিয়েচি। অর্গ্যানটা যেন দাঁতের বেদনায় আর্ত্তনাদ করে, ভজন-গাইয়ে গান গায় না, যেন হাঁচে, আর গির্জ্জা-গামীদের সঙ্গীত গির্জ্জার ছাতটাকে আকাশে তুলে ধরতে পারে না, তার কারণ, আজকাল গির্জ্জায় কেউ আর আসেনা। কৃষ্ণ-গুম্ফ পাদ্রী বেচারা প্যাঁস-নে চড়িয়ে বক্তৃতা মঞ্চে এসে দাঁড়ায়; রিজার্ভ সৈন্যের একজন কর্ম্মচারী সে, হাতে লেখা খাতা থেকে সে তার উচ্চ যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো পড়তে থাকে। কিন্তু তার চেহারা কেবলি বলতে থাকে, 'ওহে কপর্দ্দকহীন শ্রোতৃযুগল, আমি যা বলচি তাতে তোমাদের বিশ্বাস নেই, যাক্ আমিও বিশ্বাস করিনে!' মানুষ যখন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ মতবাদ বা ধারণাকে কাটিয়ে ওঠে তখনকার অবস্থা বড় ভয়ানক। আমরা, আমরা নিশ্চয়ই জিহোবার চেয়ে ভাল। ভগবানের রক্ত-পিপাসুতা আর আদিম পাপের ওপর যে প্রায়শ্চিত্তবাদের (atonement) ভিত্তি, আমাদের চিত্ত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে; আমরা ওই মতবাদটাকে ঘৃণা করি, কিম্বা হেসে উড়িয়ে দিই। আমরা আজও দেবতা হ'তে পারিনি সত্য, কিন্তু ওই ভগবানকে পূজা করবার মত হীনতাও আমাদের চত্তে নেই।

অবিশ্যি, ওই পাদ্রীকে ক্ষমা করা যেতে পারে। তাঁকে কোন না কোন ভগবান প্রচার ক'রতে হবে। যখন আর কোন ভগবান নেই তখন অগত্যা।

মোটের ওপর এতে আর বিস্ময়ের কিছুই নেই যে অজ্ঞ কৃষকেরা পর্য্যন্ত আজ সন্দেহে মাথা নেড়ে গির্জ্জার পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়। রবিবারে তারা কি করে? ভাই, তাদের আজকাল রবিবার ব'লে

কিছু নেই। লম্বা টেবিলের সামনে ব'সে ব'সে তারা এখন মাথা নাড়ে শুধু, কোন রকমে দিন কাটাবে ব'লে। ওদের দেখলে হালের ঘোড়াগুলোর কথা মনে পড়ে, ওদের পেট ভরে গেলে, কাজ না থাকলে যেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে, তেমনি!

স্বীকার করি, বিজ্ঞানের এবং ইস্পাতের আশ্চর্য্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশের বিশাল জয়যাত্রা চলেচে, পৃথিবীর চেহারা বদলে যাচ্ছে, মানুষের প্রাণ-স্পন্দন দ্রুততর হ'য়ে চলেচে। কিন্তু বল দেখি, ওই কৃষক যদি বা আকাশপথে উড়ে যেতেও পারে, তাতে কি কল্যাণ হবে তার, যদি পৃথিবীর বুকে না থাকে কোন মন্দির, না থাকে পর্ব্ব উৎসবের কোন চিহ্ন? তার অন্তরাত্মার ওপর যদি স্বর্গ-আকাশই না রইল, মেঘলোকে উধাও হ'য়ে যাবে সে কোন্ প্রয়োজনে?

এইতো আজ আমাদের সকলের মনের জলন্ত সমস্যা—মরুভূমিবাসী তোমার মনের এই প্রশ্ন, মরুবাসী আমারও এই প্রশ্ন। আমার মনে হচ্চে, আজ আমরা তাঁকে চাই যিনি আমাদের নবধর্ম্ম দান ক'রবেন, শুধু নতুন নবীকে চাই নে, চাই নতুন ভগবান।

আমার স্বাস্থ্যের কথা জানতে চেয়েচ, কিন্তু আমার মনে হয়, এখন কোন কিছুই বলা চলে না। তবু এইটুকু আমি ব'লব, যদি কখনো দুঃখ যন্ত্রণা আসে, তাকে পরের ওপর না চাপিয়ে, নিজের ওপরই নিও। আমাদের সকলের নমস্কার।

তোমার
উপত্যকাবাসী পীয়ার

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বড়দিন আসন্ন হ'য়ে এলো, সারাদিন যেন ধূসর গোধূলি লেগেই আছে, তুষারপাত দেয়ালের তক্তাগুলোকে চৌচির ক'রচে। ছেলেপিলেগুলো ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে। মার্লে মেঝে পরিষ্কার ক'রলে কি হবে, ষ্টোভে প্রকাণ্ড আগুন জ্বেলেও মেঝে যেন স্কেটিঙের বরফ-ঢাকা জমির মত। কুয়া থেকে জল আনতে পীয়ার তুষারস্তূপের মাঝ দিয়ে পথ ক'রে চলে, তার মুখের আশেপাশে দাড়ি ঝুলচে তুষার-মালার মত।

হ্যাঁ, শীতের মত শীত বটে।

ডেয়ারীতে বুড়ো রোষ্টারের দু'মেয়ে পনীর তৈরী করছিল। চোক মিটমিট ক'রে পীয়ার এসে দাঁড়াল।

পীয়ার বলে, "বাঃ, তোমরা তো বেশ তামাক খেতে শিখেচ!"

"কই এখন খাচ্চি নাকি?" ব'লে লোহিতকেশা আর সুকেশা মেয়ে দু'টি পরস্পরের পানে চেয়ে মাথা নেড়ে হাসতে থাকে। তাদের এই অদ্ভুত সহুরে ভাড়াটেটি যখনি তাদের কাছে আসে, হাসিঠাট্টা না ক'রে পারে না।

পীয়ার বলে ওঠে, "ভাল কথা, এলসী! কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম যেন তোমাতে আমাতে বিয়ে হচ্চে!"

মেয়ে দু'টি হর্ষভরে চেঁচাতে থাকে।

"আর, মারি, তোমার সঙ্গে যেন বেলিফের ( Bailiff ) বিয়ে হ'ল।"

"কি ভয়ানক, সেই মোয়েনের বুড়োটার সঙ্গে!"

"স্বপ্নে কিন্তু আরো বুড়ো দেখলাম, নব্বই বছর হবে!"

লোহিতকেশা মেয়েটি বাষ্পায়মান প্রকাণ্ড কড়ায়ে নাড়া দিতে দিতে বলে, "কি যে সব সময়ই কেবল মাথা নেই মুণ্ডু নেই সব কথা!"

পীয়ার আবার বেরিয়ে গেল। মেয়ে দুটি বিশের কোঠায়ও বোধ করি পড়েনি, এরি মধ্যে মুখের ভাবটা কঠিন গাম্ভীর্য্যে ভরা, যখনি পীয়ার তাদের হঠাৎ হাসিয়ে দেয়, তার পর মুহূর্ত্তেই যেন তারা নিতান্তই একটা অনাবশ্যক ব্যাপারে মন দিয়ে ফেলেচে ভেবে কেমন যেন শঙ্কায় জড়সড় হ'য়ে যায়। বরফ ফাটার পটাপট শব্দ হ'তে থাকে, পীয়ার কানের ওপর টুপিটা ভালো ক'রে টেনে দিয়ে চলতে থাকে। য়োতুনহাইম ওই উত্তর দিকে শুয়ে শুয়ে দুনিয়ার ওপর যেন হিমশ্বাস ছাড়তে থাকে।

আর পীয়ার? ক্রমাগত বোঝার ভারে কুব্জ হ'তে হ'তেই কি তাকে চলতে হবে? একে ছাড়িয়ে কেন সে উঠতে পারে না? দুর্ভাগ্যকে সাহস ভরে পদাঘাত ক'রে কেন সে দূর ক'রতে পারে না?

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে মার্লে বললে, "পীয়ার, বড়দিনে খোকাখুকীদের কি উপহার দেবে?"

"কেন, প্রত্যেকের জন্য থাকবার একটি প্রাসাদ, আর চড়বার একটি ক'রে ঘোড়া। টাকা রাখবার যখন আর ঠাঁই নেই, তখন চুলোয় যাক হিসেব। আর, তোমার কি চাই গো? দু'হাজার ক্রাউনের 'ফর' (fur) যদি দিই তাতে তোমার আপত্তি হবে না তো?"

"না, ঠাট্টা নয়। ওদের না আছে 'স্কী' (ski বরফে চলার জুতো) না আছে 'স্লে' (sleigh বরফে চলা গাড়ী)।"

"বেশতো, তোমার কাছে কেনবার মতো টাকা আছে? আমার তো নেই।"

"তুমি নিজে তৈরী ক'রে দিলে হয় না?"

"আমি?"

পীয়ার শীস্ দিতে দিতে কথাটা ভাবতে থাকে। "হ্যা, হবে না কেন? আর শ্লে? সেও হ'তে পারে। কিন্তু ছোট্ট আস্টার জন্য? ওসবে তো ওর চলবে না, ওযে বড্ড ছোট্ট।"

"আস্টার পুতুলের খাট নেই।"

পীয়ার আবার শীস দেয়, বলে, "কথাটা মন্দ নয়, আইডিয়াটা বেশ। এখনো আমার হাত এমন অকর্মণ্য হয়নি যে—"

শীগগিরই কঠোর শ্রম সুরু হ'য়ে গেল। বাইরের দাওয়ায় এক ছুতোরের বেঞ্চি আর তার যন্ত্রপাতি ছিল, পীয়ার সেইখানে কাজ করতে লাগল। অল্পেই ক্লান্তি আসে; পা ছুটো তাকে কেবলি ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে চায়। তবু সে জোর ক'রে কাজ করতে থাকে। আমি সুস্থ হব, হব, হব—কেবলি এই ইচ্ছার জোরে কি মানুষ ভাল হ'তে পারে না? পীয়ারের মাথার ভেতর যেসব চিন্তার দংশন চলছিল, অন্যের চিন্তা এসে তাদের পরাজিত ক'রতে লাগল। সন্তানদের জন্য উপহার, পিতার নিজের হাতে তৈরী উপহার—ভাবতে গিয়ে পীয়ারের মনের ভেতরটা যেন আলোকিত হ'য়ে উঠল। পীয়ারের মনে নতুন উদ্যম জাগতে লাগল।

শ্লের জন্য যখন লোহার পাতের দরকার হ'ল, পীয়ারকে লোহারের দোকানে যেতে হ'ল; সেইখানে এক কুটীরবাসী শ্রমিক ঘোড়ার নালগুলোকে অমসৃণ ক'রে তৈরী করছিল। আবার সেই-জলন্ত লোহা আর ইস্পাত। নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ির ঝনঝনা তার কানে ভয়ানক পীড়া দিচ্ছিল। তবু পীয়ারকে যেন ও টানতে লাগল। কতকাল পীয়ার ওই শব্দ শোনে নি। কত স্মৃতি পীয়ারের মনে জেগে উঠতে লাগল।

"কি য়েন্‌স, এটা জোড়া দিতে চাও! সোহাগা কোথায়! এই দেখ, এই রকম ক'রে ক'রতে হয়।"

পীয়ারের অনায়াস হাতুড়ি পেটার দক্ষতা দেখে য়েন্‌স বলে, "মনে হচ্চে যেন জন্মকাল থেকেই কামারের কাজ করা হয়েচে।"

বড দিনের সন্ধ্যা এল, ধূসর বর্ণের টাট্টু ঘোড়াটা দোরের কাছে মস্ত একটা কাঠের বাক্‌স টেনে নিয়ে এল। বাক্‌সটা খুলে রিজেবীর আত্মীয়দের পাঠান একরাশ ভাল ভাল বড়দিনের উপহার নিয়ে পীয়ার ভেতরে ঢুকল। রান্নাঘরের টেবিলের ওপর ওই একরাশ জিনিসের দিকে তাকিয়ে পীয়ার দাঁতে ঠোঁট চেপে রইল। বেশি দিনের কথা নয়। মার্লে আর পীয়ার লোরেঙের গুদামঘর থেকে শ্লেজ-বোঝাই ক'রে বড়দিনের উপহার নিয়ে চারদিকের দীন-দরিদ্রদের দিতে যেত। তখন এটা তাদের একটা আমোদ ছিল। আর এখন—এখন অন্যের কাছ থেকে উপহার নিয়ে তাদের খুসী হ'তে হবে।

"মার্লে, এবছর আমাদের দেবার মত কি কিছুই নেই?"

"আমি তো জানি নে। তুমি কি বল?"

"শুধু যদি দান গ্রহণই ক'রতে হয়, আর দেবার কিছুই না থাকে, তা'হলে ভাল বড়দিনই হ'ল দেখচি আমাদের!"

মার্লের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। "আশা করা যায় যে এমন আর হবে না"—সে বলে।

পাইচারী দিতে দিতে পীয়ার বলে, "এখনও আমি এ হ'তে দেব না। মোয়েনে সেই ক্ষয়রোগী ছুতোর আছে। তোমার কাপড় আর আমার গায়ের সার্টও যদি বাদ দিতে হয়, তবু তাকে আজ কিছু দিয়ে আসব। তুমিও ত জান, আমরাও যদি কিছু না করতে পারি তা হ'লে কোন বড় দিনই হবে না।"

"বেশ, যা ভাল বোঝ কর। দেখি, ছেলেদের জামা কাপড় থেকে কিছু বার করা যায় কি না।"

শেষটায় এই দাঁড়াল, বাপের বাড়ী থেকে যেসব পার্শেল এসেছিল, সেই সমস্ত চাল, বাদাম, পাঁউরুটির ওপর মার্লে ট্যাক্স লাগালে, আর পীয়ারকে দিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে পাঠাবার জন্য ছোট ছোট প্যাকেট তৈরী ক'রে ফেললে। মার্লে'র ধরণই এই, তাকে কিছু করতে বল, সে একটা না একটা উপায় বার ক'রবেই।

পীয়ার যখন বেরুলো বড়দিনের উপহার নিয়ে, তখন পায়ের নীচে বরফ ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। নক্ষত্রালোকিত আকাশের নীচে, অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে গায়ে খামারবাড়ীগুলোর বাতায়ন থেকে রাশি রাশি আলোক ছড়িয়ে পড়ল আর তীক্ষ্ণ শীতল বায়ু ব'য়ে যেতে লাগল, আর সমস্তের ওপর আকাশেরই কোলে একটি ছোট আলো দেখা যেতে লাগল, সেটি কোন কুটির-বাতায়নের আলোকও হ'তে পারে, তারাও হ'তে পারে!

পীয়ার যখন ঘরের আতপ্ত হাওয়ায় ফিরে এল, তখন তার সর্ব্বদেহে যেন সে নবীনতা অনুভব ক'রতে লাগল। মার্লে যখন ছেলেদের বললে, "বাবা তোমাদের আজ নাইয়ে দেবে," তখন চারদিক থেকে আনন্দ কোলাহল সুরু হ'ল।

একটা পিপের একদিক করাত দিয়ে কাটা হয়েছিল। সেইটে হ'ল নাওয়ার টব। পীয়ার জামার আস্তিন গুটিয়ে কচি কচি নগ্ন শিশুদের ধ'রে রান্নাঘরে দাঁড়াল, গরমজলে শিশুগুলি হাত পা ছুঁড়তে লাগল।

বসার ঘরে মাও যেন কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ব্যাপারটা গোপন, তাই ছেলেদেরও কৌতূহলের আর সীমা নেই। ছোট খুকী আস্টা মায়ের কাছে যাবার জন্য যখন দোরে গিয়ে কান্না জুড়ে দিলে, তখন ছেলেরা ব'লতে লাগল, "না খুকী, না, এখন যেয়ো না।"

তারপর যখন সন্ধ্যেবেলা ক্রিস্টমাস-বৃক্ষে আলো দেওয়া হ'ল,

আর তুষার-ঢাকা বাতায়ন আলোকিত হ'য়ে উঠল, তখন সেই ঘরের মেঝেয় বিরাট কাণ্ড সুরু হ'য়ে গেল। লুইসে তার 'স্কী' পরে তখনি মুখ থুবড়ে প'ড়ল, লোরেঞ্জ তার নতুন স্লের ওপর চড়ে বসে চেঁচাতে লাগল, "হেই, এ-ই রাস্তা থেকে সরে যাও সবাই!" আর এক কোণে ছোট খুকী আস্টা ব্যস্ত ভাবে তার খুকীকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে লাগল।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পানে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। মার্লে বলে, "কেমন, বলেছিলাম না?"

ধীরে ধীরে যন্ত্রণাদায়ক মন্দগতিতে মলিন ধূসর শীতের দিনগুলো কাটতে থাকে। দিনের মধ্যভাগে কেবল দু'টি ঘণ্টার জন্য অস্ফুট গোধূলি আলোকের আবির্ভাব হয়, তারপর আবার অন্ধকার ছেয়ে যায়। দীর্ঘ রাত্রি ধ'রে উত্তুরে বাতাস হুহু শব্দে শোক-গাথা গেয়ে চলে, আর পথের পরে তুষার-স্তূপ পুঞ্জীভূত করতে থাকে, যার মাঝে আরোহী সমেত 'স্লে' নিমগ্ন হ'য়ে যেতে পারে। একঘেঁয়ে পরিবর্তনহীন দিন রাত্রি আসে যায়। সেই একই বরফ-ধূসর দিবালোক, একটিও প্রাণী নেই যার সঙ্গে কথা বলা যায়। উপত্যকার ওপর দিয়ে এক প্রকাণ্ড অভেদ্য পর্ব্বত-প্রাচীর উঠে তোমায় আবদ্ধ করেচে, ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভেতরটা তোমার পাগল হ'য়ে ওঠে। ইচ্ছে যায় ওর মাঝে ছেঁদা ক'রে সেই ফাঁক দিয়ে দূরের জগৎটাকে একবার দেখে নিতে, কিম্বা ওই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে একটি নিমেষের জন্য চতুর্দ্দিককার সুদূর প্রসারিত দিগন্তকে দেখে নিতে, একটি বার এই বদ্ধতার বাইরে সহজ নিশ্বাস নিতে ইচ্ছা হয়।

অবশেষে একদিন এই ধূসরাবরণ একটুখানি উন্মুক্ত হয়। একখণ্ড নীলাকাশ দেখা দেয়, সেদিকে তাকিয়ে বুকটা একটু হাল্কা হ'য়ে আসে। দক্ষিণের তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতচূড়া সোনালি হ'য়ে আসে। একি? সত্যিকার

সূর্য্য ? দিনের পর দিন একটি সুবর্ণরেখা বিশালতর হ'য়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে থাকে আর সকলের ওপরকার খামার বাড়ীগুলো সেই আলোয় লাল হ'য়ে উঠতে থাকে। শেষে একদিন সেই আলোক-শিখা ফোর্ট-হাউস পর্য্যন্ত এসে পৌছালো আর যে ঘরে ব'সে মার্লে ছোট্ট পাজামার ফুটোগুলোয় তালি দিচ্ছিল সেই ঘরের জানালা দিয়ে আলো প্রবেশ করল। সেই সঙ্গে সঙ্গে এল যেন জীবন, এল আনন্দ।

দোরের কাছ থেকে লুইসে চেঁচিয়ে উঠল, "মা, সূর্য্য এসেচে।"

"হ্যাঁ মা, দেখতে পাচ্চি।"

লুইসে তার 'শী' নিয়ে পাহাড়ে যাবার জন্য ব্যস্ত, তাই শুধু তার আর লোরেঞ্জের রুটি নেবার জন্যই সে মুহূর্ত্তকালের জন্য এসেছিল। খুব খুসী হ'য়ে মাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে দু'হাতে দু'টুকরো রুটি নিয়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লুইসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে গেল।

পীয়ারও যদি আবার এমনি সুস্থ সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারত! এক একদিন তাদের মনে হয়, যেন অবশেষে পীয়ার আবার ভাল হবার দিকে মোড় ফিরেচে। কিন্তু তারপরই আবার পীয়ার যাতনায় ছটফট করতে থাকে, আর মনে হয় যেন কোন আশাই নেই। পীয়ার আবার ডাক্তারের ওষুধ ধরেচে, আর্সেনিক, লৌহভস্ম ইত্যাদি। ডাক্তারেরা যে শান্তি আর বিশুদ্ধ বায়ুর ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তাও এখানে পর্য্যাপ্ত; এসবে কি কিছুই উপকার হবে না? তারা যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এখানে এসেচে তারও তো আর বেশি মাস বাকী নেই!

তারপর? আরেক বছর? পরের অনুগ্রহের ওপর বাঁচা, হায়রে!

মার্লে মাথা নাড়ে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

লুইসেরও স্কুলে যাবার সময় হ'য়ে এল।

ক্রসেথ থেকে মারিট পিসী লিখেচে, "ইচ্ছে কর তো ছেলেদের আমার

কাছে পাঠিয়ে দাও, তিনটিকেই। না, ধন্যবাদ তাঁকে। মার্লে জানে, এর মানে কি। মারিট পিসী তাদের চিরদিনের জন্য নিতে চায়।

সন্তানগুলোকে অন্যের কাছে দিতে হবে, হারাতে হবে? যেদিন এদুঃখও সইতে হবে, সেদিনও কি আসবে?

কিন্তু ওদের স্কুলে পড়াতে হবেই; বড় হ'য়ে যাতে জীবিকা অর্জন ক'রতে পারে অন্ততঃ ততটুকু লেখাপড়া শেখাতে হবেই। আর যদি পিতামাতার সেই সাধ্যই না থাকে, তবে নিজের কাছে রাখবার কি তাদের সত্যি অধিকার আছে?

মার্লে'র সেলাই চ'লতে থাকে; মাঝে মাঝে যখন সে মুখ তুলে চায়, সূর্য্যালোক তার মুখে এসে পড়ে।

অরুণ আলোয় তুষার-রাশি কেমন বেগুনি-আভায় প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে। এমনি দিন তবু যেন দুঃখ-কষ্ট একটু হাল্কা লাগে। যেন মার্লের বুকের ভেতর জমাট কি একটা আজ গলে যেতে থাকে!

লুইসে বেহালা শিখেচে মন্দ না। হয়ত একদিন লুইসে এই দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়বে, আর তার মা যে ব্যর্থ স্বপ্ন দেখেছিল হয়ত সেই বিজয় লুইসের জীবনে সম্ভব হবে।

বাইরে দ্রুত পদশব্দ হ'তেই মার্লে চমকে ওঠে, শঙ্কিত প্রতীক্ষায় সে ব'সে থাকে। পীয়ার হয়ত রাগে উত্তেজিত হ'য়ে আসচে, হয়ত হতাশা তাকে আক্রমণ করেচে; মাথার যন্ত্রণাটা আবার ফিরে আসেনি তো? দোর খুলে যায়।

'মার্লে, এতদিনে পেয়েচি আমি! সত্যি বলচি, এতদিনে আমি বার করেচি।'

মার্লে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে, পীয়ারের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ব'সে পড়ে।

পীয়ার আবার বলতে থাকে, 'মার্লে, এবার ঠিক পেয়েচি ; এত সহজ ব্যাপারটা এতকাল কেন আমি করতে পারিনি !'

পকেটে হাত দিয়ে শীস দিতে দিতে পীয়ার ঘরে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাইচারী দিতে থাকে।

'কি পীয়ার, ব্যাপার কি ?'

'ছাখো, মার্লে, আমি কাঠ কাটছিলাম। আর মাথার ভেতর লাখো লাখো ফসল কাটা কল চলছিল, সবগুলোরই কাঁচিতে ঘাস আটকে গিয়ে তাদের গতিতে বাধা দিচ্ছিল। ঠাণ্ডা ঘাম ঝরতে লাগল, মনে হ'ল যেন নরকে চলেচি। তারপর, তারপর হঠাৎ ইস্পাতের একটা ঝিলিকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। মার্লে, এর মানে আমাদের মুক্তি !'

'পীয়ার দোহাই তোমার, আমায় একটু বুঝিয়ে বল।'

'কেন, বুঝতে পাচ্ছ না, ঘাসগুলোকে সরিয়ে কাঁচিগুলোকে পরিষ্কার রাখবার জন্য শুধু ছোট্ট ইস্পাতের একটা বুরুশ চাই। একটা ছোট্ট শিশুও তো এ বুঝতে পারে! মার্লে, এবার আমাদের দিন ফিরল, এ নিশ্চয়!'

মার্লের সেলাইটা তার কোলে পড়ে রইল, হাত দুটি নিশ্চল হ'ল। আহা যদি সত্য হয়!

'মার্লে, মেশিনটাকে এখানেই আনিয়ে নিই। বুরুশ তৈরী করা আর লাগানো কিছুই নয়, এখানকার লোহারের দোকানে তা আমি একদিনেই তৈরী ক'রে ফেলব।'

'কি বলচ—এখন থাক না হয়। সবে একটু সেরে উঠচ তুমি, এখন আবার সব নষ্ট করতে চাও!'

'একদিকে ব্যর্থতা আর অন্যদিকে পৃথিবীব্যাপী সাফল্য এ দু'য়ের মাঝখানে আমার মাথার ওই মেশিনটা যতদিন আমার মাথায় চলতে

থাকবে, ততদিন আমি কখনো ভাল হব না, মার্লে। মস্ত বোঝার মত ওটা আমার মস্তিষ্কের ওপর চেপে রয়েচে। ও থেকে মুক্ত না হ'লে, আমার কখনো ভালো ঘুম হবে না। হে ভগবান, আমাদেরও এদিন যদি একদিন বদলায়! যদি সেদিন আসে, তা হ'লেও কি আমি সেরে উঠব না মনে কর?'

পীয়ার মার্লেকে বুকে জড়িয়ে ধ'রল এবার। কিন্তু যখন পীয়ার চ'লে গেল, মার্লে চুপ ক'রে বসে তুষার-পর্ব্বতের অন্তরালে সূর্য্যাস্ত দেখতে লাগল, মার্লের চোক বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল, নিশ্বাসও যেন বন্ধ হ'য়ে এল।

এক সপ্তাহ পরে সাদা ছাতগুলোর ওপর যখন রোদ এসে পড়েচে, সেই ধূসর রঙের টাট্টু ঘোড়াটা একটা প্রকাণ্ড প্যাকিং কেস্ নিয়ে এল রোষ্টায়। সেই দিনই লোহারের দোকানে হাতুড়ির আর উখার শব্দ সুরু হ'য়ে গেল।

আর কয়েকটা বিনিদ্র রাত্রিতে কিইবা ক্ষতি এখন? আর এই যে নিদ্রাহীনতা তাদের, এ তো উদ্বেগ-প্রসূত নয়, কারণ এখন তাদের কাজ চলেচে সফলতার দিকে, দুজনেরই সুখস্বপ্ন তাদের নিদ্রাহীন ক'রে তুলেচে। স্বপ্ন দেখচে তারা। আবার তারা লোরেঙ কিনে নিয়েচে, আবার বিশাল, আলোকিত কক্ষগুলোর ভেতর ঘুরে বেড়াচ্চে, আবার সুখ শান্তি ফিরে এসেচে। দুর্দ্দিন তাদের রাতের দুঃস্বপ্নের মত গত হয়েচে। আবার তারা যৌবন ফিরে পাবে। 'স্নী'তে ক'রে একসঙ্গে আবার তারা বেড়াতে বেরুবে, তারপর পান-ভোজন ক'রে আবার তারা পরস্পরের পানে সপ্রেম দৃষ্টিপাত ক'রবে, আবার, আরো বহুবার।

'শুভ রাত্রি, মার্লে!'

'শুভ রাত্রি, পীয়ার, ভালো ক'রে ঘুমোও।'

কয়েকদিন ধ'রে লোহারের কারখানায় হাতুড়ি পেটা চ'লতে লাগল।

কয়েক বছর আগে হ'লে পীয়ার এ কাজ দু'দিনেই শেষ করতে পারত। কিন্তু এখন আধঘণ্টা কাজ করেই সে একেবারে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে; এলোমেলো কল্পনার অলস খেলায় যখন মস্তিষ্ক অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে তখন কোনো একটা বিষয়ে নিবিষ্ট হ'তে গেলেই ক্লান্তি আসে। পূর্ব্বে সে মেশিনের যে-সব অংশকে সুসম্পূর্ণ ব'লে মনে করেছিল, এখন তাতেও ত্রুটি ধরা পড়তে লাগল। কিন্তু এখন তার সহায়ক কর্ম্মী নেই, ঢালাই করবার কারখানা নেই। এখন প্রত্যেকটি টুকরো তাকে বদখদ্ যন্ত্র দিয়েই নিজের হাতে তৈরী করতে হচ্চে।

কিন্তু তাতে কি আসে যায়!

প্রত্যেক অনাবশ্যক চিন্তাকে দূরে রেখে, পীয়ার নিজের মস্তিষ্ককে নিয়মানুগ করতে আরম্ভ ক'রেচে। একমাত্র মেশিনের চিন্তা ছাড়া চেতনার আর সমস্ত বাতায়নের ওপর সে কৃষ্ণ যবনিকা টেনে দিয়েচে। আধ ঘণ্টা কাজ ক'রে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করে, চোক বুজে শুধু বিশ্রাম। এও নিয়মানুবর্ত্তিতা। আগামী দিনের অর্দ্ধঘণ্টার কর্ম্মশক্তি সঞ্চয়ের জন্য সে নিজের চেতনাকে অন্ধকার দিয়ে পরিব্যাপ্ত ক'রে তোলে।

মার্লের কি ভয় করে, উৎকণ্ঠা জাগে? যাই হ'ক, পীয়ার যে-কাজে মগ্ন হ'য়ে আছে, তার সম্বন্ধে সে কোনো কথাই বলে না। এমনিতেই পীয়ার যথেষ্ট উত্তেজিত হ'য়ে আছে। এখন যদি পীয়ার খিটখিটে হ'য়ে ছেলেমেয়েদের ওপর রেগে ওঠে, মার্লে পীয়ারের পানে ভৎর্সনা-দৃষ্টি নিয়ে তাকায় না। তাকে আর ছেলেপিলেদের এটা সইতেই হবে, শীগগিরই তো এ অবস্থার অবসান হবে।

স্বচ্ছ জ্যোৎস্না রাতে যখন ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়, তখন তাদের দুজনকে কখনো কখনো একসঙ্গে বেড়াতে দেখা যায়। তারা পরস্পরের কটিবেষ্টন ক'রে জোরে জোরে কথা কয়, প্রচুর হাসে, কখনো কখনো

গানও গায়। রাস্তা দিয়ে যে-সব লোকেরা যায়, তারা হাসি গান শুনে মনে মনে ভাবে, হয়ত কেউ মাতলামো করচে, তা নইলে নিশ্চয়ই কোর্ট হাউসের সেই দম্পতি যুগল।

বসন্ত আসন্ন হ'য়ে এল, দিনগুলো হ'য়ে এল হালকা।

কিন্তু হামার কৃষি-প্রদর্শনীতে যখন যন্ত্রটি পরীক্ষিত হ'ল, তখন একজন আমেরিকান প্রতিযোগীর যন্ত্র সামান্য একটু ভাল প্রমাণিত হ'ল। প্রত্যেকের কাছেই ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল, কারণ যদিচ যন্ত্রের পরিকল্পনাটা সোজাসুজি পীয়ার থেকে নেওয়া হয়নি, তবু এতে আর সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে পীয়ারের মেশিন থেকেই সেই মেশিনের পরিকল্পনা জেগেচে, কারণ দুটি যন্ত্র তৈরীর মূলনীতি ছিল একই। কিন্তু আমেরিকান মেশিনটিতে এমন একটু পার্থক্য করা হয়েচে যে পেটেণ্ট সম্বন্ধীয় আইন নিয়ে লড়াই ক'রে কোনো ফল হবে কিনা তাতে সন্দেহ জাগে। আর তাছাড়া অর্থহীন লোকের পক্ষে ধনী আমেরিকান কার্ম্মের সঙ্গে আদালত করতে যাওয়াও তো সোজা কথা নয়।

সর্ব্বোত্তম যন্ত্র তৈরীর পৃথিবীব্যাপী বিশাল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পীয়ার বিজয়ী হবার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। আরেকজন লোক তারই রথে চড়ে শেষ মুহূর্ত্তে কয়েক ফুট আগে চলে গিয়ে প্রথম পুরস্কার নিলে।

যে-কাজই হ'ক, কাজটি, যদি নিজে ভাল হয়, তাহলে দুনিয়ার লোকেরা এ নিয়ে মাথা ঘামাতে যায় না যে কাজটি সততার সঙ্গে করা হ'য়েচে কিনা।

আর বাজারে যখন এর চেয়ে একটা ভাল মেশিন রয়েচে, তখন এ নিয়ে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খুলতে যাওয়াও বৃথা।

ইস্পাত পীয়ারকে স্প্রিঙ বোর্ডের মত আশ্রয় ক'রে নিজের পথে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার পুরস্কারটা পেল আরেকজন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জুলাই মাসের এক আতপ্ত দিনে হের উথোগ জুনিয়র, ইংলিশ টুইডের এজেন্ট, ট্রেণ থেকে নেমে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্ত চারদিক দেখে নিলে। নিশ্চয়ই চমৎকার দৃশ্ত। এই সুন্দর উপত্যকায় তার বোন বর্ষাধিককাল ধ'রে বাস করচে। চমৎকার হাওয়া; তবু কি জানি কেন, এতেও তার ভগ্নীপতির বিশেষ উপকার হল না। ফিটফাট পোষাক-পরা যুবক ভদ্রলোকটি পায়ে হেঁটে পথ জিজ্ঞেস করতে করতে রোস্টার দিকে চলল। সে আচমকা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। রিক্সেবীতে পারিবারিক বৈঠক ব'সেচিল। পীয়ারের তো আর কোন আশাই রইল না। তাই মার্লে আর তার স্বামীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা কিছু নিশ্চিত ব্যবস্থা করা দরকার ব'লে তারা স্থির করেচে।

যে ছোট পথটি সেই খামারের দিকে চলেচে, সেই পথে পা দিয়েই সে দেখতে পেলে সার্টপরা একটি মানুষ ঠেলাগাড়ীতে পাথর বোঝাই করে নিয়ে চলেচে। এ কি? তার মনে হ'ল, হয়ত তারি ভুল হ'য়েচে। না, এ নিশ্চয়ই পীয়ার হল্‌ম্‌—পরম উৎসাহে ঠেলাগাড়ীতে পাথর বোঝাই ক'রে নিয়ে পীয়ার হল্‌ম্‌ চলেচে, যেন এর প্রতিপদক্ষেপের জন্ত পয়সা পাবে, এমনি ভাব।

এই এজেন্টটি দুঃখ করবার বা সহানুভূতি জানাবার মানুষ নয়। হেঁকে বললে, 'কি হে, খুব মেহনত করচ, না? খেতখামারের কাজ সুরু করেচ দেখচি।'

পীয়ার সোজা হ'য়ে দাঁড়াল, তার পর ট্রাউজারে হাত মুছে নিয়ে এগিয়ে এল। উথোগ মনে মনে ভাবে, 'হা ভগবান, পীয়ার কি রকম

বুড়ো হ'য়ে গেচে!' কিন্তু জোরে জোরে বলে, 'তোমার শরীর তো বেশ সেরে গেচে হে, চিনতেই পারা যাচ্ছিল না।'

রান্নাঘরের জানালা থেকে মার্লে তাদের দুজনকে দেখতে পায়। 'এ কি, এ যে'···বলতে বলতে দৌড়ে সে বেরিয়ে আসে। কতকাল সে তার বাপের বাড়ীর লোকদের দেখে না; তাই এখন তার অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়ে সে ভায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

না, উথোগ শোকদুঃখ করতে, সহানুভূতি প্রকাশ করতে আসেনি। ব্যাগে ভাল মদ্য ছিল, ভোজনের সময় সবাই মিলে তাই পান ক'রল, সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার আর 'ভ্যারাইটি শো'র গল্প চ'লতে লাগল। প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অনুকরণে কিছু অভিনয়ও সে ক'রল, ওই দুটি সংসার-ক্লান্ত প্রাণীকে হাসিয়ে তবে সে ছাড়ল। তাদের যে একটু আনন্দ আর হাসির খুবই প্রয়োজন তা সে ভাল ক'রেই জানে।

কিন্তু সে এও জানে যে, তাদের পরিবার মার্লে আর পীয়ারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি মীমাংসা করেচে, সে সংবাদের প্রতীক্ষায় এরা অত্যন্ত দুর্ভাবনায় আছে। তাদের জীবনের দিনগুলো দুঃখ-দুর্দ্দশায় কেটে চলেচে, এখন একমাত্র আশা তাদের কোনো রকমে বেঁচে থাকার। যে-সাহায্য তারা ওখান থেকে পাচ্চে যদি তাও না মেলে তাহলে তাদের এখানে থাকবার শক্তি তো নেই-ই, আর কোথাও যাবারও শক্তি নেই। কি তারা করবে তখন? তারা যে ওখানে বসে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠচে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

ভোজন শেষে উথোগ পীয়ারের সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরোয়। মার্লে উৎকণ্ঠিতচিত্তে ঘরে ব'সে প্রতীক্ষা করতে থাকে। মার্লে বেশ বুঝতে পারে যে এখনি তাদের ভাগ্য নির্ণয় হ'চ্চে।

শেষে তারা ফিরে এল; হাসিমুখে যখন তারা ভেতরে এল তখন

মার্লে বিস্মিত হ'ল। তার ভাই অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে মার্লের পিঠ চাপড়ে, কপালে চুমো খেয়ে তাকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করল। মার্লে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। তার এমনও ইচ্ছা করছিল যে তার কাছে বসে একটু কথাবার্ত্তা কয়, কিন্তু মার্লে বুঝতে পারছিল যে তাদের সম্বন্ধে আসল সংবাদটা দেবার জন্য নিরিবিলি অবসরের প্রতীক্ষায় পীয়ার ওদিকে ব'সে রয়েচে। তাই তাড়াতাড়ি শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে মার্লে নীচে নেমে এল।

এতক্ষণ পরে মার্লে তার কাজ করার টেবিলটার পাশে বাতায়নের সামনে পীয়ারের কাছে এসে বসল।

মার্লে প্রশ্ন করে, 'তার পর ?'

'মার্লে, কথাটা হচ্চে এই,—যদি বেঁচে থাকবার সাহস থাকে, তাহ'লে পরে সত্যিকার যা অবস্থা তাকে সোজাসুজি স্বীকার করতেই হবে।'

'হাঁ প্রিয়, কিন্তু বল না কি—'

'আর সত্যি কথা হচ্চে এই যে আমার এই স্বাস্থ্য নিয়ে কোন কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। আর তাই যখন, তখন এখানে থাকাও যা অন্যত্র থাকাও তাই।'

'কিন্তু এখানে কি আমরা থাকতে পারব, পীয়ার ?'

'আমার মত হতভাগা আনাড়ীর সঙ্গে তুমি থাকতে পার যদি, সেইটেই হচ্চে কথা।'

'আমার কথার উত্তর দাও না—এখানে থাকতে পারব তো আমরা ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু মার্লে, কর্ম্মক্ষম হ'তে হয়ত কয়েক বছর লাগবে, আমার সেই কথাও বিবেচনা করতে হবে। আর, বছরের পর বছর পরের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য।'

'কিন্তু পীয়ার, কি করা যাবে তাহ'লে? আমার তো অর্থোপার্জন করবার কোন শক্তি নেই।'

বাতায়নের দিকে তাকিয়ে পীয়ার বলে, 'যাই হোক, আমি চেষ্টা করতে পারি।'

'তুমি? না, না পীয়ার! ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের কাজ পেলেও তুমি বেশ জান তোমার চোকে তা সহ্য হবে না...'

'আমি লোহারের কাজ করতে পারি।'

এর পর খানিকক্ষণ তারা চুপ ক'রে থাকে। মার্লে যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারচে না এমনিভাবে পীয়ারের দিকে তাকায়। সত্যি কি পীয়ার তামাসা করচে না? নীল নদীর বাঁধ বেঁধেছিল যে ইঞ্জিনীয়ার সে কি গ্রাম্য লোহার হবে?

মার্লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; কিন্তু পীয়ারকে সে নিরাশ করতে পারবে না কিছুতেই। শেষে কোন রকমে মার্লে বলে, 'হ্যাঁ, তোমার সময়টা তাতে কাটবে, আর হয়ত তাতে তোমার ঘুমটাও একটু ভাল হ'তে পারে।' ব'লে মার্লে শক্ত ক'রে ঠোঁট চেপে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

'আর মার্লে! ওই কাজ করতে হ'লে এই বাড়ীতে থাকা চ'লতে পারে না। আর, বাস্তবিক মস্ত বাক্সের মত এই বাড়ীটা আমাদের পক্ষে বড়ও; তোমাকে সাহায্য করবার মত একটা ঝিও তো নেই।'

'এর চাইতে ছোট বাড়ী কি তোমার সন্ধানে আছে?'

'হ্যাঁ, একটা ছোট্ট বাড়ী বিক্রী আছে, দু-একর জমিও আছে। যদি একটা গাই আর শূয়োর আর কয়েকটা 'ফাউল' থাকে মার্লে, আর যদি দু-এক বুসেল শস্য জন্মানো যায়, আর দোকানে কাজ ক'রে যদি হপ্তায় কয়েক শিলিং উপার্জন করতে পারি, তা হ'লে আর যাই হ'ক গির্জার দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে না। ছোট-মোটা কাজ যা পাব

তা আমি করতে পারব। আর এই সব ঠুক্‌ঠাক্‌ কাজে আমার উপকারই হবে। কি বল ?'

মার্লে কোনো উত্তর দেয় না ; চোক ফিরিয়ে নিয়ে একদৃষ্টে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

'কিন্তু আরেক কথা মার্লে, তোমার সম্বন্ধে। আমার সঙ্গে তুমিও কি ওই রকমের জীবনের মাঝে নেমে আসতে চাও ? আমার কিছুই মুস্কিল হবে না ; যখন ছোট ছিলাম তখন ওই রকম বাড়ীতেই আমি ছিলাম। কিন্তু তুমি ! সত্যি বলচি, মার্লে, তোমার কাছে এ আমি চাইতে পারি না।' পীয়ারের গলা কাঁপতে থাকে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধ'রে মার্লের দিক থেকে চোক ফিরিয়ে নেয়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে থাকে। শেষে মার্লে বলে, 'টাকার কি হবে ? ও বাড়ীটা কিনবে কি করে ?'

'তোমার দাদা একটা ধারের ব্যবস্থা ক'রে দেবে বলেচে। কিন্তু আবার বলি মার্লে, তুমি যদি ক্রসেথে গিয়ে তোমার পিসীর কাছে গিয়েই থাকতে চাও আমি তোমায় কোন দোষ দেব না। আমার মনে হয় তোমাকে আর ছেলেপিলেদের পেয়ে তিনি খুসীই হবেন।'

আবার কিছুক্ষণ তারা নিস্তব্ধ হ'য়ে থাকে। তারপর মার্লে বলে, 'যদি ওখানে দু'টি ভালো কামরা থাকে, তা হ'লেই আমরা বেশ থাকতে পারব। আর, ঠিকই বলেচ, তাতে আমার কাজ করাও সোজা হ'য়ে যাবে।'

পীয়ার একটু চুপ ক'রে থাকে, কথা বলতে পারে না। কি যেন গলায় আটকায়। সে বুঝতে পারে যে আর কথা না ব'লে এ সত্যিটাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে মার্লে তাকে ছেড়ে যাবে না। এই সত্যটিকে আবিষ্কার ক'রে তাকে গ্রহণ ক'রতে পীয়ারের সময় লাগে।

মার্লে পূর্বের মতই পীয়ারের সামনে জানালার দিকে চোক ফিরিয়ে বসে থাকে। সেই সুন্দর কালো ভুরু এখন আগের মতই আছে, শুধু মুখখানি শীর্ণ ম্লান হয়ে গেচে আর মাথার চুলে শুভ্র রেখা পড়েচে।

কিছুক্ষণ পরে পীয়ার আবার বলে, 'ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে কি করা যাবে, মার্লে ?'

মার্লে চমকে ওঠে।

'ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে কি করতে হবে ?' এতকাল যে ভয় ক'রে এসেচে সে, তাই কি হবে শেষে ?

'মারিট পিসী জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েচেন তোমার ভাইয়ের সঙ্গে লুইসেকে তাঁর কাছে রাখবার জন্য পাঠাব কি না।'

উত্তেজিত কণ্ঠে মার্লে বলে ওঠে, 'না, না পীয়ার। নিশ্চয়ই তখুনি তুমি 'না' বলে দিয়েচ ? নিশ্চয়ই তুমি ওকে যেতে দেবে না। ওরা কেন ওকে সেখানে নিয়ে যেতে চায়, তা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারচ ?'

পীয়ার মাথা নেড়ে বলে, 'পারচি ; কিন্তু আরেকটা কথা রয়েচে। লুইসের কল্যাণের দিকে চেয়ে আমাদের কি 'না' বলবার অধিকার আছে ?'

মার্লে লাফিয়ে উঠে হাত জোড় ক'রে বলে, 'পীয়ার, আমায় তুমি এ কাজ করতে বোলো না। তুমি নিজেও এ করতে চেওনা। নিশ্চয়ই আমাদের এমন দুর্দ্দৈব আসেনি যে, শেষে সন্তানগুলোকেও দিয়ে দিতে··· না, না, না,'—করুণ কণ্ঠে মার্লে বলে, 'শুনচ, পীয়ার ? আমি এ পারব না।'

পীয়ার দাঁড়ায়, জোর ক'রে নিজেকে শান্ত ক'রে বলে, 'তোমার যা ইচ্ছে মার্লে ; কাল তোমার ভাই যাওয়া পর্য্যন্ত ভেবে দেখা যাক তবু। সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে ; এক দিক থেকে ব্যাপারটা আমাদের

এখন বেদনা দেবে, অপর দিক দিয়ে লুইসের পক্ষে এটা খুবই একটা গুরুতর ব্যাপার হ'তে পারে।'

পরদিন সকালবেলা যখন ছেলেমেয়েদের জাগাবার সময় হ'ল, তখন মার্লে পীয়ার দুজনই তাদের শোবার ঘরে গেল। লুইসের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে লাগল তাকে। রোস্টায় আসার পর অনেকখানি বেড়ে উঠেচে সে। বালিশে মুখ ঢেকে লুইসে ঘুমোচ্ছিল, সুন্দর কেশ-রাশিতে গালটি ঢাকা। লুইসে নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন; যাই হ'ক, এখন সে নিজের ঘরে রয়েচে; সংসারে মা-বাপের কাছে সে যেমন নিরাপদ তেমন তো আর কোথাও নয়।

নাড়া দিয়ে মার্লে ডাকল, 'লুইসে, ওঠার সময় যে হ'ল মা?'

অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায়ই লুইসে উঠে বসে, আর দুখানি মুখের পানে বিস্মিতভাবে তাকায়। ব্যাপার কি?

পীয়ার বললে, 'শীগগির ক'রে কাপড়-চোপড় পরে নাও। কি মজা! কার্সটেন মামার সঙ্গে আজ ক্রসেথের পিসীর কাছে যাবে। কি বল?'

এক নিমেষেই ছোট্ট মেয়েটির ঘুম ছুটে গেল, বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সে কাপড়-চোপড় পরা সুরু করল। কিন্তু বাপ মায়ের মুখের কেমন একটা ভাব দেখে তার সেই আনন্দ যেন একটু কমে গেল।

সেদিন সকালবেলা ছেলেপিলেদের মাঝে খুব কানাকানি চলতে লাগল। সব চেয়ে ছোট্ট দুটি বিস্মিত নেত্রে তাদের যে বোনটি চলে যাচ্চে তার পানে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট লোরেঞ্জ তার ঘোড়াটা বোনকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখবার জন্য দিয়ে দিলে। আস্টা দিলে তার সবচেয়ে ছোট্ট পুতুলটি। মার্লে কেবলি বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল যেন লুইসে অল্পদিনের জন্য বেড়াতে যাচ্চে, শীগগিরই আবার ফিরে আসবে।

ডিনারের সময় যখন হ'ল তখন তারা একটি ছোট ট্রাঙ্ক ভর্তি ক'রে ফেলল, আর লুইসে তার সবচেয়ে ভাল পোষাক পরে খামারের সকলের কাছে বিদায় নেবার জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল। খামারে যারা ফসল কাটছিল, তাদের সে ঘাস বোঝাই ক'রে আনতে সাহায্য করত, তারা বিশেষ স্নেহের সঙ্গে তাকে বিদায় দিতে এল। সব শেষে পাংশুটে রঙের ঘোড়া মুজিনের সঙ্গে দেখা করতে গেল, সে তখন কামারশালার পেছনটায় খুঁটিবাঁধা হয়ে ঘাস খাচ্ছিল। মুজিন তখন ঘাস খাওয়ায় ব্যস্ত, মাথা তুলে শুধু লুইসের পানে তাকাল; লুইসে এক গোছা ঘাস ছিঁড়ে দিল তাকে। মুজিনের সেটা খাওয়া হ'য়ে গেলে, লুইসে তার মুখটা চাপড়ে দিয়ে তার গলা জড়িয়ে একটিবার ঝুলে নিলে। উঠানের ওপর দিয়ে ফিরে যেতে যেতে বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না করেই জোরে জোরে বললে, 'নিশ্চয়ই চিঠি লিখব।'

উথোগ জুনিয়র আর লুইসেকে নিয়ে ট্রেণখানা স্টেশন ছেড়ে গেল, তারা দুজনই জানলা দিয়ে হাত নাড়তে লাগল।

পীয়ার আর মার্লে তাদের ছোট্ট দুটি শিশুর হাত ধরে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। তখন তারা দূরে গাড়ীর জানালায় একটি ছোট্ট হাতের সাদা রুমাল নাড়া দেখতে পাচ্ছিল। তারপর গাড়ীর শেষ কামরাখানাও পেছনে ধোঁয়া আর ঘর্ঘরধ্বনি রেখে একটা বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

চারটি প্রাণী তারা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেন নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা আগের চেয়ে পরস্পরের আরও কাছে এগিয়ে এল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বড় সড়ক থেকে একটু এগিয়ে গেলেই একখানি একতলা বাড়ী, তাতে একদিকে ছোট ছোট তিনটি জানালা। আর এক পাশে একটি গোয়াল-ঘর, আর অপর দিকে একটি কামারের দোকান। ওই দোকান থেকে যখন ধোঁয়া ওঠে, প্রতিবেশীরা বলাবলি করে, আজকে ইঞ্জিনীয়ার নিশ্চয়ই একটু ভাল আছেন, তাই দোকানে কাজ করচেন। কোন কিছু করাবার থাকে তো তাঁকে দিয়েই করিয়ো। পীয়ার য়েন্‌স্‌-এর চাইতে চার্জ্জ কিছু বেশি করেন না।

মার্লে পীয়ার এইখানে দুবছর হল বাস করচে। তাদের জীবনযাত্রা একসঙ্গে চলচে, কিন্তু তবু তাদের মাঝে একটা পার্থক্য এসেচে। ম্যার্লে এখন স্বামীর মুখের পানে কেবলি তাকায় আর আশা করতে থাকে যে সে ভাল হ'য়ে উঠবে। কিন্তু পীয়ার আর কোন আশাই করে না। মাথার ভেতরকার সেই শব্দটা কিছুক্ষণ শান্ত থাকলেও সাধারণতঃ একটা না একটা যাতনা তার লেগেই আছে। কিন্তু এখন আর সে সম্বন্ধে কিছুই বলে না। স্ত্রীর মুখের পানে তাকায় আর ভাবে, 'মার্লে কেবলি বদলে চলেচে, এর জন্য দোষী তুমিই। দিবারাত্রি তুমি তার ওপর দুঃখদুর্দ্দশা চাপিয়ে চলেচ। এখন অন্ততঃ তার প্রতিকারের চেষ্টা করা তোমার উচিত।' তাই যখন পীয়ারের বুক কান্নায় ভরে ওঠে, তখনো সে চুপ করে সহ্য করে, এমন কি হাসবার জন্য সংগ্রাম করে। বিশেষ ক'রে প্রথম প্রথম এটা খুবই কঠিন লাগত, কিন্তু এখন প্রত্যেকটি বিষয় তার প্রাণে এমন একটি তৃপ্তি নিয়ে এসেচে যা তাকে আরও সংগ্রাম করবার শক্তি দিয়েচে।

এমনি করেই সে তার দুর্ভাগ্যকে অনেকটা ধীরভাবে গ্রহণ করতে শিখেচে। তার হাসিটাও তরল হ'য়ে এসেচে। সে যেন সোজা দাঁড়িয়ে দুর্ভাগ্যের পানে অসঙ্কুচিত দৃষ্টি মেলে বলতে চায়, হ্যাঁ আমি জানি, আমার আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। তুমি আমায় আরও গভীর অতলে ডোবাতে পার, কিন্তু তবু আমি যদি হাসতে চাই তো তোমার বাধা দেবার শক্তি নেই। ভালর আশা যখন সে ছেড়ে দিলে, স্বর্গে মর্ত্যে কারু কাছে কোন আবেদন যখন সে আর করল না, তখন সবই কি রকম সহজ হ'য়ে গেল! কিন্তু হাপরের সামনে কাজ ক'রে যখন সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, তখন স্ত্রীকে এই ব'লে সে কেমন তৃপ্তি পায়, 'না, মার্লে, তোমায় বলিনি আমি যে জল আনতে তোমায় হবে না? দাও, বালতিটা আমায় দাও।'

'তুমি? তুমি এ করবার উপযুক্ত?'

'চুলোয় যাকগে সে কথা। আমি পুরুষ মানুষ কি না? যাও তুমি তোমার রান্নাঘরে; নারীর কাজের জায়গা হল ওই।' বলে পীয়ার জল টানে, তাতে মনটা আরও খুশী হ'য়ে ওঠে, যদিচ সময় সময় মনে হয় শিরদাঁড়াটা ভেঙে যাচ্চে। কখন কখন পীয়ার বলে, 'মার্লে, আজ আমার কেমন আলস্য লাগচে; কিছু মনে না কর তো আরেকটু শুয়ে থাকি।' মার্লে বুঝতে পারে; সে অভিজ্ঞতা থেকেই জানে যে, সেই ভয়ানক মাথার যাতনায় পীয়ার কষ্ট পাচ্চে, মার্লে কষ্ট পাবে এই জন্যই পীয়ার তার নাম দিয়েচে আলস্য।

আজকাল তাদের একটি গাই, একটা শূয়োর আর কয়েকটা 'ফাউল' আছে। এ ঠিক লোরেঙের মত বৃহৎ ব্যাপার নয়, কিন্তু এরও একটা সুবিধা এই যে, পীয়ার নিজেই এসব দেখতে শুনতে পারে। গত বছর তারা এত আলু উৎপন্ন করেছিল যে, তা থেকে তারা কয়েক বুশেল

বিক্রীও করতে পেরেছিল। ডিম তাদের আর কিনতে হয় না, এখন তারাই ডিম বেচে। পীয়ার নিজেই এসব স্থানীয় দোকানদারের কাছে নিয়ে যায়, বাজার দরে বিক্রী করে তা দিয়ে দরকারী জিনিষপত্র কিনে আনে। কেনই বা আনবে না? কাপড় ধোয়া, মেঝে পরিষ্কার করা, রান্না করা এসব করতে মার্লে'রও তো অপমান বোধ হয় না। একথা সত্যি, এক সময় তাদের অবস্থা অন্যরকম ছিল; কিন্তু সেই বিগত দিন ফিরে আসার স্বপ্ন মার্লে'ই শুধু কখন কখন দেখে থাকে। তা না হ'লে, তারা তো জনহীন সাগরতটে ঢেউয়ে-আনা প্রাণীদের মত; বিষণ্ণ দিনগুলি কোন রকমে কাটিয়ে দিতে হবে।

কখন কখন কোন কৃষক হয়ত নূতন আমেরিকান ফসল-কাটা কল মেরামতের জন্য তার কামারশালায় আসে। পীয়ার তখন অদ্ভুত মুখের ভাব নিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মেশিনটার পানে নিমেষকাল তাকিয়ে ঢোক গিলে কি একটা চাপতে চেষ্টা করে। যে-লোকটি তারই মেশিন চুরি ক'রে, সেটাকে অতি সামান্য পরিমাণে ভাল করেচে, সে হয়ত আজ এই মেশিন বিক্রী ক'রে ক্রোড়পতি।

এই সব মেশিন মেরামত করতে পীয়ারকে সংগ্রাম করতে হয়, কিন্তু তবু সে নত মস্তকে কাজ করে; বেচারী মার্লের এক জোড়া জুতো চাই।

কখন কখন ঘরের অন্ধকার আর নেহাই ছেড়ে সে দোরের কাছে একটু খোলা হাওয়ায় আসে; এইখানে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড বিশাল শূন্য দিনের পানে তাকায়।

বড় হাতুড়ি হাতে নিয়ে মানুষ আপনা থেকেই আকাশের পানে তাকায়। এই স্বভাবটি সে তার সেই মহান্ পূর্ব্বপুরুষ প্রমিথিউসের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েচে, যিনি মানুষকে স্বর্গ থেকে আগুন

এনে দিয়েছিলেন, চিন্তা করবার শক্তি দিয়েছিলেন। যিনি তাকে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছিলেন।

পীয়ার আকাশের পানে তাকায়, অর্থহীন ব্যস্ততা নিয়ে মেঘেরা ছুটচে তাই দেখে। সেখানে কি কারো বিরুদ্ধে এরা বিদ্রোহ অভিযান করচে? কিন্তু আকাশ তো শূন্য, কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে?

কিন্তু এইযে এত অন্যায়, এই যে অজস্র বৈষম্য!

শেষের দিন কে এসবের বিচার করবে?

কে? কেউ না!

কি? সেই সব লক্ষ লক্ষ আত্মোৎসর্গকারীদের কথা ভাব দেখি, যারা রক্তাক্ত নিপীড়ন সহ্য ক'রে মরেচে, অথচ যারা মায়ের বুকে শিশুর মতই নিষ্কলঙ্ক ছিল; তাদের প্রতিকার নিয়ে কি কোন দিন আসবে না?

না।

কিন্তু কত অজস্র মানবই না অন্যায়ের দ্বারা বিনষ্ট হয়েচে, যারা অশান্ত আত্মা নিয়ে ঘুরে মরেচে, যারা অনুচিত লজ্জার বোঝা নিয়ে মরেচে, যারা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েচে, যারা দুঃখ ক্লেশ মাথায় নিয়ে সত্যের জন্য সংগ্রাম করেচে, কিন্তু প্রবলতর মিথ্যার কাছে যাদের মাথা নত করতে হয়েচে! সত্য? ন্যায়? কেউ কি নেই, যিনি একদিন ওই সব মৃতদের শান্তি দেবেন, যিনি আবার সব ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে করবেন? কেউ কি নেই?

কেউ নেই!

জগৎ সংসার চলেচে তার পথে। নিয়তি অন্ধ; শয়তান জবের (Job) ওপর তার ইচ্ছা খাটায়, আর ভগবান হাসেন।

যাক্‌, ওহে বোকা, চুপ কর, হাতুড়িটা শক্ত ক'রে ধর। যদি কোন দিন সমগ্র জগতের ভালমন্দের ধারণা করতে পার, তবে সেই ভয়াবহ

রূপ দেখে সে দিন আর বেঁচে থাকতে পারবে না। মনে রেখ, তুমি শুধু মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তু মাত্র, তোমার মধ্যে যে আত্মা রয়েচে তা ভুলক্রমে তোমার মধ্যে বিকশিত হ'য়ে গেচে।

ক্লিঙ, ক্ল্যাং। নেহাই থেকে আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে পড়ে। যেমন আছ তেমনি ক'রেই জীবনটা কাটিয়ে দাও আর কি!

কিন্তু নিয়তি যে-সব হতভাগ্যদের অন্ধভাবে দলিত-পিষ্ট করেচে সেই সব মানুষের সঙ্গে আপনাকে মিলিত করবার জন্য বুকে আবার একটি বিচিত্র কামনার উদয় হয়। সেই সমস্ত দুর্ভাগা মানবদের একটি সজ্ঞে সমবেত করতে ইচ্ছে করে; সবাই মিলে শোক-গাথা গাইবে ব'লে নয়, একটি বিজয় সঙ্গীতে সবাই যোগ দেবে ব'লে, প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে নয়, স্তব সঙ্গীত গাইবে ব'লে। ওগো শাশ্বত সর্বশক্তিমান, দেখ আমরা তোমার নিষ্ঠুরতার প্রতিদান কি দিই— আমরা জীবনের প্রশস্তি গান করি। দেখ, তোমার চেয়ে আমাদের দেবত্ব কত বেশি!

একটি মন্দির রচনা করতে ইচ্ছা জাগে, আধুনিক মানবাত্মার জন্য, শাশ্বত পিয়াসী মানবাত্মার জন্য একটি মন্দির! ভিক্ষা-মন্ত্র জপ করার জন্য নয়, কিন্তু মানবের উদার হৃদয় থেকে একটি স্তব সঙ্গীত স্বর্গের দিকে প্রেরণ করার জন্য।

সেদিন কি আসবে? একদিন কি এই মন্দির রচিত হবে?

খুবই যেন উল্লসিত এমনি ভাবে পীয়ার একদিন সন্ধ্যা বেলা পোষ্ট আপিস থেকে আসে।

'মার্লে, ক্রুসেথ থেকে ভদ্রমহিলার পত্র এসেচে।'

মার্লে লোরেঞ্জর পানে তাকায়; লোরেঞ্জ কেমন আপনা থেকেই মার আরো-কাছে এসে দাঁড়ায় আর বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ক্রুসেথ থেকে ? লুইসে কেমন আছে ?' মার্লে শুধায়।

'নিজেই পড়ে দেখ, এই নাও চিঠি' পীয়ার বলে।

মার্লে তাড়াতাড়ি চিঠির পরে চোখ বুলিয়ে আবার লোরেঞ্জের পানে তাকায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন সন্তানগুলো ঘুমিয়ে পড়ল, বসে বসে নিম্ন-কণ্ঠে বাপ মা দুজনার আলোচনা চলতে লাগল।

মার্লেকে স্বীকার করতে হল, পীয়ারের মতই ঠিক। ছেলেটাকে কাছে রাখা তাদের স্বার্থপরতার কাজ হবে, কারণ তাকে যেতে দিলে একদিন সে ক্রুসেথের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারে।

মনে কর, যদি ছেলেটা থেকে বাপের কাছে কাজ শিখে লোহারই হয়, তা হ'লে ? কিছুই নয়, লোহারের দিন চলে গেচে, এখন ফ্যাক্টরীই সব কাজ ক'রে থাকে।

এই গ্রাম্য জায়গায় থেকে কি লেখাপড়াই বা তার হবে! মারিট পিসী ওকে স্কুলে পাঠাবে বলেচে। সুতরাং লোরেঞ্জেরও ভাগ্য নিরূপিত হ'য়ে গেল।

কিন্তু যখন তারা ষ্টেশনে ছেলেকে বিদায় দিতে গেল, মা শেষ পর্য্যন্ত রুমালে চোক ঢেকে রইল.শত চেষ্টায়ও চোকের জল তো মানা মানে না।

যখন তারা বাড়ী ফিরে এল, তখন মার্লে বিছানায় শুয়ে রইল, পীয়ার গুনগুনিয়ে নড়ে চড়ে বেড়াতে লাগল। সামান্য একটু খাবার তৈরী করে পীয়ার মার্লের শয্যা পার্শ্বে নিয়ে এল।

মার্লে আর থাকতে পারল না, বলে উঠল, 'আমি বুঝতে পারচি না, তুমি কেমন ক'রে এত সহজে সব গ্রহণ করচ।'

কেমন একরকম হেসে পীয়ার বললে, 'না, মার্লে, তা নয় ; তবে এনিয়ে কথা না বলাই বোধ হয় ভাল।'

পরের দিন কিন্তু পীয়ারেরই কেমন আলস্য বোধ হ'ল, তাই সে একটু শুয়ে থাকতে চাইল। মার্লে তার পানে তাকিয়ে, কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সময় যায়। সাহায্য না নিয়ে কোন রকমে সংসার চালানর জন্য তারা ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে। যা আসে তাতেই তারা তৃপ্ত। নিকটেই যখন প্রকাণ্ড ডেয়ারী তৈরী হয়, তখন তাদের কল কারখানা বসিয়ে দিয়ে যথেষ্ট রোজগার হয়, কিন্তু তা ব'লে রাস্তা মজুরদের তুরপুণে ধার দিয়ে দিতেও সে অপমান বোধ করে না। যন্ত্রপাতির ঝোলা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে একটা আস্তিন দেওয়া ওয়েষ্ট কোট গায়ে দিয়ে পীয়ারকে প্রায়ই গাঁয়ের দোকানের দিকে যেতে দেখা যায়। মাথা উঁচু করে পীয়ার চলে। ছোট করে ছাঁটা দাড়ি সাদা হ'তে সুরু করেচে, মুখে প্রায়ই একটা নিদ্রাহীনতার ভাব লেগে থাকে, কিন্তু তবু লঘুপদে সে পথ চলে, মেয়েদের দেখলে এখনও ঠাট্টাতামাসা করতে ছাড়ে না।

গ্রীষ্মকালে প্রতিবেশীরা দেখতে পায়, পীয়াররা বাড়ীতে তালা লাগিয়ে ঝোলা আর কফির কেটলি নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলেচে, আর ছোট্ট আস্টা পেছনে পেছনে তুর-তুর ক'রে চলেচে। হয়ত খোলা আকাশের নীচে বন ভোজনের আগুনের পাশে ব'সে কফি পান করতে করতে পুরানো দিনের কতকটা স্মৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে তারা।

হেমন্তে যখন পাহাড়ের গায়ে বড় বড় ক্ষেতগুলো সব হলদে হ'য়ে আসে, তাদেরও ছোট্ট একখণ্ড জমি সোনালী হ'য়ে আসে। তাদের দুজনের কাছে বস্তুর আয়তন আজ অনেক ছোট হ'য়ে এসেচে; এখন এক বুশেল শস্যই তাদের নিকট প্রচুর; আলু তারা যতটা পাবে ভাবে,

তার চেয়ে দু একসেরের কম হ'লেই এখন তা নিদারুণ ক্ষতি হ'য়ে যাজে। কিন্তু তবু প্রতিবেশী খামারের গৃহিণীরা প্রায়ই দেখতে আসে মার্লে ঘরখানি কি রকম ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার ক'রে রেখেচে। এখন মার্লের সাহায্য করবার কেউ নেই, তবু সে কৃষকনারীদের রান্না আর সেলাই শেখাবার সময় ক'রে নিয়েচে।

কিন্তু একটি অভ্যাস তার কেবলি বেড়ে চলেচে! বাতায়ন দিয়ে দীর্ঘক্ষণ-ধ'রে ওই উপত্যকাটাকে পাহাড় যেখানে ঘিরে দাঁড়িয়েচে সেই দিক পানে সে চেয়ে থাকে। কি যেন তার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হবে তারি প্রতীক্ষায় সে কেবলি চেয়ে আছে, কবে তাদের শুভদিনের সূচনা হবে যেন তারি প্রতীক্ষা চলচে, ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা যেন তার একটা নিত্যব্রতের মত দাঁড়িয়েচে।

এমনি ক'রেই সময় চলে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রিয় ক্লাউস ব্রক,

এখানে সম্প্রতি আমাদের যা হয়েচে তাই বলবার জন্য তোমায় এই চিঠি লিখচি, বিশেষতঃ এই আশা ক'রে যে এতে হয়ত তুমি কতকটা সান্ত্বনা পাবে। কারণ, আমি বুঝিতে পেরেচি ভাই, যে আমাদের এই যে বিশ্ববেদনা, একে মানুষ জয় করতে পারে কেবল এক উপায়ে, যদি সে সব জিনিস অপরের চোক দিয়ে না দেখে নিজের চোকে দেখতে শেখে।

বেশীর ভাগ লোক বলবে যে আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ হ'য়ে চলচে। আর আমিও নিশ্চয়ই দুঃখকে দুঃখ বলেই ভালবাসি ব'লে ভান করবো না। বরং বলব, দুঃখ আঘাত দেয়। দুঃখ মহৎ ক'রে তোলে না,

বরং এ মানুষকে পশুই ক'রে ফেলে যদি না এই দুঃখই আবার অতি বৃহৎ হ'য়ে সর্ব্ব বস্তুকে নিজের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেয়। এক সময় আমি ফার্স্ট ক্যাটারাক্ট-এ ইঞ্জিনীয়র-ইন-চার্জ ছিলাম, আর আজ সেই আমিই একজন গ্রাম্য কামার, এতে কষ্ট হয়। চোক খারাপ বলে লেখাপড়া থেকে আমি বিচ্ছিন্ন; যাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে আনন্দ পেতাম, তেমন ধারা একটি লোকও এখানে নেই; কাজেই এ দিক দিয়েও আমি বঞ্চিত, অভ্যস্ত হ'য়ে গেলেও এই সমস্ত মনকে পীড়া দেয়, ভাল বলবার মতো এ সবের মধ্যে কিছুই নেই। অনেকবারই আমি ভেবেচি যে, দুরবস্থায় ঢালু গড়িয়ে বুঝি একেবারে তলদেশে এসে পৌঁছলুম,- কিন্তু প্রত্যেকবার দেখলাম যে, সে শুধু একটা ক্ষণিক বিরাম মাত্র। অতল গভীরে আসা তখনো বাকী ছিল। ধর, মাথাটা ফেটে যাবে মনে হচ্চে, তখনো তুমি কাজ ক'রে চলেচ, জীবনের পথে প্রত্যেকটি পিন প্রত্যেকটি দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচিয়ে চলেচ, তবু তোমার রুটিতে প্রায়ই পরানুগ্রহের স্বাদ এসে লাগচে। এতে ব্যথা লাগে। কোন দিন এ অবস্থা ফিরবে এ আশা যদি ছেড়ে দাও, সব আশা, সব স্বপ্ন, সব বিশ্বাস, সব মারীচিকা যদি বিসর্জ্জন দাও, তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি ব'লবে, এতদিনে শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছলুম! কিন্তু, না; এখনো তোমার সত্তার আসল মূলই বাকী রয়ে গেল; সব চেয়ে যা দামী বস্তু তাই পড়ে রইল। তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা ক'রবে, সে কি?

সেই কথাই তোমায় আজ বলতে যাচ্চি।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক যখন আমাদের অবস্থাটা একটু ভালোর দিকে চলেচে বলে মনে হচ্চিল। কিছুদিন ধ'রে আমার মাথার যাতনাটা একটু কম হয়ে আসছিল। আর আমিও একটা নতুন চাষের মই (harrow) তৈরী করবার চেষ্টায় ছিলাম—আবার ইস্পাত! এ

কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয় না। তুমি ত জান, ইস্পাতের মাঝে কি অনন্ত সম্ভাবনাই না র'য়েচে! মার্লে তখন নতুন উদ্যমে কাজ করচে। ওর মত অমন একটি মেয়ে যে স্বেচ্ছায় দুঃখদুর্দ্দশাকে মাথায় তুলে নিয়ে, একটা সর্ব্বস্বান্ত লোকের জীবন-সঙ্গিনী হ'য়ে চলেছে, এর সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়? আশা করি তুমিও একদিন তারই মত নারীর সাক্ষাৎ পাবে। তার চুল সাদা হয়ে যাচ্চে, মুখে রেখা পড়চে, একথা সত্য, পূর্ব্বের মত তার দেহে সেই ঋজুতাও নেই। হাত দু'টিও লাল এবং শীর্ণ হ'য়ে গেচে।...তবু আমার চোকে এ সবের একটা নিজস্ব প্রাণ আছে, সৌন্দর্য্য আছে। কারণ আমি জানি যতবার নতুন বিপদ এসে আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে পেয়েচে, ততবারই মহাকাল একটি রেখা এই মুখে এঁকে গেছে।...এক একদিন সে হাসে। সে হাসি এখন জোর-করা এবং দুঃখে-ভরা। তবুও ওই হাসি, যখন আমাদের চারিদিকে স্বর্গমর্ত্ত্য হিম হ'য়ে আসছিল, উত্তাপের আশায় যখন আমরা পরস্পর পরস্পরকে আরো নিবিড় ক'রে কাছে টেনে নিয়েছিলাম, সেই—সেই সময়কার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের সুখ আমাদের দুঃখ আজ আমার প্রিয়াকে এই রকম ক'রে রূপান্তরিত করেচে। দুনিয়া হয়ত ভাবচে সে বুড়ী হ'য়ে যাচ্চে, আমার চোকে কিন্তু সে দিন দিন আগের চাইতে আরো সুন্দর হ'য়ে উঠচে।

যাক্, এবার তোমায় যা বলতে যাচ্চি, তাই বলি। সন্তান দুটিকে যে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া সহজ হয়নি, তা তুমি বুঝবে, আর তারা যখন ক্রমাগত কেবলই বাড়ী আসার জন্য মিনতি ক'রে চিঠি দিতে থাকে, তখন যে খুব ভালো লাগে তাও নয়। তবু যা হোক, আমাদের পাঁচবছরের ছোট্ট মেয়ে আস্টা ছিল। তুমি যদি তাকে দেখতে! তুমি যদি ভাই পিতা হ'তে আর তোমার যাতনা-ক্লিষ্ট দেহ-মন বড় দু'টি

সন্তানের প্রতি তোমায় প্রায়ই কর্কশ এবং রূঢ় ক'রে তুলতো তাহ'লে যেটি এখন বাকী রয়েচে তাকে ভালবাসার মমতা দিয়ে, সেই অন্যায়গুলোকে নিশ্চয়ই মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে, করতে না কি ? আস্টা নামটী বেশ সুন্দর, না ? কল্পনা করবার চেষ্টা কর, একটি রোদে-পোড়া ছোট্ট মেয়ে, কালো কালো চুল, তার মায়ের মত সেই সুন্দর ভুরু, সদাই ব্যস্ত তার পুতুলদের নিয়ে। কখনো কাঠ সংগ্রহ ক'রে আনা হচ্চে। ওদিকে তার মা সকলের জন্য রুটি করবেন, এদিকে তার বাবার জন্য ছোট ছোট কেক তৈরী করচে, কখনো ছাতের পাখীদের সঙ্গে কথা হচ্চে, মাঝে মাঝে গান হচ্চে, হয়তো কি একটা হারানো সুর মাথায় এসেচে। মা যখন তার মেঝে পরিষ্কার করা নিয়ে ব্যস্ত, ছোট্ট আস্টা তখন তার পেছনে এক টুকরো ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে চেয়ারটাকে হয়ত পরিষ্কার করচে। শেষটায় একটা ভয়ানক কাণ্ড ক'রে হয়ত ব্যথা পেল, অমনি চীৎকার ও দৌড়। বেরিয়ে গিয়েই কিন্তু আবার আনন্দে গান ধরা। তুমি হয়ত কামারশালায় কাজ করচ, ছোট্ট পায়ের একটু শব্দ এল, তারপরই একেবারে 'বাবাগো, খেতে এসো, তারপর হয়ত ছোট্ট দু'টি হাতে তোমায় ধ'রে দোরের দিকে নিয়ে চলল। 'বাবা, আজ রাত্তিরে আমায় চান করিয়ে দেবে তো ?' কিম্বা 'বাবা, এই নাও তোমার ন্যাপকিন।' ডিনারে হয়ত শুধু আলু আর দুধ, তবু তার খাওয়া চলেচে যেন সে মস্ত ভোজে বসেচে। 'বাবা, আলু, দুধ তোমার খুব ভালো লাগে, না ? নানা প্রশ্নের ব্যগ্রতায় কত রকমের মুখভঙ্গী তার ! রাত্তিরে আমাদের বিছানার পায়ের দিকের বাকসে সে ঘুমোয় ; এমন ধারা প্রায়ই হয়েচে যে আমি নিদ্রাহীন শুয়ে আছি তখন তার লঘু শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আমারও প্রাণটাকে শান্তিতে ভ'রে দিয়েচে, যেন তার ছোট্ট দুটি হাত ধ'রে ওই স্বর্গীয় সুন্দর ঘুমের দেশে আমায় নিয়ে গেছে।

তারপর, যতই ঘটনার দিকে অগ্রসর হচ্চি, ততই লেখা কঠিন হ'য়ে উঠচে, হাত কাঁপচে। কিন্তু আমি আশা করি যে, যেমন শেষে আমি আর মার্লে' সান্ত্বনা পেয়েচি, হয়ত তুমিও এতে কিছু সান্ত্বনা পাবে।

এখানে আমাদের সব চেয়ে কাছে যারা ছিল, তারা আমাদেরই মত গরীব, এক কাঁসারি আর তার স্ত্রী। আমরা আসার অল্প পরেই, সেই কাঁসারির সঙ্গে আলাপ করতে যাই। দেখলাম বেচারী শীর্ণকায়, ছোট-খাট একটি প্রাণী, এসিড নিয়ে এলোমেলো ভাবে কাজ করচে, আর বাসন-পত্র জোড়াতাড়া দিয়ে সে তার সাধ্যমত জীবিকা অর্জ্জন করচে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে সে বললে, 'কি চাই?' তারপর যেই আমি বে'রয়ে এলাম, শুনলাম পেছনে সে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। হায়, বেচারার ভয় হ'য়েছিল আমি বুঝি তার রুটি কেড়ে খেতে এসেচি। তার স্ত্রী ছিল খুব মোটা, বড় বড় হাড়, একটি মাংসপিণ্ড বললেই হয়। তার চালচলনও আবার রীতিমত উদ্ধত, যদিচ কিছুকাল আগেই সে জেল থেকে ফিরে এসেছিল। একটি মেয়েকে বিপথে নিয়ে যাবার অপরাধে সহায়তা করেছিল ব'লেই তার এই শাস্তি।

একদিন রবিবার ভোরবেলা তার বাগানের পুষ্পিত কয়েকটা আপেল গাছের দিকে তাকিয়েছিলাম। একটা গাছ বেড়ার এত কাছে ছিল যে ডালগুলো আমার জমির ওপরই ঝুঁকে পড়েছিল। আমি ফুলের গন্ধ নেবার জন্য একটি ডাল ঝুঁকিয়েচি আর অকস্মাৎ এক চীৎকার, 'এ-ই বাঘা, লোকটাকে ধর।' তারপর কাঁসারির মস্ত নেকড়ে কুকুরটা লাফিয়ে এসে আমার গলা কামড়ে ধরে আর কি! ভাগ্যি ভালো যে আমার কোনো অনিষ্ট করবার আগেই আমি ওর কলারটা ধরে ফেলেছিলাম। ওটাকে মালিকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম যে

যদি ফের এরকম হয়, তাহলে আমি শেরিফের লোককে ডাকবো। তারপর গানের পালা সুরু হ'ল, সংযমের বাঁধ খুলে গেল। আমার সম্বন্ধে তার মতটি সে খুলে বললে, 'মুখ সামলে কথা ক' হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া, এখানে এসেচে ভালো লোকের মেহনতের রুটি মারতে' ইত্যাদি। সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে সে এই সব কথা বলতে লাগল, আর বাহু আস্ফালন করতে লাগল। শেষে আমার মনে হ'ল যেন আমার মাথায় ছুঁড়ে মারবার জন্য সে ছুরি কিম্বা এমনি কিছুর সন্ধান করচে। না হেসে পারলাম না। এই পৃথিবীব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুটি বড় জাতের মাঝে যা চলে তারি একটা বেশ উঁচুদরের অভিনয় হ'ল আর কি!

দুদিন পরে আমি হাপরের সামনে দাঁড়িয়ে আচি, এমন সময় স্ত্রীর চীৎকার কানে এল। ছুটে বেরিয়ে গেলাম ব্যাপার কি দেখতে। ততক্ষণে মার্লে বেড়ার কাছে চলে গেছ। এক নিমেষেই দেখতে পেলাম, আস্টা মাটির পরে একটা মস্ত জানোয়ারের দেহের নীচে পড়ে।

তারপর—যাক্। মার্লে বলে যে জানোয়ারের নীচে থেকে আমিই নাকি কাপড়ের ছোট্ট বাণ্ডিলটা ছিনিয়ে, আমাদের ছোট্ট মেয়েটিকে বাড়ী নিয়ে আসি।

বিপদের সময় প্রায়ই ডাক্তার সুন্দর আশ্রয় বটে, কিন্তু সে যত সুন্দর করেই একটা শিশুর ছেঁড়া গলাটাকে সেলাই ক'রে দিক, তা থেকে তো দাঁড়ায় না যে তাতে উপকার হবেই।

তবু মা তাকে যেতে দেবেই না; মা কেঁদে, মিনতি ক'রে, টানাটানি ক'রে তাকে কেবলই আরেকবার কিছু করা যায় কিনা চেষ্টা ক'রে দেখতে বলে। শেষে যখন সে চ'লে যায়, সে আবার তাকে ডেকে

আনতে যেতে চায়, মাটির পরে লুটোপুটি খেতে থাকে, চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করে ; সত্যি বলে সে যা জানচে, তাকে যে সে বিশ্বাস করতে চায় না, বিশ্বাস করতে পারে না !

সেই রাত্রে একটি মা আর একটি পিতা এক সঙ্গে জেগে কাটালো সমুখের দিকে অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি মেলে দিয়ে। মা শান্ত হ'ল, সন্তানকে তৈরী ক'রে সাজিয়ে কবরের জন্য শুইয়ে দেওয়া হ'ল। পিতা বাতায়নের পাশে ব'সে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তখন মে মাস, রাত্রি ধূসর।

এতদিনে উপলব্ধি করলাম, প্রত্যেক বৃহৎ শোক কেমন ক'রে আমাদের সত্তার শেষ উপকূলে নিয়ে যায়। এতদিনে আমি একেবারে সর্ব্বশেষ তটভূমিতে এসে ঠেকলাম, এর পরে আর মাটি রইল না।

প্রিয় বন্ধু, আরো দেখলাম যে, দুঃখ-দুর্দ্দশার এই কটি দীর্ঘ বৎসর আমায় শুধু এক ছাঁচেই ঢালাই করেনি, অনেক ছাঁচে তৈরী ক'রে তুলেচে। কারণ আমার মাঝে কয়েকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার উপাদান ছিল। এতদিনে কাজ শেষ হ'ল ; এখন তারা আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রয়াণ করতে পারবে।

দেখলাম, একটা লোক স্বর্গমর্ত্ত্যের পানে ঘুঁসি বাগিয়ে রাত্রির মাঝ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ; উন্মাদটা 'এই প্রহসনে আর অভিনয় করব না' ব'লে নদীর দিকে ছুটে চলে গেল।

আমি কিন্তু তখনো চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

আরেকটি ছোট্ট প্রাণীকে মুক্ত হ'তে দেখলাম। ছাইয়ের মতো রঙ এক দীন 'সাধু, আঘাতের সামনে মাথা নত ক'রে সে বললে,

'তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হক। প্রভু দিয়েছিলেন, প্রভুই ফিরিয়ে নিয়েচেন।' দীন করুণ এই বেচারী, রাত্রির মাঝে ধীরে ধীরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কিন্তু তখনো চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

জীবনের শেষ অন্তরীপের ওপর সঙ্গীহীন একলা ব'সে রইলাম, সূর্য্য-তারা নিভে গেল, একটা হিমশীতল শূন্যতা আমার অন্তর বাহির চারিদিক ঘিরে রইল শুধু।

কিন্তু বন্ধু আমার, তখন ধীরে ধীরে আমার এই অনুভব হ'তে লাগল যে, তবু যেন কিছু আমার রইল, সে আমার মধ্যে একটি ছোট্ট দুর্জ্জয় অগ্নিশিখা, আমার মাঝে স্বতোভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল; মনে হল যেন আমি আমার সৃষ্টির প্রথম দিনের কোলে ফিরে এসেচি, যেন আমার মাঝে একটি নিত্যকালের ইচ্ছা জাগ্রত হ'য়ে ব'লে উঠল, জ্যোতির আবির্ভাব হ'ক।

এই ইচ্ছা আমার মাঝে ধীরে ধীরে প্রবল হ'য়ে চলল, আমায় বলিষ্ঠ ক'রে তুলল।

পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, সবার পরে এক অব্যক্ত করুণা জেগে উঠলো, তবু সর্ব্বশেষে গর্ব্ব অনুভব করলাম যে, আমিও তাদেরই একজন।

অন্ধ নিয়তি কেমন ক'রে সর্ব্বরিক্ত ক'রে আমাদের লুণ্ঠন করতে পারে তা বুঝলাম; এও বুঝলাম যে, তবু শেষে এমন একটা বস্তু আমাদের মাঝে রয়েই যাবে, যাকে স্বর্গমর্ত্ত্যের কোনো কিছুই জয় করতে পারে না। দেহের মৃত্যু ধ্রুব, নিশ্চিত; আমিত্বের নির্ব্বাণও স্থির, তবু আমাদের মাঝে সেই অগ্নিশিখা রয়েচে, ভগবানের জন্য এবং বিশ্বের জন্য সেই নিত্যকালের জ্যোতি এবং সমন্বয়ের বীজ রয়েচে আমাদের মাঝে।

এখন বুঝলাম যে, আমার জীবনের সেরা বছরগুলো যার ক্ষুধায় কেটেচে, সে জ্ঞান নয়, সম্মান নয়, সম্পদ নয়; ইস্পাতের রাজ্যে মস্ত স্রষ্টাও আমি হ'তে চাইনি, ধর্ম্মযাজকও হ'তে চাইনি। না, বন্ধু, আমি চেয়েচি মন্দির গড়ে তুলতে; প্রার্থনা বেদী নয়, অনুতপ্ত পাপীদের আর্ত্তনাদের জন্য গির্জ্জা নয়, পরন্তু মহীয়ান মানবাত্মার পূজার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করতে যেখানে আমরা আমাদের অন্তরাত্মাকে একটি মহান্ সঙ্গীতের অর্ঘ্য করে স্বর্গের পানে তুলে ধরতে পারব।

আমার পক্ষে কিন্তু আর তা করা সম্ভব নয়। বোধ করি পৃথিবীতে এমন কিছুই রইল না, যা আমি আর ক'রতে পারি। তবু সেইখানে ব'সে ব'সে মনে হল যেন আমারই জয় হয়েচে।

কি হ'ল তারপর? হ্যাঁ, বলি। সারাটা বসন্তকাল ধ'রে ভয়ানক শুকনো হাওয়া বইল, এই উপত্যকায় প্রায়ই এমনি হ'য়ে থাকে। সেই চিরকেলে উত্তুরে হাওয়া সারাটা দেশের ওপর দিয়ে ধূলোর আঁধি বইয়ে দিয়ে গেল। আমাদের আশঙ্কা হ'ল যে যদি বৃষ্টি না হয় তা হলে এবারও ভীষণ অজন্মা হবে।

শেষটায় লোকেরা সাহস ক'রে বীজ বুনল, কিন্তু তখন বরফ পড়া আরম্ভ হ'ল। বরফ, জল, বীজ সব মাটির মাঝে জমে রইল। আমার প্রতিবেশী কাঁসারি তার জমিতে যব বুনেছিল, কিন্তু এখন আবার বোনার দরকার, বীজ কোথায়? বাড়ী বাড়ী সে বীজ ভিক্ষা ক'রে ফিরল, কিন্তু আস্টার সেই ঘটনার পর থেকে লোকে তার দিকে চাইতেও ঘৃণা বোধ করত, কেউ তাকে ধার দিতে রাজী হ'ল না। বীজ কেনার অর্থও তার ছিল না। রাস্তায় ছেলেরা তাকে দূর দূর করতে লাগল, প্রতিবেশীদের কেউ কেউ তাকে প্যারিশ (parish) থেকে তাড়ানোর কথা বলতে লাগল।

পরদিন রাত্তিরেও বিশেষ ঘুমুতে পারলাম না। দু'টো যখন বাজে, তখন উঠলাম। মার্লে প্রশ্ন করল, 'যাচ্ছ কোথা?' আমি বললাম, 'দেখি আধ বুশেলটাক যব আমাদের আছে কি না।'

'যব? এই মাঝ রাতে কি হবে যব দিয়ে?'

'কাঁসারির জমিটা বুনে আসতে চাই; এখন করাই ভালো, কেউ জানতে পারবে না যে আমি করলাম।'

মার্লে উঠে বসল, আমার পানে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল, 'কি? ও—ওর? সেই কাঁসারির?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তার জমিটা সারা গ্রীষ্ম যদি খালি পড়ে থাকে, তাতে আমাদের তো কোন লাভ হবে না।'

'পীয়ার, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'বললাম তো' বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি জানতাম, মার্লেও আসবার জন্য কাপড়-চোপড় পরচে।

রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল! যখন বেরিয়ে এলাম তখন বেশ মৃদু হাওয়া দিয়েচে। উষার অস্ফুট ধূসরালোকে তখন উত্তরের মেঘ থেকে হলদে আভা এসে মিশেচে। হাওয়ায় স্ফুটনোন্মুখ বার্চে'র গন্ধ ভেসে আসছিল, আর ম্যাগপাই স্টারলিঙরা জেগে উঠে চলাফেরা করছিল, কিন্তু একটি মানুষও তখন দেখা দেয়নি। গোলাবাড়ী, গ্রাম, সব তখনও ঘুমিয়ে আছে।

চুপড়িতে ক'রে বীজ নিলাম। প্রতিবেশীর বেড়া ডিঙিয়ে বীজ বোনা সুরু করলাম, বাড়ীতে জনপ্রাণীর কোনো সাড়াই নেই। শেরিফের কর্ম্মচারী এসে আগের দিন কুকুরটাকে গুলি ক'রে মেরে গেছে। নিঃসন্দেহে স্বামীস্ত্রী তখন ঘুমোচ্ছিল আর চারিদিকে শত্রুর স্বপ্ন দেখছিল যারা যথাশক্তি তাদের অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছিল।

প্রিয় বন্ধু, আর বিশেষ কিছু বলবার দরকার আছে কি? তবু ভেবে দেখ ভাই, যে, একজন হয়ত একটা রাজ্য দান করতে পারে, তাতে তার কিছুই আসে যায় না। অপরেকজন কয়েক মুষ্টি মাত্র শস্য দান করতে পারে, কিন্তু সেই দেওয়া মানে শুধু তার যথাসর্ব্বস্ব দান নয়; এই দানটুকু করতে গিয়ে তার অন্তরাত্মাকে একটা মস্ত সংগ্রাম করতে হয়েচে। তোমার কি মনে হয়, এটা কিছুই নয়? যদি আমার কথা বল ভাই, আমি খ্রীষ্টের মুখ চেয়ে একাজ করিনি কিম্বা আমি আমার শত্রুকে ভালবাসি ব'লেও নয়। আমার জীবনের ধ্বংসাবশেষের পরে দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব অনুভব করেচি ব'লেই আমি একাজ করেচি। মানবজাতিকে উঠতে হবে। যে-সব অন্ধশক্তি তাকে নিয়ন্ত্রিত করচে, তার চেয়ে ভালো হ'তে হবে তাকে। তার দুঃখরাশির মাঝখানেও তাকে সাবধান হ'তে হবে, যাতে তার দেবত্ব না নষ্ট হ'য়ে যায়। অনন্তের শিখা আমার মাঝে একদিন দীপ্ত হ'য়ে উঠে বলেছিল, জ্যোতির আবির্ভাব হ'ক।

ক্রমশঃ এই কথাটাই আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল আমার কাছে যে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে মানুষকেই দেবত্ব সৃষ্টি করতে হবে। এইখানেই বিশ্বের অনন্ত জড়শক্তির ওপর মানুষের জয়। এই জন্যই আমি বেরিয়ে গেলাম। আমার শত্রুর ক্ষেতে বীজ ছড়িয়ে এলাম যাতে ভগবান বেঁচে থাকতে পারেন।

আহা, যদি সেই মুহূর্ত্তটা একবার অনুভব করতে পারতে! মনে হ'ল কাদের কণ্ঠস্বর যেন বায়ুমণ্ডলকে সজীব ক'রে তুলল। জীবনে আমি যত ভাগ্যহীন মানবকে দেখেচি এবং জেনেচি, তারা যেন সবাই এসে আমার সাথী হ'য়ে জুটতে লাগল। তারা কেবলি আসতে লাগল। যারা মৃত তারাও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে। বোন লুইসে

সেখানে তার সেই সুরটি বাজাতে লাগল। জীবিত এবং মৃত—সকলের কণ্ঠকে এনে সে সমগ্র মানবজাতির মহাসঙ্গীতে মিলিয়ে ধরল। দেখ, এই তো আমরা সব তোমার ভাই, তোমার বোন—তোমার নিয়তি আমাদেরও নিয়তি। বিশ্বজগতের উদাসীন নিয়ম আমাদের এমন এক জীবনের মাঝে এনে ফেলেচে যেখানে আমাদের ইচ্ছামত কিছু করবার উপায় নেই। অন্যায়, রোগ, শোক, আগুন, রক্ত আমাদের বিধ্বস্ত করচে, সব চেয়ে সুখী যে, তাকেও মরতে হবে। তার নিজের ঘরেও সে একজন ক্ষণিকের অতিথি। সে জানে না যে, হয়ত কালই তাকে চ'লে যেতে হবে। তবু মানুষ তার এই সকরুণ ভাগ্যের মুখের ওপর হাসে। তার এই দাসত্বের মাঝখানেও সে পৃথিবীতে সুন্দরকে রচনা করেচে। তার যাতনার মাঝখানে তার অন্তরাত্মার এত শক্তি উদ্বৃত্ত রয়েচে, যা দিয়ে সে এই হিমশূন্যের বুকটাকেও ভগবান দিয়ে পূর্ণ ক'রে তুলতে পেরেচে।

হে মানবাত্মা, তুমি এমনি পরমাশ্চর্য্য, স্বভাব তোমার এমনি দেবত্ব-ময়। মরণের ফসল কেটে সেখানে তুমি চিরন্তন জীবনের স্বপ্ন বপন করেচ, তোমার মন্দভাগ্যের পরে প্রতিশোধ নিয়েচ এই বিশ্বকে প্রেমময় ভগবান দিয়ে পূর্ণ করে।

তাঁর সৃষ্টিধারায় আমরা আমাদের কাজ করেচি, যারা আজ ধূলো হ'য়ে গেছি সেই আমরা, যারা অন্ধকারে নিভে যাওয়া শিখার মত ডুবে গিয়েচি সেই আমরা কেঁদেচি, আনন্দ করেচি, তীব্র যাতনা এবং উল্লাস অনুভব করেচি, কিন্তু সবাই আলোকের বিশাল সমুদ্রে আমাদের আলোক রেখাটিকে ঢেলে দিয়েচি,—আমরা প্রত্যেকে। যে-নিগ্রো তার মুণ্ডের কবরের পরে সামান্য স্মৃতিচিহ্ন এঁকেচে, তার থেকে সুরু করে সেই প্রতিভা পর্য্যন্ত যে আকাশের পানে মন্দির স্তম্ভ

তুলেচে। যে বেচারী মা তার শিশুর দোলনার পাশে প্রার্থনা করেচে তার থেকে সুরু ক'রে সেই মহাবাহিনী যাদের স্তব সঙ্গীত ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে মিশে গেচে—সেই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের কাজ করেচি।

হে মানবাত্মা, আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর। তুমি এই বিশ্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেচ, তাকে লক্ষ্য দিয়েচ। তুমিই সেই মহান সঙ্গীত যা বিশ্বকে সামঞ্জস্য দান করেচে। নিজের দিকে ফেরো, মাথা উঁচু ক'রে গর্ব্বভরে অমঙ্গলের সম্মুখে দাঁড়াও। দুঃখ-দুর্দ্দশা তোমায় নিষ্পেষণ করতে পারে, মৃত্যু তোমায় লুপ্ত করতে পারে, তবু তুমি অজেয়, তুমি চিরন্তন।

প্রিয় বন্ধু, আমার এই অনুভব হয়েছিল। যখন বীজ বোনার পর আমি ফিরে যাচ্চি, তখন পাহাড়ের কাঁধের ওপর দিয়ে সূর্য্য দেখা দিয়েচে। বেড়ার পাশে আমার পানে চেয়ে মার্লে দাঁড়িয়ে। কৃষক মেয়েদের মতো কপালে তার রুমাল বাঁধা ছিল ব'লে মুখে তার ছায়া পড়েছিল; কিন্তু সে আমার পানে চেয়ে মৃদু হাসি হাসল, মনে হ'ল এই প্রত্যূষে এই ব্যথাহতা মা-ও তার দুঃখ-সমুদ্রের মাঝ থেকে উঠে দাঁড়িয়েচে, যাতে সে-ও ঈশ্বর সৃষ্টির কাজে যোগ দিতে পারে।